

এ
গোল্ডেন এজ

আনাবরা দিন

বাংলাবুক.অর্গ

তাহমিমা  আনাম



ইংল্যান্ড ও আমেরিকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে তাহমিমা আনামের ইংরেজি উপন্যাস *এ গোল্ডেন এজ*। এরপর আরো যেসব দেশ থেকে বইয়ের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ফ্রান্স, ডেনমার্ক, হাঙ্গেরি, ইতালি, নেদারল্যান্ডস্, পর্তুগাল, রোমানিয়া, সার্বিয়া, স্পেন, সুইডেন, ইজরায়েল ও ব্রাজিল। এছাড়া কাটালান ভাষায়ও প্রকাশিত হবে অনুবাদ এবং অন্যান্য ভাষায় সংস্করণ প্রকাশ প্রত্যাশা করা হচ্ছে।



কমনওয়েলথ সাহিত্য পুরস্কার বিজয়ী সেরা প্রথম গ্রন্থ ২০০৮

বাংলাদেশের মেয়ে তাহমিমা আনামের ইংরেজি উপন্যাস *এ গোল্ডেন এজ* প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ২০০৭ সালে, প্রকাশক লন্ডনের অভিজাত প্রকাশনী জন মারে (পাবলিশার্স)। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত মানবিক জীবনসংগ্রামের এই আলোচ্য পাঠকদের মনোযোগ বিপুলভাবে আকর্ষণ করে এবং সমালোচকদের দ্বারা অভিনন্দিত হয়। পরে আমেরিকা থেকে হারপার কলিন্স বইয়ের আরেকটি সংস্করণ প্রকাশ করে এবং বইটি উত্তর আমেরিকায় সমধরনের আলোড়ন তোলে। বিলেতের গার্ডিয়ান, টেলিগ্রাফ, অবজারভার ও আমেরিকার নিউইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্টসহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে তাহমিমা আনামের উপন্যাস। *এ গোল্ডেন এজ* আন্তর্জাতিক পাঠকমহলের অভূতপূর্ব মনোযোগ লাভ করেছে এবং বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়ে চলেছে। নির্দিধায় বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী প্রজন্মের নবীন সদস্য রচিত *এ গোল্ডেন এজ* বিশ্বের নানান দেশের অগণিত পাঠকের কাছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আবারও সজীব করে তুলছে। বাংলাদেশের জন্য এই উপন্যাস তাই বিশেষ গর্বের বিষয় এবং আমরা আনন্দিত যে এর বাংলা অনুবাদ এখন বাংলা-ভাষাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দেয়া গেল।

তাহমিমা আনামের জন্ম ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশে, তিনি হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজ নৃতত্ত্বে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। বর্তমানে স্থায়ীভাবে লন্ডনবাসী এবং লেখালেখিকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন।



www.BanglaBook.org

মূল্য : তিনশত পঞ্চাশ টাকা

প্রচ্ছদ ডিজাইন : খেও১৮

লেখকের ছবি : শেখ এনামুল হক

সোনাঝরা দিন

সোনারা দিন

তাহমিমা আনাম

অনুবাদ
লীসা গাজী

সম্পাদনা
মশিউল আলম □ শিবব্রত বর্মণ
মফিদুল হক

 *The Online Library of Bangla Books*
BanglaBook.org



সাহিত্য প্রকাশ

© তাহমিমা আনাম ২০০৮

মূল ইংরেজি উপন্যাস প্রথম প্রকাশিত হয় গ্রেট ব্রুটেনে জন মারে (পাবলিশার্স) কর্তৃক ২০০৭ সালে

এই গ্রন্থের সকল চরিত্র কাল্পনিক এবং জীবিত অথবা
প্রয়াত বাস্তব কোনো মানুষের সঙ্গে কোনো ধরনের
মিল সম্পূর্ণ কাকতালীয়

বাংলা অনুবাদ প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৮, ফাল্গুন ১৪১৪

প্রকাশক : মফিদুল হক, সাহিত্য প্রকাশ

৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০

মুদ্রাকর : কমলা প্রিন্টার্স

৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০

মূল্য : তিনশত পঞ্চাশ টাকা

ISBN 984-70124-0008-1

মা-বাবা
শাহীন আর মাহফুজ আনাম
আমার অন্তরে যাঁরা বপন করেছেন আশা

লেখকের কথা

মুক্তিযুদ্ধ, এর গল্প, কথা, কাহিনী আমাকে সব সময় উদ্বুদ্ধ করে, আকুল করে। আমার জন্য এ-এক চেতনা জাগানিয়া সময়। সেই মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে আমি যখন ইংরেজিতে উপন্যাস লিখি তখন তা আরো একবার বিশ্বের কাছে হাজির হয় স্বমহিমায়। যে অনুপ্রেরণা ও আবেগ আমার লেখায় কাজ করেছে আমি শুধু সেটি ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছি আরো সব মানুষের মাঝে। প্রসঙ্গত বলতে ভালো লাগছে উপন্যাসটি ষোলটি ভাষায় অনূদিত হচ্ছে।

তাই অনিবার্যভাবেই এর বাংলা অনুবাদ। এই দেশের মেয়ে হিসাবে আমি সর্বাত্মক চেয়েছি আমার কাজ, আমার সৃষ্টি আমার নিজের জায়গায় ফিরে আসুক। তাই বাংলায় অনুবাদের মুহূর্তটি আমার কাছে এতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং এতটাই প্রিয়। আশা করছি 'এ গোল্ডেন এজ' উপন্যাসের অনূদিত রূপটি এ দেশের মানুষ এবং বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মনোযোগ পাবে একই মমতায় ও অহঙ্কারে যা উপন্যাসটি লেখার সময় আমার ধমনীতে আমি টের পেয়েছি।

তাহমিমা আনাম

অনুবাদের কথা

আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি তাদের কাছে একান্তর-পরবর্তী বছরগুলো বেশ গোলমালে। মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস কখনই আমাদের জানতে দেয়া হয়নি। সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে ইতিহাস, তথ্য আর দলিল পরিবর্তনের ধারা আজও বহাল।

সেদিক থেকে আমি নিজেকে খুবই ভাগ্যবান মনে করি। আমার বাবা প্রয়াত লুৎফুর রহমান একজন মুক্তিযোদ্ধা। তিনি তুরায় (সেপ্টর ১১) জোনাল এ্যাডমিনিস্ট্রেটর পদে যোগ দিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন আর তাঁরই চোখে আমার একান্তর দেখা। আমার ভেতরে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে এক প্রশ্নাতীত আবেগের জন্ম তিনিই দিয়েছেন।

ইংরেজিতে লেখা তাহমিমা আনামের প্রথম উপন্যাস 'এ গোল্ডেন এজ' এই সময়ের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এখানে বলা প্রয়োজন এটি কোন ইতিহাসের দলিল নয়, তবে মুক্তিযুদ্ধের আবেগ ও চেতনা সঞ্চরক তো বটেই। তাছাড়া বইটি আন্তর্জাতিক বিশ্বকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আবারও ভাবতে বাধ্য করে। প্রবাসে বড় হওয়া ছেলেমেয়েরা যখন বইটি পড়ে দেশ সম্পর্কে, স্বাধীনতা সম্পর্কে জানতে উৎসাহী হয় তখনই এর অপরিহার্যতা টের পাই। আর সে কারণেই এই কাজটির সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করার সুযোগ পেয়ে ভালো লাগছে।

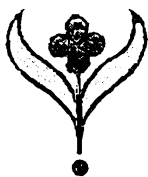
যদি বর্তমান প্রজন্মের তরুণ ছেলেমেয়েরা বইটি পড়ে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আবেগ তড়িত হন বা আরো জানবার আগ্রহ বোধ করেন, তবে সেই যথেষ্ট।

লীসা গাজী

স্বাধীনতা তুমি
বাগানের ঘর, কোকিলের গান,
বয়েসী বটের ঝিলিমিলি পাতা,
যেমন ইচ্ছে লেখার আমার কবিতার খাতা ।

শামসুর রাহমান, স্বাধীনতা তুমি

মার্চ ১৯৫৯



সূচনা



বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন
বাংলা বই এর পিডিএফ
ডাউনলোড করার জন্য
আমাদের ওয়েবসাইটে
(**BANGLABOOK.ORG**)
আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :





প্রিয়তম,
আজ আমি বাচ্চাদের হারিয়ে ফেলেছি।

আদালতের বাইরে খান ব্রাদার্স ভ্যারাইটি স্টোর অ্যান্ড কনফেকশনারি থেকে রেহানা লাল-নীল দুটি ঘুড়ি কিনলেন। দোকানের ক্যাশ ব্যাক্সের ওপাশের লোকটি ঘুড়িদুটো খয়েরি কাগজে মুড়ে সুতলি দিয়ে বেঁধে দিল। রেহানা সেটা হাতে নিয়ে একটা রিকশা ডাকলেন। রিকশায় ওঠার মুখে তিনি দেখতে পেলেন উকিল সাহেব তাঁর দিকে ছুটে আসছেন।

‘মিসেস হক, আমি খুব দুঃখিত,’ তাঁর গলায় আন্তরিকতার ছোঁয়া।

ঠিক আছে, এতো দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই—এরকমটা বলার মতো ধাতস্থ হতে পারলেন না রেহানা।

‘আপনাকে কিছু টাকা জোগাড় করতে হবে। এছাড়া কোনো উপায় নেই। টাকা জোগাড় হলে আমরা আবার চেষ্টা করব। কিছুটা তেল না ঢাললে শয়তানগুলো এক পাও নড়বে না।’

টাকা। রিকশায় উঠে রেহানা হুডটা মাথার ওপর টেনে দিলেন। একটু কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, ‘ধানমণ্ডি পাঁচ নম্বর।’

রেহানা যখন বাসায় ফিরলেন, বাচ্চারা পা বুলিয়ে একসঙ্গে সোফায় বসে আছে। মায়ার পা জোড়া মেঝের নাগাল পাচ্ছে না। সোহেল ঝুঁকে তার হাতের তালুর ওপরকার ছোট ছোট রেখাগুলো গুনছে। সে মাকে দেখে হাসে, কিন্তু সোফা থেকে উঠে দাঁড়ায় না, বা মায়ার মতো বলে ওঠে না, ‘এতক্ষণ কোথায় ছিলে, আম্মু?’

রেহানা ঠিক করে রেখেছিলেন, বাচ্চাদের সামনে কান্নাকাটি করবেন না। তাই রিকশাতেই কান্নার পালা চুকিয়ে এসেছেন। গুমরে ওঠা কান্না বুকের ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে এলে রিকশার হুডের লিকলিকে কাঠামো আঁকড়ে তিনি ডুকরে কেঁদে উঠেছিলেন। রিকশাওয়ালা পেছন ফিরে চেয়েছিল; যেন সে সত্যিই চিন্তায় পড়ে গেছে এমন ভঙ্গিতে জানতে চেয়েছিল রিকশা থামাবে কিনা, রেহানা এক গ্লাস পানি খাবেন কিনা। রেহানা কখনো রাস্তার পানি মুখে নেননি; মাথা নেড়ে নীরবে অসম্মতি জানিয়ে তিনি ভাবছিলেন রিকশাওয়ালাটির বাচ্চাকাচ্চা আছে কিনা; ভাবনার ভারে তার মাথা নুয়ে পড়েছিল, আর রাস্তার ঝাঁকুনিতে রিকশার হুডের সঙ্গে বারবার ঠোকা খাচ্ছিল। এখন নিজের বাচ্চাদের মুখোমুখি হয়ে রেহানার চোয়াল চেপে আসে, কটু স্বাদে ভরে ওঠে মুখের ভেতরটা, চোখ জ্বালা করে, গলা বুজে আসে। এই সমস্ত কিছু সামলে নিতে নিতে তিনি কাগজে মোড়া চৌকোণ ঘুড়ি দুটো বাচ্চাদের হাতে দেন।

‘থ্যাংক ইউ, আম্মু,’ নিজেরটা খুলতে খুলতে মায়া বলে। সোহেল ওরটা খোলে না, কোলের ওপর রেখে খয়েরি কাগজটাতে হাত বোলায়।

রেহানা শান্ত কণ্ঠে বলেন, ‘এখন থেকে তোমরা ফয়েজ চাচার সঙ্গে থাকবে, লাহোরে।’

‘লাহোরে!’ মায়া বলে।

‘আমি সরি, খুবই সরি।’ ছেলেকে বলেন রেহানা।

‘আমরা ফিরে আসব কবে?’

‘শিগগিরই।’ রেহানা বলতে চেয়েছিলেন, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো। ‘বৃহস্পতিবারে ওরা তোমাদের নিতে আসবে।’

‘আমি যেতে চাই না।’

রেহানা জিভ কামড়ে বলেন, ‘উহ, যেতে হবে। তুমি যান্নে-রুদ্ধে সাহস রাখবে। ওখানে ঘুড়ি ওড়াতে পারবে, আমি কিন্তু এতটা দূর থেকেও লাহোরের আকাশে তোমার ঘুড়িটা দেখব। এটা একটা আলাদা ধরনের ঘুড়ি। তোমাকে অনেক লক্ষ্মী ছেলে হতে হবে। খুব ভালো আর খুব সাহসী একটা ছেলে। সাহসী ছেলেরাই কেবল উত্তাল বাতাসের দিনগুলোর হৃদয় প্রায়। একদিন এমন বাতাস বইবে যে তুমি একেবারে উড়ে চলে আসবে আল্লাহর কাছে। আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না তো? আচ্ছা অপেক্ষা করো, দেখবে।’

প্রিয়তম,

আমাদের বাচ্চারা আর আমাদের রইল না।

রেহানা তাঁর স্বামীকে এইসব কথা কীভাবে বলা শুরু করবেন?

বাচ্চাদের নিয়ে তিনি একটা রিকশায় উঠলেন। ‘আজিমপুর কবরস্থান,’ বললেন তিনি।

কবরস্থানটি গোখুলির শোকাক্ত মানুষে ভরপুর। প্রিয়জনদের কবরে বেড়ে ওঠা ভেজা ঘাসের ওপর তারা ছুঁড়ে দিচ্ছে ফুল। পাশের সারিতে সাদা টুপিপরা একজন মানুষ দু’হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছেন। তাঁর পাশে এক বৃদ্ধা একরাশ বকুল ফুল হাতে দাঁড়িয়ে।

রেহানা বাচ্চাদের সুডৌল হাত মুঠোয় ধরে রাখেন। ইকবালের কবর দেখিয়ে বলেন, ‘বাবাকে খোদা হাফেজ বলো।’

সোহেল তার হাত দুটো মুখের কাছে মেলে ধরে, ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।’
‘মায়া, তুমিও।’

আমার বাচ্চারা আর আমার থাকল না।

জজ সাহেব বলেছিলেন, রেহানা তাঁর স্বামীর মৃত্যুর ধকল এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেননি। একা দুটি শিশু প্রতিপালনের পক্ষে তাঁর বয়স নিতান্তই অল্প। জান্নাত ও আখেরাত সম্পর্কে যথাযথ শিক্ষাও তিনি বাচ্চাদের দেননি।

মায়া একটা প্রজাপতির পিছু ছুটতে ছুটতে পাশের কবরের সারিতে চলে যায়। রেহানা ওকে হাত ধরে টেনে আনেন, ‘আব্বুকে খোদা হাফেজ বলো।’

‘খোদা হাফেজ, আব্বু,’ বলে মায়া, ওর টলটলে চোখ দুটি প্রজাপতির পাখার সঙ্গে ছোটে।

‘মিসেস হক,’ জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করেন, ‘আপনার স্বামী কী চাইতেন?’

সে চাইত ওরা যেন নিরাপদে থাকে, বললেন রেহানা। হ্যাঁ, ওদের নিরাপত্তাই সে চাইত।

ফয়েজ বলেছিলেন, ‘মিলড, এ জায়গাটা বাচ্চাদের জন্য নিরাপদ নয়। সামরিক আইন, ধর্মঘট, রাস্তায় রাস্তায় মিছিল—মোটেই নিরাপদ নয়। আমি আর আমার স্ত্রী সেজন্যই ওদের লাহোরে নিয়ে যেতে চাই।’

লাহোর। নতুন নতুন রাস্তা আর সুদৃশ্য দৃষ্টিনকোঠায় ভরা এক উদ্যাননগরী। হাজার মাইল দূরে, ভারতের আরেক প্রান্তে সেই শহর। ফয়েজ সম্পর্কে রেহানার

ভাঙুর। পেশায় ব্যারিস্টার, বিপুল ধনী। তাঁর স্ত্রী ফোলানো ঠোঁটের দীর্ঘাঙ্গিনী ও নিঃসন্তান মহিলা। তিনি তৃষ্ণার্ত চোখে তাকিয়ে থাকেন বাচ্চা দুটোর দিকে।

ফয়েজ রেহানাকে কখনোই পছন্দ করতেন না। এর কারণ ইকবালের অতিরিক্ত স্ত্রীভক্তি। রেহানা গোসলে ঢুকলে ওর চপ্পল জোড়া বাথরুমের দরজার কাছে রেখে দিতেন ইকবাল, অলিভ অয়েল দিয়ে মালিশ করে দিতেন বউয়ের পা। সবসময় কথা বলতেন নম্র স্বরে। সবার চোখেই এসব ধরা পড়ত। ফয়েজ ইকবালকে বলতেন, ‘দ্যাখো, তুমি কিন্তু বউকে একদম মাথায় তুলে ফেলছ।’ ওদের ধানমণ্ডির বাড়ির উল্টো দিকের বাসিন্দা মিসেস চৌধুরী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতেন, ‘আপনার বর তো একজন সাধু পুরুষ।’

ফয়েজ জজ সাহেবকে ক্লিওপেট্রার ঘটনাটা বলেন। রেহানা বাচ্চাদের ক্লিওপেট্রা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। ক্লিওপেট্রা কি বাচ্চাদের দেখানোর মতো ছবি? রেহানা টের পান, জজ সাহেব মনে মনে এলিজাবেথ টেইলরের বুকের মাপজোখ করছেন। ফয়েজ তারপর কয়েনের কাহিনীটা বলেন। আট বছর আগে রেহানা আলী নামে কলকাতার এক অভিজাত ঘরের তরুণীর সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব পান ইকবাল। রেহানার বাবা লোকজনের প্ররোচনায়, তার চেয়েও বেশি নিজের কপালের দোষে, বিস্তর সয়-সম্পত্তি খুইয়েছেন। ইকবালের বয়স তখন ছত্রিশ, বীমার ব্যবসা চলছিল ভালোই। তাহলে বিয়ে করা নয় কেন? কেন নয়? ইকবাল একটা কয়েন ছুঁড়ে লটারি করেন, ঝট করে এক নজর তাকান ফল দেখার জন্য, তারপর ঘুমাতে চলে যান। পরদিন সকালেই খবর পাঠিয়ে দেন যে তিনি বিয়েতে রাজি।

এমন গল্প রেহানা কখনোই বিশ্বাস করেননি, কারণ বাজিতে বিশ্বাস করার মতো মানুষ ইকবাল মোটেও ছিলেন না। তাঁর কারবার ছিল বীমা নিয়ে, আর বীমা মানে তো নিরাপত্তার কারবার। দৈব-দুর্বিপাক এড়িয়ে চলা। পরিণাম পাশ কাটিয়ে চলা। বিয়ের আগে হয়তো তিনি অন্য রকম ছিলেন। ফয়েজের হতাশার কারণও হয়তো সেটাই। বিয়ের পরে ভাইটি আর তাঁর নিজের ভাই থাকেনি।

রেহানার উচিত ছিল কয়েকটি মরিচ পুড়িয়ে ইকবালের মাথার চারপাশে ঘুরানো বা অন্ততপক্ষে একটা ছাগল সদকা দেয়া। কিন্তু তিনি এর কোনোটাই করেননি। তাই তো ইকবাল দুম করে মরে গেলেন। জানুয়ারির একটি দিন, বাড়ির সামনে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেলেন, তাঁর হাতের লাঠিটা গড়াতে গড়াতে গিয়ে পড়ল রাস্তার পাশের নর্দমায়, আর তাঁর একটি হাত ওয়েস্টকোটের পকেট হাতড়াচ্ছিল হাতঘড়িটার জন্য, যেন রেহানার কাছ থেকে বিদায় নেয়ার মুহূর্তটা জেনে রাখা তাঁর জন্য খুব জরুরি। অস্ফুট স্বরে বলেছিলেন, ‘মাফ কার দো।’

আর রেহানা হয়ে গেলেন বিধবা; কিছুই বলার রইল না, ধারে-কাছে রইল না

কোনো পরিজন। রেহানার বাবা-মা মারা গিয়েছিলেন আগেই। তিনটি বোন থাকত করাচিতে। সেই সময়টাতেই ফয়েজ আর পারভিন প্রস্তাব দেন ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে যাওয়ার। বলেছিলেন, ছুটিছাটায় দেখা হবে। ‘মাত্রই তো কয়েকটা বছর,’ রেহানাকে বলেছিলেন পারভিন, ‘তুমি এর মধ্যে সামলে উঠবে।’ যেন এটা সেরে ওঠার মতো কোনো অসুখ, যেমন অসুখ পেয়ে বসেছিল দেশটাকে।

কিন্তু রেহানা যখন রাজি হলেন না, তখন ফয়েজ ও পারভিন আদালতের আশ্রয় নিলেন।

জজ সাহেবের দিকে ফিরে ফয়েজ বললেন, ‘মিলড, মিসেস হক বিপর্যস্ত, তার বিশ্রাম দরকার। আমাদের চিন্তা এখন শুধু বাচ্চাগুলোকে নিয়ে।’

রেহানা যে মানুষটিকে বিয়ে করেছিলেন তাঁকে ভালোবাসবেন বলে ভাবেননি, যখন ভালোবেসেছিলেন তখন ভাবেননি যে তাঁকে হারাতে হবে। সাদাসিধে একটা জীবন তাঁর, যে-জীবনে বিস্ময় বা চমক বলে তেমন কিছু নেই। রেহানা বাবার কাছে এমন একটা স্বামী চেয়েছিলেন যার তেমন উচ্চাভিলাষ থাকবে না। এমন একজন মানুষ, যার হারাবার মতো ধনসম্পদ থাকবে না।।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। কবরের ছায়া পড়ে তাদের পায়ের কাছে।

মায়া বলে, ‘আম্মু, খিদে পেয়েছে।’

রেহানা আগে থেকেই এক প্যাকেট গ্লুকোজ বিস্কুট নিয়ে আসার কথা ভেবে রেখেছিলেন। গোলাপি মোড়ক ছিঁড়ে বললেন, ‘নাও।’

সোহেল মূর্তির মতো ঠায় দাঁড়িয়ে বাবার কবরের দিকে চেয়ে ছিল। সে বলে, ‘চলো, বাসায় যাই।’

‘আর কিছুক্ষণ।’ ইকবালকে তাঁর সব কথা বলা শেষ হয়নি। ‘যাও না, দেখো চেষ্টা করে, ঘুড়িগুলো ওড়ানো যায় কিনা।’

নাটাই থেকে সুতো ছাড়তে ছাড়তে বাচ্চারা কবরস্থানের প্রান্তে থাকা মাঠে ছুটে যায়।

রেহানা আবার শুরু করেন।

প্রিয়তম,

তোমার রাখিয়া যাওয়া মানিক আমি হারাইলাম। জিজ্ঞাসাবাদ যখন জানিতে চাইলেন আমি বুকে ধরিয়া বাচ্চাদের মানুষ করিতে পারিব কিনা, আমি হ্যাঁ বলিবার মতন শক্তিই পাইলাম না। আমি জবান হারাইয়া ফেলিলাম, আর তাই দেখিয়া তিনি আমার দোটানা ধরিয়া ফেললেন। তাতেই তিনি বাচ্চাদের দূরে পাঠাইয়া দিলেন। আমিই দায়ী। সব ভুল আমারই। অন্য কারো নহে। তোমার ভাই যে তাহাদের

চান, তার কি দোষ দিব। কে তাহাদের বুকে টানিয়া লইতে চাহিবে না? ওদের চেহারা-ছবি যে বিলকুল তোমার মতোন।

রায় ঘোষণার পর রেহানা সেই তপ্ত ঘরে হাঁটু মুড়ে বসে পড়েন, যেখানে ধুলোর আস্তুর জমা সিলিং ফ্যান, মখমলে মোড়ানো কালো বেঞ্চ আর উষ্ণকুশ পরচূলাপরা বিচারকরা ছিলেন। কাউকেই তিনি বোঝাতে পারেন না যে তিনি নির্ধন হতে পারেন, এই শহরে তাঁর কোনো বন্ধু-বান্ধব না থাকতে পারে এবং শুধু এক খণ্ড জমি যা কিছুদিন আগেও ধানখেত ছিল—যেখান থেকে পোকামাকড়ের ঝাঁক উঠে আসত তাঁর ছোট্ট বাংলায় আর প্রত্যেক ভোরে ফজরের নামাজ পড়তে ওঠার সময় তাঁকে সেগুলো পুড়িয়ে মারতে হতো—সে রকম এক টুকরো আগাছাপূর্ণ জংলা জমি ছাড়া আর কিছুই তার না থাকতে পারে; তবু তো তিনি তাঁর সন্তানদের মা। তিনি তখনো বাচ্চাদের সত্যি করে বলতে পারেননি তাদের বাবা কোথায় গেছেন, স্কুলে না পাঠিয়ে কেন তাদের ঘরে বসিয়ে রেখেছেন, তাদের ক্লিওপেট্রা দেখাতে নিয়ে গেছেন; তারপরও তিনি তাদের মা; তাঁর বেদনা, তাঁর দারিদ্র্য, তাঁর যৌবনকে জয় করার একটা উপায় তিনি খুঁজে পাবেন; একাই ওদের স্নেহ-মমতায় আগলে রাখার একটা পথ করে নিতে পারবেন। কিন্তু কেউ তাঁকে বিশ্বাস করেনি; কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তারা তাদের মাকে ছেড়ে উপমহাদেশের অপর প্রান্তে উড়াল দেবে; আবার কবে তিনি তাদের দেখতে পাবেন সেটাও তাঁর জানা ছিল না।

ক’দিন পরেই ফয়েজ আর পারভিন পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ০১০ যোগে বাচ্চাদের লাহোরে নিয়ে যান। বিদায় জানাতে আসা লোকজনের হাতের ছাপ আর চুলের তেলে ঘোলা বিমানবন্দরের জানালার এ পাশ থেকে তাদের চলে যেতে দেখেন রেহানা। তিনি মৃদু হাত নাড়েন, আর ভাবেন কবে এসবের অবসান হবে। মায়া আর সোহেল, ঘুড়িগুলো তখনো তাদের হাতে, তারা সিটিসেন্ট বেঁধে নেয়, সাবলীলভাবে বিমান উড়ে যায় আকাশে, নিচে পড়ে থাকে প্রাকৃতিক বদ্বীপ।

পরদিন পারভিন ফোনে জানান, ওরা নিরাপদে পৌঁছেছে। কিন্তু লম্বা দূরত্বের জন্য টেলিফোন লাইনের ঝনঝনানিতে রেহানা পারভিনের কথাগুলোর খুব সামান্যই শুনতে পান; তার কানে আসে কেবল পারভিনের পরিশীলিত বাঁকা হাসির শব্দ, সে হাসিতে একই সাথে ছিল আস্থা, আর ছিল এক সঙ্কট রকমের আক্ষেপ।

তার পরের দিনগুলোতে অনেকেই রেহানাকে দেখতে আসে: ব্যবসায়িক সূত্রে ইকবালের পরিচিত লোকজন, আসেন বাবার বন্ধুর পরিচয়ে কিছু বয়স্ক মানুষ, রগড় করতে আসে লতায়-পাতায় জড়ানো আত্মীয়-স্বজনেরা, ঢাকা জিমখানা

ক্লাবের জিন-রামি খেলার বন্ধুরা, এমনকি উকিল সাহেব পর্যন্ত। রেহানার মনে হয়েছিল সবাই আসছে তার শোক দেখার জন্য, যেন শোক কোনো দর্শনীয় বস্তু; তাই তিনি দরজায় তাদের টোকার শব্দ শুনেও না শোনার ভান করতেন।

কিন্তু মিসেস চৌধুরী তাঁর মেয়েটিকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এসেছিলেন, মেয়ের চোখে তখন পানি, মেয়ে শোকে কাতর। মিসেস চৌধুরী গোলগাল বাহু দুটি দিয়ে জড়িয়ে ধরেছিলেন রেহানাকে, আর নিজের মেয়েকে ধমক দিয়েছিলেন মুখ ভার করে থাকার জন্য।

‘সিলভি, কেয়ামত হয়ে যায়নি। ওরা ফিরে আসবে।’ এই বলে মেয়েকে ধমকে তিনি ফিরেছিলেন রেহানার দিকে, ‘আপনার তো ক’টা বছর অন্তত সুখে কেটেছে। আর আমার, ছেলে জন্ম দিতে পারলাম না বলে মিনসে তো আমাকে ফেলে চলে গেল। এইটাকে শুধু এক নজর দেখেছে, তারপর আর সারা জীবন ওর পাত্তা পেলাম না।’

রেহানা বাগানের দিকে চেয়ে নিখর বসে ছিলেন। শেষে মিসেস চৌধুরী বলেছিলেন, ‘থাক, বেচারিকে এবার একটু রেহাই দিই।’

সিলভি রান্নাঘরের দরজার আড়ালে অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল। ‘নয় বছর বয়স!’ মিসেস চৌধুরী এবার চৈঁচিয়ে উঠলেন। ‘বাচ্চাদের মতো মন খারাপ করার বয়স নাই, আবার প্রেমে পড়ার বয়সও হয়নি। আচ্ছা, কী ভাবছিস, কোনো ছেলে আর তোকে বিয়ে করবে না?’

রেহানা বললেন, ‘থাকুক না। আমরা একসঙ্গে খেয়ে নেব।’ তিনি ভাবার চেষ্টা করলেন, মেয়েটিকে কী খেতে দেয়া যায়। বাজার-সদাই করা হয়নি। ঘরে আছে শুধু কিছু করলা আর ত্যালতেলে পাতলা ডাল।

‘আপনি বলেছিলেন, আমরা সবাই মিলে *রোমান হলিডে* দেখতে যাব।’

‘সে আরেকবার যাব, ঠিক আছে সিলভি?’

‘আচ্ছা, ওরা যদি ফিরে আসে।’

সে চলে গেল। রেহানা আর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে যান না।

রেহানার চোখের সামনে দিনগুলো গড়িয়ে যায়। তিনি শুধু ছেলে আর মায়াকে চিঠি লিখতে শুরু করেন :

এ বছর আম খুব ভালো হইবে। ঠিক সময়মতো গরম পড়িয়াছে, বৃষ্টিও হইয়াছে। এখনই আমি গাছ হইতে আমার ঝোলের গন্ধ পাইতেছি।

তিনি চিঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দেন। আরেকটা চিঠিও ছুঁড়ে ফেলে দেন, যার শুরুটা ছিল এই :

আমার সোনাগণিরা, খালি তোমাদের কথাই মনে পড়ে।

তিনি লেখেন হাসিখুশিভরা নানা খবরে ঠাসা চিঠি। বাচ্চাদের মনে কোনো ধন্ধ রাখা চলবে না। এইসব জরুরি কথা ওদের জানানো দরকার:

তিনি ওদের ফিরিয়ে আনবেন।

পৃথিবী এখনো মোটের ওপর একটা বন্ধুত্বপূর্ণ জায়গা।

সিলভি ওদের ভুলে যায়নি।

এই পাড়াটি সবসময় যেমন ছিল, একদম সে রকমই আছে।

রেহানার মানসপটে তাঁর সন্তানদের স্মৃতি ক্রমে দূরতীক্রম্য হয়ে ওঠে, ঝাপসা হয়ে আসে। তিনি যতই তাদের আঁকড়ে ধরতে চান, তারা যেন ততই দূরে সরে সরে যায়। ওদের সম্পর্কে যা-কিছু জানা হয়েছিল, সেইসব মনে অটুট রাখার চেষ্টা করেন তিনি। যেমন, মায়ার প্রিয় রং নীল আর সোহেলের প্রিয় লাল। সোহেলের থুতনিত, চোয়ালের সন্ধির ঠিক নিচে, ছোট্ট একটা দাগ। রেহানা এ নিয়ে ওকে অনেক খ্যাপাতেন; বলতেন ‘এই দাগটা শুধু তোমার বউই দেখতে পাবে, তোমার মুখের নিচে দাঁড়িয়ে ঠিক ওপরের দিকে ওকে তাকাতে হবে।’ সোহেল খুব গুরুতর ভঙ্গিতে বলত, ‘আর মেয়েটা যদি হয় ভীষণ লম্বা?’

তাঁর ছেলের বেশ রসবোধ ছিল। না, ও তো ছিল একদমই বেরসিক একটা ছেলে। হাসতই না বলতে গেলে। কোনটা ঠিক?

ছেলেমেয়ে দুটিকে আলাদা করে ভাবার মধ্যে তিনি স্বস্তি খুঁজে পেতেন। কোনটা ছল্লোড়ে আর চাই-চাই স্বভাবের ছিল, আর কোনটা ছিল শান্ত ও সতর্ক। কে পাখিদের উদ্দেশ্যে গান গাইত এটা দেখার জন্য যে তার জবাবে পাখিরাও গাইতে শুরু করে কিনা। কোনটির নখের দিকে লক্ষ্য রাখতে হতো, কারণ ওর অভ্যাস ছিল খুবলে মাটি খাওয়ার। শীত বা প্রচণ্ড গরম যাই হোক না কেন, কোনটির সর্দি লাগত। কোন সন্তানটি রঙ্গনের ঝোপ থেকে ছোট ছোট ফুল ছিঁড়ে লাল রস গুঁষে খেত। কোনটি খালি করত বকবক, আর কোনটি কোনো কথাই বলত না। কোন সন্তানটির পছন্দ ছিল ক্লার্ক গ্যাবল, আর কোনটি ভ্যালোবাসত দিলীপকুমারকে, রাস্তার ছন্নছাড়া নেড়ি কুকুরগুলোকে, আর সেইসব শাককে যারা তীক্ষ্ণ নখ আঁকড়ে বসত, কোনটি ভ্যালোবাসত দুধভাত আর স্ট্রোবেরি আইসক্রিম।

ইকবাল যে সারাটা ক্ষণ শুধু ওদের নিয়ে ভাবতেন, তাও মন থেকে সরাতে পারেন না রেহানা। ঠাণ্ডা নেই তবু জোর করে সেইসব পরানো; প্রতি মাসে নিয়ম করে ডাক্তার এনে কান পেতে ওদের ছোট্ট ফুঁক পরীক্ষা করা; ভিড় বা ফাঁকা যা-ই হোক, রাস্তায় হাত ধরে থাকা—যদি কিছু হয়, যদি কিছু হয়, যদি কিছু হয়। তারপর সেই রেলভ্রমণ, যেটা ওরা প্রায় করতেই পারে নি।

মায়ার সেটা চতুর্থ জন্মদিন। বিলাত থেকে সবে ইকবালের নতুন ভব্বল এসেছে। ১৯৫৭ সালে ভব্বলের কারখানা লন্ডনের ওয়াডসওয়ার্থ থেকে বিশেষ

জাহাজে করে পঞ্চাশটা গাড়ির একটা চালান আসে ঢাকায়। নতুন ধাঁচের রেডিয়েটর আর ঘোরানো স্টিয়ারিংয়ের ঝকঝকে এই টোকস গাড়ির খবর ইকবাল জেনেছিলেন এক বিজ্ঞাপন থেকে। গাড়ির একটা ছবিও ছিল। ইকবাল গাড়িটার প্রেমে পড়ে যান: মসৃণ বাঁক, খাপ থেকে বেরিয়ে আসা সাইডভিউ মিরর। তিনি কল্পনা করেছিলেন, নিজের হাতে চালিয়ে গাড়িটা গ্যারেজে নিয়ে এলেন, গাড়ির ছাদের চারপাশ মস্ত এক ফিতায় বাঁধা, থেকে থেকে গর্জন করছে গাড়িটার ভেঁপু। কিন্তু গাড়িটা যখন সত্যিই এসে পৌঁছাল, তখন এতই ঘাবড়ে গেলেন যে নিজে গাড়ি চালানোর সাহস পেলেন না; বরং ঠিক করলেন একজন চালক রাখার, যে কিনা ছিল ব্রিটিশ কনসাল জেনারেলের সাবেক কর্মচারী, যে হিজ এক্সেলেন্সির রোলস রয়েস চালাত এবং ড্রাইভিং হুইলের পেছনে ছিল এক পাক্কা ওস্তাদ। তার নাম কামাল। তেজগাঁও-ফুলবাড়িয়া ট্রেনের জানালা থেকে মায়া যেদিন ওর বাবাকে হাত নেড়েছিল সেদিন ভল্ললটা চালাচ্ছিল এই কামাল।

মায়ার জন্মদিনের বিশেষ আয়োজন হিসেবে ওরা ঠিক করেছিল, ফুলবাড়িয়া থেকে শহরের প্রান্তে নতুন স্টেশনটা পর্যন্ত ট্রেনে করে ঘুরবে। লাইনটা সবে খুলেছে। আশাবাদী সরকারের নবনির্মিত উজ্জ্বল রঙছোপানো স্টেশন থেকে ব্রিটিশরাজের জুড়িগাড়ির সাবেকী আস্তানা ধ্বস্তপ্রায় ইমারত অবধি যাত্রাপথের দূরত্ব এখন সামান্য। এ ছিল ওদের একেবারে প্রথম রেলভ্রমণ।

রেহানা সেদিন কাবাব তৈরি করেছিলেন। ইকবাল মেঘের গতিবিধি পরখ করে ঝড় আসছে বলে বাতিল করতে চেয়েছিলেন পুরো আয়োজনটা। কিন্তু তখন কেবলই অক্টোবরের শীতল স্নিগ্ধ হাওয়া বইছিল আর আকাশে ছড়িয়ে ছিল আলোর ঝালর। কামাল গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে দরজা খুলে ধরেছিল ওদের জন্য। ইকবাল সবাইকে পেছনে উঠে বসতে বলেন। প্রথমে বসে মায়া, ওর গায়ে ছিল রেহানার হাতের তৈরি স্যাটিনের হালকা নীল জন্মদিনের ফ্রক। নেটের পেটিকোটের কারণে জামাটা বাঁকা হয়ে ফুলে ছিল। ওর চুলগুলো নীল ফিতায় বাঁধা। ও বহু কষ্টে রাজি করিয়েছিল ঠোঁটে হালকা গোলাপি লিপস্টিক বুলিয়ে দিতে। সেটা রক্ষা করার জন্য সে ঠোঁট চোখা করে বসে ছিল। রেহানা গাড়িতে জুত হয়ে বসে কোলের ওপর রেখেছিলেন খাবারগুলো। তারপর সোহেল আর ইকবালকে তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে বসতে ইশারা করে। কিন্তু বাইরে ততক্ষণে ওদের মধ্যে তর্ক বেঁধে গিয়েছে :

‘আব্বু, পেছনে তো কোনো জায়গা নেই।’

‘কিন্তু তুমি সামনে বসতে পারবে না, এটা খুবই বিপজ্জনক।’

‘উফ্, আব্বু, আমি তো এখন আর বাচ্চা ছেলে না!’ সোহেল মাটিতে পা ঠুকে বলেছিল।

‘দুর্ঘটনা ঘটতে কতক্ষণ? তুমি বড় না ছোট, সেটা কোনো কথা না। কোনো কিছু বাহ্যবিচার করে তো দুর্ঘটনা ঘটে না।’

রেহানা এবার জানালার কাচ নামান। তিনি ছেলেকে বলেন, ‘সোহেল, আব্বু যা বলে তাই করো।’

শেষমেশ সোহেল আপন মনে গজগজ করতে করতে গাড়িতে ওঠে, ওর পরে ওঠেন ইকবাল। গাড়ির পেছনটায় চারজন বসায় বেশ চাপাচাপি হচ্ছিল। মায়ার জামাটা ওর সামনে ছোট নীল ঢেউয়ের মতো ফুলে থাকে। কুঁচকে যায় ইকবালের সাদা শার্কস্কিন সুট। রেহানার মনে হয়, আসলেই তো, ইকবাল ছেলেটাকে সামনের আসনে ড্রাইভারের পাশে বসতে দিলেই পারত। প্রচণ্ড গরম। তিনি দুর্বিনীত ভঙ্গিতে জানালার কাচ নামিয়ে দিয়ে ইশারা করে সোহেলকেও ওর দিকের জানালাটা নামিয়ে দিতে বলেন। মায়ার চুলের ফিতাগুলো বাতাসে কাঁপে।

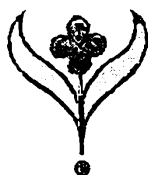
তেজগাঁও পৌঁছানোর আগে ভ্রমণ নিয়ে ইকবালের দুশ্চিন্তা আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। যদি ওরা ট্রেনে আটকে যায়, অন্যরা কীভাবে খবর পাবে? স্টেশনে পৌঁছাতে কামালের দেরি হয়ে গেলে কী হবে? মনে মনে সমস্ত অঘটনের একটা হিসাব তিনি কষে ফেলেন। কামাল যখন ওদের তেজগাঁও স্টেশনে নিয়ে আসছে, তাঁর মাথায় একটা ভাবনা উঁকি দেয়।

‘রেহানা, তুমি বাচ্চাদের নিয়ে যাও। আমি ঠিক করেছি, আমি থেকে যাব।’
‘মানে?’

‘আমি কামালের সঙ্গে গাড়িতে থাকব। ট্রেনের পাশে পাশে আমরা গাড়ি চালিয়ে যাব। যদি কিছু ঘটে যায়, তোমরা ট্রেন থেকে নেমে এসে গাড়িতে উঠে পড়বে।’ কী বুদ্ধি!

সেটাই তারা করেছিল। রেহানার স্পষ্ট মনে আছে : মানুষটা গাড়িতে, আর পরিবারের বাকি সবাই ট্রেনে; ট্রেনের বগিটা নতুন রেললাইনের ওপর, আর নতুন বিদেশি গাড়িটা চলছে রেললাইনের লাগোয়া সড়ক ধরে; কাবাব আর লেবুর শরবতের স্বাদ ওদের জিভে দীর্ঘক্ষণ লেগে ছিল, আর তাঁর স্বামী অসুস্থত্বের সঙ্গে ভেবেছিলেন, তাঁর পরিবারকে আর কোনো অঘটনের মুখে পড়তে হবে না; কারণ তিনি, ইকবাল, এটা পুরোপুরি নিশ্চিত করেছেন।

মার্চ ১৯৭১



সূর্যের দিকে পেছন ফেরা সোনা



ছেলেমেয়েদের নিয়ে দেশে ফিরে আসার দিনটি স্মরণ করতে রেহানা প্রতিবছর ধানমণ্ডির ৫ নম্বর রোডে আলাদা অনুষ্ঠান করেন। নিয়মিত রান্নার বরাদ্দ থেকে মাংস বাঁচিয়ে তা দিয়ে বিরিয়ানি রাঁধেন। চেয়ার ভাড়া করে আনেন, হালাইকর ডেকে এনে বাগানে বসিয়ে দেন জিলাপি বানাতে; গরম গরম জিলাপি ভাজা হয়, মিষ্টি শিরায় চুবানো হয় সেগুলো। যদি বৃষ্টি আসে সে-কথা ভেবে টাঙানো হয় একটা লাল-হলুদ শামিয়ানা; গরমে প্রশান্তির জন্য করা হয় লেবুর শরবত আর শসার সালাদ ও রাইতা। প্রতি বছরের মেহমানরা অবশ্য একই : মেয়ে সিলভিকে নিয়ে আসেন প্রতিবেশী মিসেস চৌধুরী, ভাড়াটে সেনগুপ্ত-দম্পতি ও তাদের ছেলে মিঠুন, আরো আসেন মিসেস রহমান ও মিসেস আকরাম, সবাই যাদের জানেন জিন-রামি খেলার ভাবী হিসেবে।

দশ বছর ধরে যেমন চলে আসছে, প্রতি মার্চের প্রথম সকালের মতো রেহানা সেদিনও কাকডাকা ভোরে উঠে বাগানে যান। ঠাণ্ডায় তাঁর গায়ে একটু কাঁটা দেয়। কনুইয়ে হাত বোলাতে বোলাতে উঠানের ঘাস মাড়িয়ে যান তিনি। গাছেদের পাতায় পাতায় আর বঙ্গীয় বঙ্গীপ জুড়ে ভেসে আসা কুয়াশায় তখনও প্রলম্বিত শীতকাল; যে-কুয়াশা ভেসে থাকে বাংলার ওপরে।

শিশিরে নুয়ে পড়া গোলাপের ঝোপে রেহানা আঙুল ঢুকিয়ে দেন, তুলে নেন

একটা ফুল। ফুল হাতে নিয়ে তিনি সারা বাগান ঘুরে বেড়ান। দেয়ালঘেঁষা বেলি আর জবা গাছের মাঝখানটা উপকে, মৌসুমের শেষ ফুলকপি জোগান দেয়া ছোট সবজিক্ষেত পার হয়ে, আঁকাবাঁকা পথে পেরিয়ে যান আমগাছ, লেবুগাছ আর গাঢ় সবুজ কলাগাছ।

তিনি চোখ তুলে পাশের দালানের দিকে তাকান, যেটি দিন গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে দীঘল ছায়া ফেলবে তাঁর ছোট্ট বাংলোটর ওপর। সোনা। বাংলোর পেছনের খোলা জায়গাটায় মিসেস চৌধুরী যে নতুন একটা বাড়ি বানাতে বলেছিলেন, সে কথা এখনো রেহানার কানে বাজে। ‘এত বড় জায়গা,’ জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলেছিলেন মিসেস চৌধুরী, ‘এত বড় যে সীমানাটা পর্যন্ত দেখা যায় না। অতটা জায়গা তো দরকার নাই তোমার।’

‘বিক্রি করে দেব?’

‘না, বিক্রি করবে কেন?’ তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন মিসেস চৌধুরী।

‘তাহলে?’

‘আরেকটা বাড়ি বানাও।’

‘আরেকটা বাড়ি দিয়ে আমি কী করব?’

‘ভাড়া দেবে গো, ভাড়া।’

এখন এখানে দুটো গেট, দুটো পথ, দুটো বাড়ি। ঢোকার নতুন সরু রাস্তাটা চলে গেছে রেহানার জমির পেছন দিকে। বাচ্চাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে তৈরি-করা বাড়িটা এখন জমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। চুনকাম করা মাথা ছড়ানো দোতলা বাড়িটা ঝুঁকে দেখছে ছোট বাংলাকে। বাংলোর মতো এ বাড়িটাও সূর্যের দিকে পেছন ফেরা। দশ বছর প্রায় হয়ে এলো বাড়িটার, এখন একটু মলিন দশা। দশ-দশটি বর্ষা এর চাকচিক্য ক্ষয়ে ফেলেছে, জন্ম দিয়েছে ফাটল। দেয়ালে বয়সের বিক্ষিপ্ত বলিরেখা। কিন্তু এখনো প্রতিদিন ফজরের ওয়াক্তে বিছানা ছাড়ার সময় বা ধোয়া কাপড়চোপড় বাগানে মেলে দিতে দিতে কিংবা গোসলের পর বারান্দার চেয়ারে দীর্ঘ চুল শুকাতে শুকাতে গর্ব আর চিনচিনে ব্যর্থ হয়ে রেহানা বাড়িটার দিকে তাকান। কী তিনি হারিয়েছেন আর কী পেয়েছেন সেসব মনে করিয়ে দিতেই যেন বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। সেই অর্জনটুকুর জন্য কতটা মাসুলই না তাকে গুনতে হয়েছে। তা-ই এই বাড়িটার নাম রেখেছেন তিনি সোনা। বাড়িটা তুলতে এত কিছু যে তাকে খোয়াতে হয়েছে, সে কারণেই শুধু নয়; তার প্রাণের চেয়ে প্রিয় মানিক আর কখনো তিনি হারাতে চাননি বলেও।

রেহানা বাংলায় ফিরে বসার ঘরে ঢোকেন। হাত বোলান সোফার মসৃণ মখমলে, খাবার টেবিলের টোল খাওয়া কাঠে। দাগপড়া, মমতায় ভরা, চুনকাম মুছে যাওয়া বারান্দার দেয়ালে।

তারপর কেবলার দিকে জায়নামাজ বিছিয়ে নামাজে দাঁড়ান।

এভাবেই দিনটার শুরু: সূর্য ওঠার আগে জেগে ওঠা, বাড়টাকে অনুভব করা; নামাজ পড়া, ছেলেমেয়েদের ঘুম থেকে ডেকে তোলা।

ওরা অবশ্য আর বাচ্চা নেই। এ সত্যটা বারবার নিজেকে মনে করিয়ে দিতে হয় তাঁর। একজন উনিশ, আরেকজন সতেরো—ওরা তো প্রায় বড়ই হয়ে গেল। রেহানা এই প্রায়টাকে লোভীর মতো আঁকড়ে ধরে থাকেন। কিন্তু তিনি জানেন, এটা আর বেশি দিন চলবে না: ওরা বড় হয়েছে কি হয়নি তা নিয়ে এই দোটানা আর বেশি দিন থাকবে না। এখনই ওরা যেন কত দূরের মানুষ হয়ে গেছে, কী দ্রুতই না ওরা ছুটে চলেছে নিজেদের পথে, যেখানে আগের মতো তীব্রভাবে মায়ের প্রয়োজন বোধ হবে না।

রেহানা মশারিটা তুলে মায়ার কাঁধে হালকাভাবে নাড়া দেন। ‘এবার ওঠো, জান,’ তিনি বলেন, ‘আজ আমাদের অনুষ্ঠান!’

তিনি সোহেলের ঘরের দরজায় গিয়ে টোকা দেন, কিন্তু ওর ঘুম ভেঙেছে আগেই। গোলাপটি বাড়িয়ে ধরে তিনি ছেলেকে বলেন, ‘তোমার জন্য।’

ছেলেমেয়ে দুটি গোসলের জন্য গেলে এই ফাঁকে রেহানা ওদের নতুন কাপড় ইস্তিরি করেন। নিজের জন্য এ বছর তিনি বাছাই করেছেন হালকা নীল শাড়ি, মায়ার জন্য হলুদ বুটি তোলা নীল জর্জেট। সোহেলের জন্য খয়েরি কোর্তা-পাজামা। সেটির কলারের বেগুনি ফুল তিনি নিজে তুলেছেন।

মায়া বলে, ‘আম্মু, অনুষ্ঠানের পর আমাকে ক্যাম্পাসে যেতে হবে—এ শাড়িটা আমি পরতে পারব না।’

‘মাত্র একদিন সাদা কাপড় না পরলে তোমার বিপ্লবী বন্ধুরা কিছু মনে করবে না।’

‘তুমি বুঝবে না,’ শাড়ির কুঁচি সায়াতে গুঁজতে গুঁজতে মায়া জবাব দেয়।

ভাইবোন দু’জনেই গোসল সেরে নতুন কাপড় পরে রেহানার পা ছুঁয়ে কদমবুসি করে। ‘আল্লাহ তোমাদের ভালো করুক’ বলে তিনি ওদের শক্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। রেহানার গলা জড়িয়ে রইল ওর কন্যার সীমা প্রায় ছাড়িয়ে যাওয়া ওদের রোদে পোড়া সবল হাতগুলো।

ওরা দু’জনই তাঁর চেয়ে লম্বা হয়ে গেছে। মায়া রেহানাকে ছাপিয়ে উঠেছে কয়েক ইঞ্চি, সোহেলের কাঁধ আর মাথা ওদের দু’জনের উচ্চতা ছাড়িয়ে গেছে। ইকবালকে প্রথম দেখার মুহূর্তটা প্রায়শ মনে পড়ে রেহানার। বিয়ের মঞ্চে তাঁর মাথার ওপরে সে কেমন ঝড়ো মেঘের মতো অটল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সোহেলটা বড় হয়ে হয়েছে ঠিক মায়ের মতো। ওর গায়ের রং ফ্যাকাশে, মায়ের মতো ছোট নাক আর ঈষৎ আঁকাবাঁকা দাঁতের সারি। চুলগুলো মাথার সামনে

চেউয়ের মতো টেরি কাটা, যে কোনো সময় আছড়ে পড়বে চোখের ওপর। আজকের দিনটির মতো কখনো কখনো ও কোর্তা-পাজামা পরে বটে, তবে বেশি পরে হাল-ফ্যাশনেরই পোশাক: লম্বা কলারের আঁটোসাঁটো শার্ট, তার চেয়েও আটো প্যান্ট—যেটা জুতোর সুখতলি বরাবর ঝুলে ঝুলে রাস্তার ধুলোয় দাগ কেটে যায়।

মায়া দেখতে হয়েছে ওর বাবার মতো। বাবার সেই বাদামি রং; কোটরে বসা সেই একজোড়া চোখ যা ওর চেহারায় একটা গান্ধীর্ষ ধরে রাখে—এমনকি ও যখন কোনো রসিকতা বা মজার কাণ্ড করে, তখনও। এমন ঘটনা অবশ্য ঘটে কদাচিৎ। যখন ঘটে—রেহানা প্রায়ই খেয়াল করেন—ওর বন্ধুরা তখন থমকে গিয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকে।

ওরা দুটো রিকশা নেয়। সোহেল আর মায়া একটায়, পেছনেরটায় ওঠেন রেহানা। ওদের পেছনে থাকতে, রিকশার পর্দা-মোড়ানো ফোকর দিয়ে ওদের কাঁধে-কাঁধে ঠোকাঠুকি দেখতে রেহানার ভালো লাগে।

বোনদের সঙ্গে বহুদিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই রেহানার। ছেলেমেয়ে দুটো ফিরে আসার বছর কয়েক পর মার্জিয়া ঢাকায় এসেছিল। নিয়ে এসেছিল নিজের বাচ্চাদের ছবি। গোলগাল যমজ দুই ছেলে, বড়সড় চেহারা আর হাওয়ার ঝাপটে এলোমেলো চুল। করাচির রাস্তার নোনা গন্ধ আর ক্রিফটন সৈকতের ঝলসানো কাবাব নিয়ে অনেক বকবক করেছিল সে। আর রেহানার ডিমের হালুয়া ও ঢাকার তাজা বাতাস প্রাণভরে উপভোগ করা সত্ত্বেও ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একই প্রশ্ন করেছিল যে, স্বামী মারা যাওয়ার পরও কেন রেহানা পাকাপাকিভাবে করাচি চলে গেল না। সে বলেছিল, ‘সবাই তো ওখানেই থাকে, তোমার পরিবারের সবাই।’

বিমানবন্দরে পরস্পরকে বিদায় জানানোর সময় রেহানার বুকটা হু-হু করে উঠেছিল। তার মনটা আকুল হয়ে চেয়েছিল মার্জিয়া যেন এখানে আরো থেকে যায়, কেঁদে, মিনতি করে তাঁকেও সঙ্গে করে যেতে বলে; কিন্তু আসলে যখন মার্জিয়া চলে যায়, তখন তিনি হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন। মার্জিয়া এমন ব্যবহার করেছিল যেন রেহানা ওদের সবার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। যেমন সে বলেছিল, ‘তুমি তো আগে চমৎকার উর্দু বলতে, এখন তোমার উর্দু এত খারাপ হয়ে গেল কী করে? নিশ্চয়ই সারাক্ষণ বাংলায় কথা বল?’ বাংলাকে সে বলেছিল বুঙ্গালি। আর বাড়ির কাজের লোকজন সম্পর্কে বলতে গিয়ে সে বলেছিল, ‘হ্যাঁ, ভাগ্যটা খুব ভালো, আমাদের বাসায় দু’জন বুঙ্গালি আছে, অবশ্য রোকেয়ার আছে মাত্র একজন। তাতে ওর কুলোয় না। বোঝাই জে, ওখানকার বাসাগুলো কত্ত বড়।’

তারপরও এমন কোনো দিন নেই যেদিন রেহানা ওদের কথা ভাবেননি। কোথায় পড়ে আছে, কোন পশ্চিমে তাদের দেশের একটা অংশে। পুরোপুরি সংযুক্ত নয়, আবার সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নও না এমন একটা ঢিলেঢালা বোধ তিনি বুকের

ভেতর ধরে রাখেন। তিনি ওদের চিঠি লিখতেন। শুরু করতেন প্রিয় বুবুরা দিয়ে। কিন্তু কখনো চিঠি শেষ করতেন না, একটাও পাঠানো হতো না। চিঠিগুলো তিনি রেখে দিতেন খাটের নিচে শীতের কম্বল আর মুড়ির মোয়ার পাশে একটা বিস্কুটের টিনের মধ্যে।

ওদের রিকশা দুটো ৫ নম্বর রোড পার হয়ে নতুন পিচ-ঢালা নীলচে কালো মিরপুর রোড ধরে এগিয়ে যায়। রাস্তার লাগোয়া দোকানগুলো সব খুলতে শুরু করেছে, শাটারগুলো শব্দ করে উঠে যাচ্ছে, আর দোকানিরা পাশের নর্দমায নাক ঝাড়ছে।

কবরস্থানের ওপরে একটা ফলকে লেখা, মহিলাদের প্রবেশ নিষেধ। তার পাশে মরাটে হলুদ রঙের নতুন বেড়ায় কনুইয়ের ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল কেয়ারটেকার, যেটা ইতিমধ্যে কাদার ছিটায় মাখামাখি। সে রেহানাকে দেখে সালাম দিয়ে বলে, 'খুব গরম আজকে।' রেহানা মাথা নেড়ে সায় দেন, তারপর পাঁচ আনা পয়সা দেন তাকে। কবরগুলোর মাঝখান দিয়ে তাঁরা এগিয়ে গেলেন। যেতে যেতে রেহানা পুরোনো বন্ধুদের চিনতে পারলেন, আর দেখলেন কতক নতুনের আগমন ঘটেছে।

তেতাল্লিশ বছর ধরে প্রত্যেকটা দিন স্ত্রীর কাছে আসে একটা মানুষ। শোনা যায়, তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন বাচ্চা হওয়ার সময়। লোকটির বয়স এখন অনেক, কিন্তু টলোমলো পায়ে তিনি ঠিক ঠিক পৌঁছে যান স্ত্রীর কবরের কাছে, সেখানে একটা চৌকোণ পাটি বিছান এবং সেটির ওপর বসে ঘন্টার পর ঘন্টা তাকিয়ে থাকেন স্ত্রীর কবরের দিকে। তার মানে, এই কবরস্থানে যারা আসে, তাদের মধ্যে রেহানাই প্রয়াত স্বজনের এক নম্বর শোকাক্ত ভক্ত নন, তিনি নিজেকে দ্বিতীয় মনে করেন। ওই মানুষটির সঙ্গে রেহানার পরিচয় হয়নি, কিন্তু একদিন তিনি চলে যাওয়ার পর রেহানা তাঁর স্ত্রীর কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। বাঁধানো কবরটির গায়ে লেখা: বেগম হাকিমুল্লাহ হোসেইন, মাতা ও পত্নী।

এই কবরস্থানে ইকবালের কবরটি যেন সবচেয়ে পরিপাটি এবং যত্নে রাখা হয় তা রেহানা এই ক' বছরে নিশ্চিত ব্যবস্থা করে ফেলেন। সবাই যা করে রেহানাও সেভাবে শুরু করেছিলেন: কবরের ওপর গোলাপ ফুল রেখে যেতেন। কিন্তু আবার যখন যেতেন, কবরের বুকে বাসি পচা ফুলগুলো দেখে তাঁর মনে হতো তিনি ইকবালকে ঠকিয়েছেন। তিনি চাইতেন না ইকবালের কাছে গিয়ে মরা কিছু তাঁর নজরে পড়ুক। তাই তিনি কবরের কিনার ধরে কিছু চারা বুনে দেন, আর কয়েক সপ্তাহ পরেই সেখানে ছোট ছোট বেলি ফুল ফোটে; তারা অবিচলভাবে ওপরের দিকে বেড়ে ওঠে, এমন ভঙ্গি তাদের, যেন পথ দেখাচ্ছে। রেহানা সব সময় নিড়ানি আর পানির ক্যান নিয়ে এসে বেলি ফুলে ছাওয়া কবরের কিনার

কেটেছেটে দিয়ে নিখুঁত পরিপাটি করে তোলেন।

তিনি এখন ইকবালের কবরের পায়ের কাছে এসে দাঁড়ান, শিয়রের কাছের প্রাচীরে কালো অক্ষরের লেখাটা তার মুখোমুখি—মুহাম্মদ ইকবাল হক। সোহেল দাঁড়িয়ে তার বাম পাশে, মায়া ডানে। ওরা মোনাজাতের ভঙ্গিতে হাত তোলে।

এটা ঠিক এমন মুহূর্ত, যখন তাঁর গলা সর্বদাই বুজে আসে।

তিনি শুরু করেন, প্রিয়তম আমার, মাশালাহ, দশ বছর পুরো হলো তোমার বাচ্চারা ফিরে এসেছে। তোমার ছেলের বয়স এখন উনিশ। মেয়ের সতেরো। ওদের শরীর-স্বাস্থ্য ভালো, আর ওরা বেশ মেনে চলে আমাকে।

গতবার যখন এসেছিলাম, আমি তোমাকে নির্বাচনের কথা বলেছিলাম। এই মুহূর্তে আমরা অপেক্ষা করছি যে মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী বলে ঘোষণা করা হবে। অনেক টালবাহানা চলছে। তোমার সন্তানেরা সরকার বদলের অপেক্ষায় আছে। ইনশাআল্লাহ, সেটা হয়ে গেলেই ওরা আবার ওদের পড়াশোনায় ফিরে যেতে পারবে।

একটু থেমে তিনি একটা গভীর নিশ্বাস নেন। নিজেকে ধাতস্থ করেন।

আরও কত কিছুই না তিনি বলতে পারতেন। এখনো প্রতিদিন তোমার জন্য আমার মন খারাপ হয়। আমাকে একা ফেলে তুমি কেন চলে গেলে! কেন!

কিন্তু তিনি বলেন না। বলেন না কারণ ইকবাল যদি রেহানার কথা শুনতে পান, তবে সবকিছুই তো তাঁর জানা।

রেহানা হাতের তালু দুটি নিজের মুখের ওপর রেখে মোনাজাতের ইতি টানেন। প্রিয়তম, এবার তাহলে আসি।

রেহানা যখন মুখ তুললেন, দেখলেন সোহেলের গালে কয়েক ফোঁটা অশ্রু। মায়া কবরের গায়ে হাত বোলাচ্ছে। স্তম্ভের যেখানটা উঁচু, সেখানে সে ঝুঁকে পড়ে চুমু খেল।

বাংলোয় ফিরে এসে ওরা মেহমানদের আপ্যায়নের জন্য তৈরি হয়। মায়া বসার ঘরের আসবাবপত্রের ধুলো ঝাড়ে, আর সোহেল বাগানে শামিয়ানা খাটাতে ডেকোরেটরদের সাহায্য করে। আগের রাতেই রেহানা বিরিয়ানি রন্ধে রেখেছেন, ওপরে সব উপকরণ ছড়িয়ে দিয়ে হাঁড়িটা ময়দার ময়দা দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছেন। বিরিয়ানি রান্না হতে লেগেছে হয় কি সাত-দশটা, এখন তিনি ময়ান ছাড়িয়ে নিয়ে ঢাকনাটা তুললেন, তারপর মাংস, আলু আর পোলাও ভালো করে মেশাতে লাগলেন, যাতে মিশ্রণটা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

রেহানা প্লেটগুলো গুনে নিলেন। সব মিলিয়ে আসবে প্রায় কুড়ি জন মানুষ। প্রত্যেক বছর এই অনুষ্ঠানটার আগে তাঁর সবসময়ই একটু দুশ্চিন্তা হয়; জিমখানা

ক্লাবে যাওয়া বন্ধ করার পর থেকে বছরে যে অল্প কবার বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়, এই অনুষ্ঠানটা হলো তারই একটা।

ইকবাল মারা যাওয়ার পর ক্লাবে তার অনুপস্থিতির ব্যাপারটা সবাই বুঝতে পারেন। তাই তাঁরাই রেহানার কাছে আসতেন। রেহানার মনে পড়ে, মিসেস রহমান প্রায়শ কেক নিয়ে আসতেন। শক্ত, খাওয়ার অযোগ্য কেক, খাবার টেবিলের ওপর ইটের মতো পড়ে থাকত, মাছি উড়ত আর ধুলো জমত। মিসেস চৌধুরী আনতেন সিলভিকে। ওদের মধ্যে সবার ছোট মিসেস আকরাম তার চারপাশে বোকার মতো ঘুরঘুর করতেন, আর হাতপাখার ঝাপটে বাতাস থেকে মন্দভাগ্যের বদ-বুঁ উড়িয়ে দিতেন।

বাচ্চারা ফিরে আসার পর জিন-রামি খেলার মহিলারা বললেন, রেহানার তো আর দূরে সরে থাকার কোনো কারণ নেই। তাই লাহোর থেকে ফিরে আসার কয়েক মাস পর তিনি একবার চেষ্টা করেন তাঁর পুরোনো দলে ফিরে যেতে।

সেই দিন মিসেস চৌধুরী বেশ ফুর্তির মেজাজে ছিলেন, তাঁর চোখে খেলা করছিল হাসি। তিনি রেহানাকে বলেন, ‘দারুণ একটা চমক আছে!’ রেহানা তাঁকে আমলে নেন না। নিশ্চয়ই নতুন কোনো মিষ্টির দোকানের খোঁজ পেয়েছেন। রেহানা যেন শুনতে পেলেন শহরের সবচেয়ে ভালো লাড্ডুর কথা বলছেন মিসেস চৌধুরী। বিদুষ্টে আর নার্ভাস লাগে রেহানার। ঘরের ভেতরটায় বেশ গরম, সিলিং ফ্যানের শোঁ-শোঁ বাতাসে কোনো কাজ হচ্ছে না। আগে তিনি অনেকবার ক্লাবে গিয়েছেন, কিন্তু হঠাৎ করে সবকিছু তাঁর কাছে খুব অদ্ভুত মনে হতে থাকে, আর মিসেস চৌধুরীকে আনন্দোচ্ছল দেখে তাঁর একটু বিরক্তিই লাগে।

ফুল-তোলা টাইলে চারকোনা তাসের টেবিলটা সাজানো। নিচে মেয়েলি হাতে বাঁকানো হরফে ফুলের নাম লেখা। বুগেনভিলিয়া, হরফের সরব ঘোষণা। ইংলিশ রোজ। ড্যাফোডিল।

রেহানা বসে ছিলেন এক সারি হলুদ টিউলিপের দিকে মুখ করে। উল্টো দিকে মিসেস চৌধুরী বসে অ্যাস্টার আর লাইলাকের মাঝখানে। এক সারি ডালিয়ার ওপর তাস ফেলে শাফল করে নেন মিসেস রহমান। মিসেস আকরাম রূপালি সরু আয়নায় তাকিয়ে ঠোঁটে নতুন করে লিপস্টিক লাগান।

মিসেস রহমান রেহানাকে বলেন, ‘ঠিক আছে, এবার কাটেন।’

রেহানা তাসের বাউলটা দু’ ভাগে ভাগ করেন। মিসেস রহমান আবার শাফল করেন, হাত উঁচু করে আবার এক ঝটকায় নামিয়ে আনেন।

‘রাজা রানি গোলাম দশ করে, টেক্কা এক, আগের মতোই,’ টেবিলের চার কোণে তাস ছুঁড়ে মারতে মারতে বলেন।

দরজায় টোকা পড়ে। একজন ওয়েটার ট্রে ভর্তি চায়ের কাপ আর বিস্কুটের প্লেট নিয়ে ঢোকে, তার পরনে একটা কোট, যা কোনো এক কালে সাদা ছিল। ‘যাক,’ মিসেস চৌধুরী হেসে উঠলেন। ‘এখানে রেখে যাও। ঢালতে হবে না। যাও। যাও।’ মেঝে থেকে ব্যাগটা তুললেন আর ভেতর থেকে রূপালি রঙের ছোট্ট ফ্লাস্ক বের করলেন। মুখটা খুলে ভেতরের চা-রঙের পানীয় আলতো করে চারটা কাপে ঢাললেন। তারপর আসল চায়ে সেগুলো ভরে দিলেন; পাকা কেমিস্টের মতো দুধ মেশালেন।

‘এটা কী?’ মিসেস আকরাম আয়না থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন।

‘আরে বোকা, হুইস্কি,’ মিসেস রহমান বললেন।

‘কী হলো...খাও, এটা আমাদের পাওনা, ঈশ্বর তা ঠিকই জানেন।’

রেহানা দেখলেন, মিসেস রহমান তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছেন। কেউ নড়ল না; দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মিসেস চৌধুরী ট্রে থেকে একটা কাপ তুলে নিলেন। ‘ঠিক আছে, তোমাদের যা মজি।’ চোখ উল্টে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে যা-খুশি করো ধরনের ভঙ্গি করলেন। ছাতলা পরা ছাদের দিকে চেয়ে বললেন, ‘আমি ভাবলাম রেহানার একটু আধটু দুষ্টমিপনার দরকার আছে। হাজার হোক, ও তো আর বিয়ে করবে না।’

শেষ এই কথায় মিসেস আকরাম চাপা হাসি হেসে উঠলেন। হাসির খমক ছিল আটকানো, কিছুটা যেন নাক ডাকার মতো, সেই সাথে হাসি চাপতে হাত উঠে গেল মুখে।

কাপ থেকে হুইস্কির মিষ্টি স্বাদ পেলেন রেহানা। বললেন, ‘ঠিক আছে, আমি একটা নেব।’

‘সত্যি?’ মিসেস চৌধুরী আনন্দে প্রায় চৈঁচিয়ে উঠলেন।

‘হ্যাঁ, এর আগেও আমি চেখে দেখেছি।’ একবার ইকবাল তাঁকে দিয়েছিলেন। গ্লাসটা তাঁর ঠোঁটের কাছে ধরেছিলেন, পানীয়টা ঠোঁট স্পর্শ করা মুহূর্তেই সরিয়ে নিয়েছিলেন; রেহানার তখন জ্বরে তপ্ত চুমুর মতো লেগেছিল। তিনি কপ্টিটা তুলে নিয়ে ইতস্তত করে চুমুক দিলেন। অন্যরা ওর দেখাদেখি তা-ই করলেন, আর কাপে মুখ রেখে হেসে উঠলেন। মিসেস চৌধুরী নিজেরটা গলায় ঢেলে হাততালি দিয়ে উঠলেন।

খেলা শুরু হয়। প্রথম দানে রেহানা চারটা টেক্সাস হরতনের সারি নিয়ে জিতে গেলেন। দ্বিতীয়টা জিতলেন মিসেস রহমান আর তৃতীয় খেলার শেষে মিসেস চৌধুরী বললেন ‘রামি!’ কিন্তু স্পেসের সারিতে চার নম্বর তাসটা বাদ ছিল। তবে তাঁর মতে, সেটা কোনো ব্যাপার না। তিনি হুইস্কি নিয়ে এসেছেন, তার তো অন্তত একটা দাম আছে। মিসেস আকরাম, তাসগুলো ধরে রাখতে যাকে দুই হাত ব্যবহার করতে হয়, বললেন, ‘কিন্তু আমাদের রেহানা বর পছন্দ

করতে কেন অস্বীকার করছে এটা এখনো রহস্যজনক, তাই না, কি বলেন?’

রেহানা ভাবেন মিসেস চৌধুরী তাঁর পক্ষ নেবেন, কিন্তু উল্টো ধুয়া ধরে বললেন, ‘সত্যিই তো রেহানা, তোমাকে নিয়ে আমরা সবসময় চিন্তা করি...ব্যাপার কী বলো তো?’

রেহানা দেখলেন, সবাই স্থির সর্বগ্রাসী দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সেই মুহূর্তে হুইস্কি তাঁর পেটের ভেতরে বিস্তার পেল, রেহানা টের পেলেন বিষয়টাকে হেসে উড়িয়ে দিয়ে খুশি-খুশি ভাব ধরে রাখার শক্তি তাঁর আর নেই; তিনি ঠোট কামড়ে ধরে লজ্জা পাওয়ার ভান করলেন না বা লজ্জায় লাল হতেও চাইলেন না। আসলে, তাঁর আবার বিয়ে করার কোনো বাসনাই নেই। সোনা বানানোর আগে, শুধু একবার তিনি বিষয়টা ভেবেছিলেন। কিন্তু যখন ছেলেমেয়ে দুটো ফিরে আসে, তখন দাম্পত্য ভালোবাসা পাওয়ার আর্তিটা একদমই উবে যায়। কারণ তাতে ভুল হওয়ার ঝুঁকি খুব বেশি বলে তাঁর মনে হয়। অন্য কোনো লোক তাঁর ছেলেমেয়ে দুটির সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করবে, এরকম ভাবনাই তাঁর প্রাণ ওষ্ঠাগত করার জন্য যথেষ্ট ছিল।

কিন্তু রেহানা এসবের কিছুই বলেন না তাঁর জিন-রামি খেলার সাথীদের। শুধু তাসের আড্ডায় তিনি আর ফিরলেন না। একবার মাথাব্যথার বাহানা করেন, তারপর মায়ার চিকেন পক্ক হয়, সুতরাং সোহেলেরও হয়, আর অচিরে তারাও রেহানাকে ডাকাডাকি বন্ধ করে দেয়। ততদিনে তাঁর জায়গা দখল করে নেন মিসেস সেনগুপ্ত। হুইস্কি-মেশানো চায়ে চুমুক দিতে দিতে আর তাস বাটতে বাটতে তারা যে বিয়ের ব্যাপারে রেহানার অনীহা আর নির্লিপ্ততা নিয়েই গল্পগুজব করে—এ রকম ভাবনাকে উড়িয়ে দিতে চাইতেন তিনি। রেহানা জানতেন তাঁদের কাছে তাঁকে এখন অদ্ভুত আর দূরের মানুষ মনে হয়। তাঁরা বুঝতে পারে না সমস্যাটা কোথায়। রেহানা এও জানতেন যে তিনি তাঁদেরকে সবকিছু বুঝিয়ে বললেও তারা বুঝতে পারবে না। কারণ তাঁরা কেউ অমন অবস্থায় কখনো পড়েনি।

মিসেস চৌধুরী এলেন সবার আগে। রান্নাঘর থেকে রেহানা গেটের কাছে হুড়কো খোলার শব্দ পেলেন। ‘মায়া, বিরিয়ানির দিকে চোখ রাখো,’ বলে তিনি তাড়াতাড়ি সামনের দরজায় গেলেন। ‘মিষ্টিমুখ করেন রেহানা,’ দরজা গলে ঢুকতে ঢুকতে মিসেস চৌধুরী বলেন। তারপর ‘খবর আছে!’ বলে লাভডুর বাক্স এগিয়ে দেন। তাঁর পেছন পেছন আসে মিলিটারি পোশাকে সজ্জিত লম্বা একটা লোক। তার পেছনে মিসেস চৌধুরীর মেয়ে সিলভি; গলায় প্যাঁচানো নকশার সোনার হার আর কানে রুবির দুলে সিলভিকে আজকের অয়োজনের জন্য বেশ জমকালো দেখায়।

মিসেস চৌধুরী উর্দিপরা লোকটার দিকে ইশারা করে বলেন, ‘আমার জামাই।’ এরপর হিহি করে হাসেন, ঢেউ খেলে যায় তাঁর গলায়, গালে আর নিচের ঠোঁটে। তিনি একটা লাড্ডু ঠেসে ঢুকিয়ে দেন রেহানার মুখে।

‘সত্যি!’ মিষ্টির দলার মতো লাড্ডুটা রেহানার গলা দিয়ে ঠাণ্ডাভাবে নিচে নেমে গেল। ‘আপনি অবশ্য বলছিলেন, প্রস্তাবগুলো ভেবে দেখছেন, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে সবকিছু ঘটে যাবে তা তো জানতাম না।’ মুখের লাড্ডুটা কোনোরকমে গিলে ফেলে রেহানা হাসার চেষ্টা করে বললেন, ‘অভিনন্দন।’

‘আরে...ওদের এখনো পানচিনি হয় নাই। কিন্তু সবার আগে আমি তোমাকেই জানিয়ে দিলাম।’

উর্দিপরা যুবক রেহানাকে সালাম দেয়, ‘আসসালামু আলাইকুম।’ তার মুখটা যেন রাবারব্যান্ডের মতো আঁটো। মুখের ওপরেই তার কাটা ঠোঁটে নিখুতভাবে সেলাইয়ের দাগ। সালামের জবাবে রেহানা বলেন, ‘ওয়ালাইকুম আসসালাম, প্লিজ ভেতরে আসুন, বসুন।’ কিন্তু তারপর আর কথা খুঁজে পান না, তাই আরও ভদ্রতা করেন, ‘আপনি আসায় আমি খুব খুশি হয়েছি।’

মিসেস চৌধুরী মেয়েকে বসার জায়গা দেখিয়ে আদেশ করেন, ‘সিলভি, এখানে বসো, আর জামাই বাবা, তুমি ওর পাশে বসো।’

সিলভি আর উর্দিপরা লোকটি তাই করে।

তারপর মিসেস চৌধুরী রেহানার কানে কানে ফিসফিস করে বলেন, ‘গত সপ্তাহে মা আর খালাকে সাথে নিয়ে এসেছে। খুব হ্যান্ডসাম, তাই না? অবশ্য খুব একটা কথা বলে না, কিন্তু ভাবছিলাম, আমার লাজুক মেয়েটার জন্য ও-ই ঠিক আছে। দু’জন একদম এক রকম...আর ও তো লেফটেন্যান্ট।’ খিলখিল করে উঠলেন আর সেই ঢেউ আবার ফিরে এলো, ছড়িয়ে পড়ল গালে, গলায়।

রেহানা যখন ভাবছিলেন সোহেলকে এই খবরটা কীভাবে জানাবেন, তখনই সেনগুপ্তরা বাগান পেরিয়ে এসে বসার ঘরের জানালায় টোকা দেয়। পেছনে ওদের ছেলে মিঠুন, ঘাসের ওপর দিয়ে পা টেনে টেনে আসে।

‘এই যে, আমরা এসে গেছি।’

‘আসুন, আসুন,’ রেহানা বলেন, এভাবে মিসেস চৌধুরীর সঙ্গে সন্তোষে পড়ায় তিনি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। মিসেস সেনগুপ্তের পরনে ময়ূরকণ্ঠী নীল শাড়ি আর হাতাকাটা ব্লাউজ, যা উপচে চকচক করে তাঁর অক্লান্ত কাঠের মতো কালো কাঁধ। এমনিতেই স্বামীর চেয়ে কমপক্ষে তিন ইঞ্চি লম্বা, তার ওপর পায়ে প্ল্যাটফর্ম হিলের জুতো। চুল খাটো করে ছাঁটা, যাতে তাঁর দীর্ঘ গ্রীবাটি দেখা যায়; গলায় সোনার ভারি মঙ্গলসূত্র, যে অলঙ্কার দেখে বোঝা যায় যে তিনি বিবাহিতা, হিন্দু এবং ধনী। তার স্বামী একেবারে উলটো, পাঁচগোটা হাত-পায়ের ছোটখাটো

একটা মানুষ।

‘মিঠুন, তুমি কি লেবুর শরবত খাবে?’ ওর দিকে মনোযোগ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করেন রেহানা।

মিঠুন গরম হাত রাখে রেহানার কবজিতে, ‘চা খাব, প্লিজ। খুব মাথা ধরেছে।’

‘বেটা, আমার তো মনে হয় না তোমার চা খাওয়ার অনুমতি আছে।’

‘না, ঠিকই বলেছেন।’ বলেন মিঠুনের মা, ‘তোমার মাথায় আবার কী ঢুকল?’

‘তুমি যে বললে আজকে একটা বিশেষ দিন।’

‘সত্যি কথা,’ রেহানা বললেন। ‘আজকের দিনটা অবশ্যই আলাদা। তাহলে অরেঞ্জ কোলা হলে কেমন হয়?’ রেহানা পানীয় আনার জন্য উঠে গেলেন আর মিসেস চৌধুরী তখন সেনগুপ্তদের কাছে খবরটা আবার পাড়লেন।

রান্নাঘরে সোহেল আর মায়া শসা কাটছিল।

রেহানা শুধু একটা কথাই ভাবলেন, সোহেলকে কীভাবে বাসা থেকে সরানো যায়। আর কোনো চিন্তা মাথায় এলো না; একটা সময় অবশ্য ওকে ফিরতেই হবে, আসলে খবরটা সোহেলকে প্রথমে কীভাবে দেবেন এর জন্য একটু সময় দরকার ছিল তার, মানে কোনোভাবে ধাক্কাটা সামলে নেয়ার সময়। তিনি বললেন, ‘সোহেল, আলাউদ্দিন থেকে কিছু মিষ্টি আনতে হবে, বেটা।’

‘জিলাপি হচ্ছে না?’

রেহানা গলা পরিষ্কার করে হুকুমের ভঙ্গিতে বলার চেষ্টা করলেন, ‘আমার মনে হয় না ওতে কুলোবে...জানো তো, বিরিয়ানির পর সবাই একটু মিষ্টি খেতে পছন্দ করে।’

‘কিন্তু দোকানটা তো শহরের একেবারে আরেক মাথায়..যেতে-আসতে কম করে হলেও ঘণ্টাখানেক লেগে যাবে।’

‘ও নিয়ে ভেবো না, পুরো দুপুর সবাই থাকবে। তুমি সময়মতোই ফিরে আসবে।’ তিনি কিছু টাকা দিয়ে বললেন, ‘রিকশায় যাও।’ সোহেল রান্নাঘরের দিকে রওনা হলো। সন্দেশের চেয়ে বিরজুই হলো বেশি। ‘না না, পেছন দিক দিয়ে যাও, নইলে মিসেস চৌধুরী ধরে ফেললে ঘণ্টাখানেকের জন্য আটকে যাবে তুমি।’ রেহানা অনুতপ্ত চোখে তাকিয়ে দেখলেন সোহেল মাড়ি ঝাঁকিয়ে রান্নাঘর দিয়ে বেরিয়ে গেল।

মায়াকে ফাঁকি দেয়া গেল না। ‘কী ব্যাপার, মায়া?’ সে ধারালো বাঁটির সামনে উবু হয়ে বসে শসা কাটছে, গোড়ালি ঢেকে দিয়েছে ওর বুটিদার শাড়ি।

রেহানা রান্নাঘরের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে নিশ্চিত হলেন যে সোহেল চলে গেছে।

‘সিলভির বিয়ে হয়ে যাচ্ছে।’

‘কী?’

‘জানি, সবকিছু খুব হঠাৎ করে ঘটে গেছে। জানতাম মিসেস চৌধুরী ছেলে খুঁজছেন, কিন্তু ছেলেমেয়ের দেখাই হয়নি বলতে গেলে।’

‘আর সিলভি রাজি হয়ে গেল?’ মায়া আত্মসী ভঙ্গিতে খচখচ করে শসা কেটে ক্ষোভ ঝাড়ে।

মাথা নাড়েন রেহানা।

‘আল্লাহ! ইস্ আমার ভাইটা! এখন আমরা কী করব, মা?’

‘জানি না। সোহেল ফিরে এলে শুধু লক্ষ্য রেখো ও যাতে ওদের সামনে না পড়ে।’

বসার ঘরে ফিরে এসে রেহানা দেখলেন এরই মধ্যে মিসেস রহমান ও মিসেস আকরাম চলে এসেছেন। এই দু’জন সবসময় প্রতিটা জায়গায় একসঙ্গে যান স্বামী আর বাচ্চাদের রেখে, বাসা থেকে ফাঁকি দিয়ে আসায় ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলেন আর তাঁদের চোখে থাকে চোরা চাউনি। ঘরটা ভরে যাচ্ছে দেখে রেহানার ভালো লাগল, সিলভি আর ওর হবু বরের দিকে তাকানোর অদম্য ইচ্ছাটা এতে সামলানো গেল। আর সবার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করার জন্য খাবার তো আছেই।

রেহানা বিরিয়ানির ভারি পাত্রটা নামিয়ে রাখতে রাখতে জানালেন, ‘খাবার দেয়া হয়েছে।’

মেহমানরা একে একে এগিয়ে এলেন আর রেহানা প্লেটে খাবার তুলে দিতে লাগলেন।

‘পাড়ায় একটা বিয়ে হচ্ছে,’ মিসেস আকরাম বললেন, ‘তোমাকে দিয়েই শুরু...আমরা কী যে মজা করব না!’

রেহানা অনেকখানি বিরিয়ানি বেড়ে রাখলেন। ‘সেনগুপ্ত বাবু, দেখি আপনার প্লেটটা দিন তো। আর একটু কিন্তু নিতেই হবে।’ বিশেষ করে সেনগুপ্তদের জন্য রেহানা সবজির একটা পদ রেঁধেছেন।

‘যথেষ্ট হয়েছে! ভাড়াটেকে এত খাওয়ালে পথে বসতে হবে।’ প্লেট আড়াল করে আপত্তি করলেন সেনগুপ্ত বাবু।

‘দশ বছর হয়ে গেছে,’ রেহানা বললেন, ‘এখন অন্তত নিজেকে সাদাটে বলা থামান।’ আরও বিরিয়ানি নিয়ে আসতে রেহানা রান্নাঘরে গেলেন।

দেখলেন সিলভি করিডোরে হাঁটাহাঁটি করছে। ‘এ বছরটা খুব ভালো, খালামণি।’ সে রেহানাকে সবসময় খালামণি বলে ডাকে, যেন মিসেস চৌধুরী আর রেহানা আপন দুই বোন। সিলভির গায়ের রং মুসুর, ফ্যাকাশে, যদিও এই সাদাটে ভাব তাকে মানিয়ে গেছে, এ রকম না হলে ওর হালকা চোখের মণিগুলো নজর কাড়তো না, এখন যেমন সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

‘ভালো লেগেছে?...খুব তাড়াছড়ো করে রাখলাম।’ যে প্রশ্ন তিনি ওকে জিজ্ঞাসাই করতে পারেননি এমন এক প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য রেহানার চোখ দুটো সিলভির ওপর আটকে রইল।

‘আমি তো ধারণাও করতে পারিনি...এত মজা। ঢাকায় সবচেয়ে ভালো বিরিয়ানি আপনি রাখেন।’

রেহানা প্রশংসাটা গ্রহণ করে মাথা নাড়েন। সিলভি এক নজরে নিজেকে দেখে গলার হারটা ঠিকঠাক করে নেয়।

অনেকক্ষণ কেউ কথা বলে না। অবশেষে রেহানা বলেন, ‘তাহলে, তোমার বিয়ে হচ্ছে?’ তিনি চেষ্টা করলেন যেন তার কণ্ঠ খুশি খুশি শোনায।

সিলভি তোতলায়, ‘হ্যাঁ, আমি...আসলে, আম্মা খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল। আম্মার দুশ্চিন্তা আমার ভালো লাগে না। আপনি তো জানেন, আম্মার ব্লাডপ্রেসার খুব হাই।’

‘হ্যাঁ, তোমার আম্মাকে এখন বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছে,’ রেহানা বললেন। তিনি সিলভির দু’ গাল তালুবন্দি করলেন, আঙুলের নিচে টের পেলেন মেয়েটির মনের আকুতি। ‘তুমি তোমার আম্মাকে ভীষণ সুখী করেছ।’

সোহেল মিষ্টি নিয়ে হাজির হলো, ইতিমধ্যে মেহমানেরা শামিয়ানার ছায়াতলে গা এলিয়ে দিয়েছেন। রেহানা চেষ্টা করলেন ঢোকের মুখে তাকে থামাতে, কিন্তু তিনি বহন করছিলেন একগাদা প্লেট আর মিসেস চৌধুরী আগেই ওকে ধরে ফেললেন।

‘সোহেল!’ মিসেস চৌধুরী খপ্ করে পাকড়ালেন সোহেলের হাত, ‘কোথায় ছিলে? এদিকে খবর আছে। সিলভির বিয়ে হচ্ছে!’

রেহানা দেখলেন সোহেল এক হাতে কপালে এলিয়ে পড়া চুলগুলো পেছনে সরিয়ে দিল, আর হাতে ধরা মিষ্টির বাক্স দোল খাচ্ছিল সামনে-পেছনে।

‘আসো, আসো, তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। সাবির, এ হচ্ছে মিসেস হকের ছেলে সোহেল। সিলভির খুব পুরোনো বন্ধু...ছোটবেলায় ওদের আলাদা করা যেত না...সোহেল, বাবা, এ হচ্ছে লেফটেন্যান্ট সাবির মুস্তাফা।’

‘এই পরিবারে আপনাকে স্বাগত জানাই।’

‘ধন্যবাদ,’ উঠে দাঁড়িয়ে উর্দি ঠিক করতে করতে সাবির উত্তর দিল।

‘সোহেল জান, এই প্লেটগুলো নিতে আমাকে একটু সাহায্য করবে?’ রেহানা হাতের প্লেটগুলো ওকে দিতে গেলেন।

মাকে এড়িয়ে গিয়ে সে বলল, ‘দ্যাখো সবাই, আমি কালকের ক্রিকেট খেলার টিকিট পেয়েছি। পাকিস্তান বনাম ইংল্যান্ড এমসিসি।’ সে টিকিটগুলো বের করে বাতাসে দোলাতে লাগল। ‘কে আসতে চাও? লেফটেন্যান্ট, আপনি যোগ দেবেন

আমাদের সাথে?’

‘না, কালকে আমার ডিউটি আছে,’ সাবির বলল।

‘সিলভি, তুমি যাবে?’ সোহেল তাকে টিকিটগুলো দেখাল।

মিসেস চৌধুরী হামলে পড়ে বললেন, ‘মনে হয় না, আমাদের অনেক জোগাড়যন্ত্র করা বাকি।’

‘আমি আনন্দের সাথে যাব,’ বললেন মিসেস সেনগুপ্ত। ‘তোমার আশুও যাবে। কী রেহানা, যাবে না?’

‘আমিও তো যাব। সিলভি, তোমার তাহলে জায়গা হবে না।’ মায়া আঙুল তুলে বলল, ‘অন্য কোনো সময় হবে হয়তো।’

মায়া আর রেহানা যখন বাকি পেটগুলো ধোয়ামোছা করছিলেন, ততক্ষণ ধরে একটা নীরবতা বিরাজ করছিল। রেহানা আশা করছিলেন কেউ একজন কথাবার্তা শুরু করবেন, কিন্তু কেউ কিছুই বলল না। মিসেস রহমান ও মিসেস আকরাম মিষ্টির বাক্সটা হাতে হাতে চালান করে দিলেন। অবশেষে সেনগুপ্ত বাবু সবার প্রিয় প্রসঙ্গ নির্বাচন নিয়ে কথা তুললেন।

‘ছাত্র সমাজের অবস্থা কী, সোহেল?’ তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

‘কিছুই বলা যাচ্ছে না আঙ্কেল।’ সোহেল বাগানের চারপাশটায় চোখ বুলিয়ে বলে, ‘দু’ মাস হয়ে গেল মুজিব নির্বাচনে জিতেছেন। এর মধ্যে অ্যাসেমব্লি ডেকে উচিত ছিল মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী বানানো। কিন্তু ওরা টালবাহানা করেই যাচ্ছে। ছাত্রদের একটা অংশ চাইছে মুজিব যেন আরো কঠোর কর্মসূচি দেন।’

‘কঠোর কর্মসূচি?’

‘তাঁর উচিত স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া।’

‘কিন্তু তিনি তো নির্বাচনে জিতেছেন...এখন নিশ্চয়ই তাঁর দাবি পূরণ হবে?’ সেনগুপ্ত বাবু বললেন।

‘হ্যাঁ,’ সোহেল বলল। ‘কিন্তু ওরা তো অ্যাসেমব্লি অধিবেশন ডাকতে বারবার বিলম্ব করেছে।’

সোহেলকে দেখে মনে হলো সে আবার বক্তৃতা দিতে শুরু করবে। রেহানা টের পেলেন তার চোখমুখ তেতে উঠছে।

‘মুজিব ঝানু রাজনীতিবিদ,’ মিসেস রহমান ফোড়ন কাটলেন। ‘তিনি নিশ্চয়ই এমন কিছু জানেন যা আমরা জানি না।’

‘হয়তো-বা এখনো আপস-রফার সুযোগ রয়েছে।’ সেনগুপ্ত বাবু বললেন।

‘আপস-রফা? মাফ করবেন চাচা, আপনার কি মনে হয় ভুট্টো আর ইয়াহিয়া আলাপ-আলোচনার ধার ধারে?’

এসব কথাবার্তা চলতে চলতে একটা সময়ে যখন মনে হয় যে সোহেল এই

প্রসঙ্গটা পাল্টাবে, তখন হাত তোলে সাবির। ‘আপনার কি মনে হয় এই দেশকে আমরা নিজের দেশ করতে পারব?’ সে জিজ্ঞেস করল। রেহানা বিস্ময়ের সাথে ভাবছিলেন, সোহেল এই টোপটা গিলবে কিনা।

সোহেল টোপটা নেয়, বলে, ‘আপনি যদি দেশটার খোঁজখবর কিছু রাখেন তাহলে নিশ্চয়ই জানেন যে পশ্চিম পাকিস্তান আমাদের রক্ত শুষে নিচ্ছে। বৈদেশিক মুদ্রার বেশিরভাগই আমরা আয় করি। চাল উৎপন্ন করি আমরা, পাট ফলাই আমরা। অথচ আমরা কিছুই পাই না..না স্কুল, না হাসপাতাল, এমনকি আমরা নিজের হতচ্ছাড়া ভাষায় কথা পর্যন্ত বলতে পারি না।’

রেহানা চাইলেন সাবির কিছু একটা বলুক, ভোঁতা ও আক্রমণমুখী একটা কিছু, ওর মিলিটারি প্রশিক্ষণ এটুকু শিক্ষা ওকে নিশ্চয়ই দিয়েছে। কিন্তু তার বদলে সে রণে ভঙ্গ দিল, উর্দির বোতামগুলো লাগানো গুরু করলো।

‘সাইক্লোন, বুঝলে তরুণ,’ শান্তি স্থাপনের চেষ্টায় নাক গলালেন সেনগুপ্ত বাবু, ‘প্রকৃতি। আমরা সমতল এক বদ্বীপে বাস করি। আর তাছাড়া আমাদের কপালটা মন্দ।’

‘দুর্ভিক্ষের জন্য খোদা দায়ী না। এর দায় কাণ্ডজ্ঞানহীন সরকারের।’ কোর্তার হাতা একবার গুটিয়ে আরেকবার খুলতে খুলতে বলে সোহেল। রেহানা ভাবলেন ছেলেটা কি কেবল দেশের ধনসম্পদ নিয়েই কথা বলে যাবে—পাটের টাকা, সাইক্লোন! কিন্তু ওকে দেখে মনে হলো, ওর দম ফুরিয়ে গেছে। ক্লান্ত স্বরে সোহেল বলে, ‘আমাদের এখানে যা চলছে তা একটা জরুরি অবস্থা। মিটমাটের সম্ভাবনা আর নাই। মুজিবের উচিত ছিল স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া।’

রেহানা দুই ডজন অরেঞ্জ কোলা আনিয়েছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি সেগুলো সবার মধ্যে বিলি করে দিলেন। আড্ডাটাকে আবার আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনতে হবে।

মেহমানেরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে পানীয় গ্রহণ করলেন এবং নিজ নিজ গ্লাসে চুমুক দিলেন। একে অপরের গ্লাসে ঠোকা দিয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে হাসলেন। আঁচের মৃদুমন্দ বাতাসে তাদের শাড়ি আর কোর্তা ঝাপটা খেতে লাগল। প্রবল ঝড়ের আগে প্রকৃতি যেমন থমকে থাকে ঠিক তেমনি সন্ধ্যায় ফিরে এসে নিশ্চুপ, নিস্তরঙ্গ ভাব।

জিন-রামি মহিলারা রেহানাকে টেবিল থেকে বিদ্রোহী সরিয়ে নিতে সাহায্য করতে চাইলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন না আড্ডাটা তাঁদের ভালো লাগছে কি না। কিন্তু মেহমানরা আড্ডা চালিয়ে যেতেই চাইছিলেন, রেহানা এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে প্রতিবাদ করার শক্তি তাঁর ছিল না।

‘আপনারা তো খাবার শেষ করতে পারলেন না,’ বিরিয়ানির পাত্রটা দেখে রেহানা অনুযোগ করলেন। ‘এখন এর সবটাই আমাকে মসজিদে পাঠাতে হবে।’

‘আমার জন্য একটু দিতে পার,’ মিসেস চৌধুরী বললেন। ‘জান তো, বাসি বিরিয়ানি খেতে কত আমি ভালোবাসি।’

‘আপনার জন্য আমি আগেই তুলে রেখেছি,’ রেহানা বললেন, কাডবোর্ডের বাক্সটা মিসেস চৌধুরীর হাতে তুলে দিলেন। তিনি দেখলেন মিসেস চৌধুরী আড়চোখে বাক্সটা পরখ করলেন, কয় বেলা এই দিয়ে চালানো যাবে তারই হিসাব কষলেন হয়তো।

‘এরপরও অনেক রয়ে গেছে,’ কে জানে এই বছরের বিরিয়ানিটা হয়তো অত ভালো হয়নি।

‘জান, আমার ধারণাই ছিল না যে সোহেল ছাত্র রাজনীতিতে এতটা সক্রিয়,’ বলতে বলতে মিসেস আকরাম গ্লাস আর সোডার খালি বোতলগুলো গুছোতে লাগলেন।

‘আসলে তা নয়,’ রেহানা বললেন, এক গাদা প্লেট বেসিনে নামিয়ে রাখলেন তিনি। ‘ও বরং এসব থেকে দূরে থাকারই চেষ্টা করছে,’ ধোয়ামোছার জন্য ওপরের প্লেটটায় সাবান লাগাতে শুরু করলেন।

‘আমার কাছে তো ওর কথাবার্তা বেশ উত্তপ্ত শোনাল,’ মিসেস রহমান বললেন।

‘বয়স কম তো, মাথাভর্তি নানান ভাবনা,’ একটু কোণঠাসা বোধ করেন রেহানা। তাঁর পরিস্থিতি ওদের বোঝানো সবসময়ই খুব কঠিন; মিসেস আকরামের ছেলেমেয়েরা এখনো স্কুলে, মিসেস রহমানের তিন বাচ্চাই ঠিকঠাকমতো বিয়ে করে সংসারী হয়েছে আর সিলভি তো ওর মায়ের হাতের মুঠোর মধ্যেই বলতে গেলে...ওরা কী করে বুঝবেন তাঁর যন্ত্রণা। ওদের তুলনায় অবশ্য রেহানার ছেলেমেয়ে দুটিকে একটু লাগাম ছাড়াই মনে হয়। বাতাসে তো এই সব কথাবার্তাই উড়ছে...বারবার অধিবেশন পিছিয়ে দিচ্ছে...ছাত্ররা অধীর হয়ে যাচ্ছে, ওদের আসল চিন্তা নির্বাচনের ফলাফল মাঝে হাবে কিনা।’

‘আমার কাছে কিন্তু ওকে বেশ সক্রিয় মনে হলো,’ মিসেস রহমান আবারও জোর দিয়ে বললেন, ‘আর তোমার মায়া তো ছাত্রলীগ করে, তাই না?’

মিসেস চৌধুরী রেহানাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এলেন। ‘আসলে ও বলতে চাচ্ছে...এর বদলে সোহেল বরং মেয়েদের পেছনে এই সময়টা নষ্ট করলেই পারে!’

হঠাৎ করে রান্নাঘর নীরব হয়ে গেল।

রেহানা ঘুরে মিসেস চৌধুরীর দিকে তাকালেন।

‘কী বললেন?’ তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী?’

কেউ উত্তর দিল না। রেহানা বুঝলেন তাঁরা তাঁকে কথা বলার সুযোগ করে

দিয়েছেন। তিনি মুখ খুলে কিছু বলতে চাইলেন, কিন্তু কোনো কথাই তাঁর মুখে জোগাল না।

মিসেস রহমান নীরবতা ভাঙলেন। ‘আপনি কি কিছুই জানেন না?’ তিনি বললেন।

‘কী জানব?’

রেহানা ভাবলেন তিনি এখনো এই আলাপের ইতি টানতে পারেন, কিন্তু কিছু একটা তাঁকে অসার করে রাখল...ঘরের দিকে পিঠ দিয়ে প্লেটে স্পঞ্জ ঘষতে লাগলেন।

‘সোহেল আপনার মেয়েকে ভালোবাসে,’ মিসেস রহমানকে বলতে শুনলেন রেহানা।

‘ও...ও,’ মিসেস চৌধুরী হেসে উঠলেন, ‘এইটা। কী যে বলেন...ওটা তো শুধু একটা ছেলেমানুষি খেলা।’

রেহানা স্পঞ্জ ঘষেই যাচ্ছিলেন। কেউ আর কিছু বলল না; রেহানা যেন শুনতে পেলেন তাঁর কিছু বলার অপেক্ষায় সবাই নিশ্বাস বন্ধ করে আছে, কিন্তু তিনি সম্মোহিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন প্লেটের দিকে, স্পঞ্জের দিকে, আর বিরিয়ানির চালের যে জাফরানি দানাগুলো প্লেটের পানির ওপর পাপড়ির মতো ভাসছিল তার দিকে।

‘আসলে,’ সজোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মিসেস চৌধুরী অবশেষে বললেন, ‘আমি জানতাম না। মেয়ে তো আমাকে কখনো বলে নাই।’

‘আপনার কোনো ধারণাই ছিল না?’ মিসেস রহমান বললেন।

‘অবশ্যই আমার কোনো ধারণা ছিল না।’

ঠিক তখনই ওরা শুনলেন সশব্দে পা ফেলে কেউ রান্নাঘরের দিকে ছুটে আসছে।

‘আম্মু!’

আর কেউ না, মায়া।

‘আম্মু,’ দৌড়ে আসায় হাঁপাচ্ছে আর মুখটাও লাল হয়ে গেছে, ‘ভাইয়া দু’ হাতে মাথা ধরে বাগানে বসে আছে।’

শরবত দিতে হবে, ওর শরবত দরকার। রেহানা একটা পরিষ্কার গ্লাস মেয়ের হাতে দিলেন। ‘নাও। ফ্রিজ থেকে শরবত নিয়ে যাও।’

মায়া নিশ্চয় বুঝতে পারলো যে রান্নাঘরে কিছু একটা ঘটছে, কেননা এই প্রথম সে বাধ্য মেয়ের মতো যা বলা হলো তা-ই করল, দৌড়ে ফিরে গেল চপ্পলের আওয়াজ তুলে।

‘রেহানা,’ মিসেস চৌধুরী বললেন, ‘বিশ্বাস করো, আমি আসলেই কিছু

জানতাম না ।’

বেসিনের দিকে ফিরে রেহানা আরেকটা প্লেট হাতে তুলে নিলেন ।

‘সিলভি আমাকে কিছু বলে নাই,’ মিসেস চৌধুরী আবারও বললেন, ‘আর সোহেলের বয়স এত কম...এখনও পড়াশোনা করছে...মানে এটা ভাবা তো বোকামি...’

‘তার মানে আপনি জানতেন,’ মিসেস আকরাম বললেন ।

‘না, জানতাম না,’ রেহানা টের পেলেন মিসেস চৌধুরী তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন । ‘রেহানাও আমার সঙ্গে একমত, তাই না রেহানা...এই সম্বন্ধ হলে ভালো হতো না । আমি নিশ্চিত যে রেহানাও ছেলের এই ব্যাপারটাকে আমলে নেয় নাই ।’

ভেতর থেকে উগরে আসা কান্না রেহানা সামলে নিলেন । ‘হ্যাঁ, অবশ্যই, আপনি ঠিকই বলেছেন ।’ ছেলেটাকে অপমানের হাত থেকে বাঁচানো ছাড়া সে এখন আর কী করতে পারে?

‘দেখলে...ওরও একই মত ।’ মিসেস চৌধুরী জানালেন ।

মিসেস রহমান মাথা নাড়লেন । বিশাল একটা হাঁড়ি থেকে বেঁচে যাওয়া বিরিয়ানি চামচ দিয়ে তুলতে শুরু করলেন । ম-ম গন্ধে রান্নাঘর ভরে উঠল, দ্রুত ঘরের বাতাস ভারি হয়ে গেল, তার সঙ্গে মিশল শেষ বিকেলের উত্তাপ, বিজলি বাতির ঝাঁঝি শব্দ আর মিসেস চৌধুরীর দীর্ঘশ্বাস ।

‘আমি তো বুঝলাম না এটা নিয়ে এত কথার কী আছে । এটা তো হতে পারে না...হয় না...ওদের সম্পর্কটা গভীর হতেই পারে না ।’

হাতের প্লেট ধোয়া শেষ করে রেহানা আরেকটা নিলেন । তিনি ভাবলেন, এই প্লেটটা পৃথিবীর সবচেয়ে পরিষ্কার প্লেট হতে বাধ্য । মিসেস আকরাম সেটা তুলে নিয়ে তার শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছে ফেললেন ।

‘সোহেল তো রাজনীতি নিয়ে খুবই ব্যস্ত...ও কি কখনো ভালো স্বামী হতে পারবে...তা ছাড়া ও তো সিলভির চেয়ে বয়সেও ছোট ।’

রেহানা এই প্রসঙ্গ আর সহিতে পারলেন না । ‘দয়া করে আপনি আমেন...এটা নিয়ে আসলে ভাবনার কিছু নেই । শুধু একটা ভুল বোঝাবুঝি...এই তো ।’

‘ঠিক কথা,’ মিসেস চৌধুরীকে সন্তুষ্ট শোনাল । ‘সিলভিকে কেউ জোর করে নাই ।’ তারপর পায়ের হিল ঠুকে চট করে তিনি ঘুরে গেলেন, ‘কাহিল লাগছে । শুভরাত্রি সবাইকে, খোদা হাফেজ ।’ দ্রুত তিনি ফিরে গেলেন আর সেই যাওয়ার সময় তাঁর পায়ের ধাক্কায় উল্টে গেল ঘরের কোনায় রাখা আচারের খালি বয়ামগুলো ।

‘রেহানা,’ বিরিয়ানির হাঁড়িতে কনুই ডুবিয়ে মিসেস রহমান বলতে শুরু করলেন, ‘আমার খুব খারাপ লাগছে...’

‘এ নিয়ে আর কথা বাড়াতে চাই না।’

মিসেস রহমান আর মিসেস আকরাম পরস্পরের মুখের দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন তাঁরা জানতেন যে রেহানা এটাই বলবেন।

‘তুমি না বললেও আমি তো বলতে পারি যে এটা খুব খারাপ হলো।’

‘প্লিজ থাক।’ রেহানা ঠোঁট কামড়ে শক্ত হাতে প্লেট ধরলেন, তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে সাবানের ফেনা চুইয়ে পড়ল। ‘বাকি যা কাজ আছে আমি সামলে নেব...বাচ্চারা সাহায্য করবে...এমনিতে দেরি হয়ে যাচ্ছে, আপনাদের আটকে রাখা ঠিক হবে না।’ হাতের পিঠ দিয়ে গালটা মুছলেন, সেখানটায় চির চির করছে।

‘চলেন তাহলে,’ মিসেস আকরাম বললেন। ‘আসেন।’ বিরিয়ানির হাঁড়ি থেকে মিসেস রহমানের হাত তিনি টেনে তুললেন।

‘খোদা হাফেজ, রেহানা,’ নরম গলায় বললেন।

‘খোদা হাফেজ সবাইকে,’ অস্ফুট স্বরে বললেন রেহানা, মেহমানরা গুনতে পেলেন কিনা বোঝা গেল না।

ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়ার পর রেহানা মশারির ভেতর ঢোকেন, শুয়ে গলা পর্যন্ত কাঁথা টেনে নেন।

সিলভির ব্যাপারটা মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল, ভাবেন, এ ব্যাপারে তাঁর করার কিছু ছিল কিনা। সারা সন্ধ্যা সোহেল মাকে এড়িয়ে থেকেছে, তারপর ঘুমাতে গেছে চা না খেয়েই। ঘুমাতে যাওয়ার আগে সোহেল যখন শুভরাত্রি বলে, রেহানার মনে হয় তিনি যেন ছেলের ঠোঁটের কোণে মায়ের বিরুদ্ধে ছোট্ট একটা নালিশ ঝুলে থাকতে দেখলেন।

সোহেল কখনো ভালো স্বামী হতে পারবে না। মিসেস চৌধুরীর কণ্ঠ বাজে রেহানার কানে। ও বড় বেশি রাজনীতি নিয়ে আছে।

হয়তো কথাটা সত্যি, আর সে কারণেই তা রেহানার গায়ে ঝুঁপেছিল। আজকাল রেহানার ছেলেমেয়ে দুটির কোনো কিছুর জন্য কোনো সমস্যা নেই, শুধু আন্দোলন-সংগ্রাম ছাড়া। সোহেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার পর থেকে এর শুরু। সেই ’৪৮ সাল থেকে পাকিস্তান সরকার দেশটার পূর্ব অংশ শাসন করে আসছে কলোনির মতো। প্রথমে তারা চেষ্টা করে বাংলার রক্ত দিয়ে উর্দুতে কথা বলাতে। এই অংশের পাটের টাকায় তারা কৃষি-কারখানা গড়ে তোলে করাচি আর ইসলামাবাদে। তারপর একজনের পর একজন জেনারেল এসে নানা প্রতিশ্রুতি দেন, যেসব রক্ষার কোনো আগ্রহ তাঁদের ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এইসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার সেই একেবারে শুরু থেকে। তাই সোহেল আর মায়াও যে এই সংগ্রামে যুক্ত হবে এতে অবাক

হওয়ার কিছু নেই। এমনকি রেহানার কাছেও ওদের যুক্তিটা খুব সহজ মনে হয় :
ভারতের দুই পাশে দুটো শিংয়ের মতো ভাগ হয়ে থাকা এই দেশের কী মানে হয়?

তবে ১৯৭০ সালে যখন ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে, তখন যেন মানুষের চোখ খুলে যায়। সোহেল আর মায়া যেদিন উদ্ধারকাজ থেকে ফিরে আসে সেই দিনটির কথা মনে পড়ে: খাবারের ট্রাক আসার জন্য কীভাবে ওরা অপেক্ষায় ছিল; পানি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে মানুষের লাশ ভেসে আসছিল, কীভাবে ক্রমবর্ধমান আতঙ্কের সঙ্গে বুঝতে পেরেছিল যে খাদ্যদ্রাণ আসবে না কারণ তা কখনো পাঠানোই হয়নি।

তার পরদিন মায়া ছাত্র ইউনিয়নে যোগ দেয়। নিজের সব কাপড়-চোপড় ঘূর্ণিঝড়ে দুর্গত মানুষদের জন্য দান করে দিয়ে সে শুধু সাদা শাড়ি পরা শুরু করে। মেয়ের পরনে সাদা শাড়ি দেখতে রেহানার অসহ্য লাগে, কিন্তু মায়া তা মোটেও আমলে নেয়। দলের প্রবীণ নেতাদের প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি ধারণা মায়া গোথাসে গেলে। গণজোয়ার। বিপ্লব। এই শব্দগুলো এমনভাবে উচ্চারণ করে যেন আদিম যুগের কোনো হারানো ভাষা সে আবিষ্কার করেছে।

সোহেল খুব ক্ষমতাধর একজন ছাত্রনেতা হতে পারত। কিন্তু সে ছাত্র আন্দোলনে যোগ দেয় না; কারণ কোনো ছাত্র সংগঠনই তাকে আকৃষ্ট করে না। বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দলের নানান মত সম্বন্ধে সে ছিল উদাসীন: পিকিংপন্থি-মস্কোপন্থি, মাওপন্থি, মাও-বিদ্রোহী, মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট, স্ট্যালিনপন্থি বা বলশেভিক। এটা একটা সমস্যা হতে পারত, কিন্তু সে সবারই বন্ধু হয়েছে, কাউকেই খেপায়নি। সোহেল খুব জনপ্রিয় ছিল আর সবাই ওকে ভালোবাসত। মোল্লারা আর বখাটে ছেলেরা। কমিউনিস্টরা আর মাস্তানরা, আর যারা অকাজের কাজি তারাও। আর্টস ফ্যাকাল্টি, সায়েন্স ফ্যাকাল্টি, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিল্পী, দার্শনিক সবাই। ছেলেরা আর মেয়েরা। বিশেষ করে মেয়েরা। মিটিংয়ে সোহেলের অনুপস্থিতিতে ওর সতীর্থরা হয়তো ওর আনুগত্যের অভাব হিসেবে ধরে নিত কিন্তু আন্দোলনের প্রতি ওর অঙ্গীকার নিয়ে কারও মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। সোহেল বাংলাকে ভালোবাসে। উর্দু কবিতার প্রতি ভালোবাসা হয়তো সে তার মায়ের কাছ থেকে জন্মসূত্রে পেয়েছে, কিন্তু সেই ভালোবাসা বাংলার সবকিছুর প্রতি তার প্রগাঢ় ভালোবাসার কাছে কিছুই না। এই বদ্বীপের কাদামাটি, নদীর বলমলে রূপালি মাছ; ধানখেতের গাঢ় সবুজ অমর আদিগন্ত খোলা প্রান্তর, সমতল মাটির ওপর আকাশের নীল রং।

অনেকে বলে সোহেল দেখতে ভালো বলে এত জনপ্রিয়, কিন্তু রেহানা নিশ্চিত যে ওর গলার আওয়াজ এবং কথা বলার উদাত্ত ভঙ্গি এর আসল কারণ। সেসব সময় বেপরোয়া ভাব নিয়ে হাত দুটো পেছনে ধরে থাকে, যার সঙ্গে কথা বলছে তার দিকে দৃষ্টি স্থির রাখে,...ফল হয় জাদুকরি, সম্মোহনী। এই কারণেই মেয়েরা

প্রতি বিকেলে কার্জন হল থেকে মধুর ক্যান্টিন পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করে যখন ও বিশাল বটগাছের নিচে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে যায়, যেখানে ঢাকার সব বড় বড় ছাত্র আন্দোলনের জন্ম।

কিন্তু সোহেল ভালোবাসে সিলভিকে। সিলভিকে সে ভালোবাসে বাবার মৃত্যুর পরের গ্রীষ্মের সেই দিনটি থেকে যেদিন সে ক্রিপেট্টো ছবিটা দেখেছিল। সে সিলভিকে ভালোবাসে লাহোর থেকে ফিরে রোমান হলিডে ছবিতে অড্রে হেপবার্নকে দেখে; সোহেল সিলভিকে ভালোবাসে স্কুলে, যখন সিলভির রোল নম্বর ছিল ৩৩, স্কুলের পোশাক ধূসর আর নীল; সোহেল সিলভিকে ভালোবাসে যখন সিলভির স্কুলপোশাকের ত্রিকোণ দোপাটা ঠেলে প্রস্ফুটিত হতে থাকে তার স্তন। কবিতার মাধুরী আবিষ্কার করতে করতে সোহেল সিলভিকে ভালোবাসে আর ভালোবাসে সেই কবে থেকে, যখন সিলভি ওকে চিঠি লিখত কালি-আঁকা ঠোঁটের ছবি দিয়ে খামের মুখ আটকে; সে সিলভিকে ভালোবাসে বিশ্ববিদ্যালয়ে, যখন তারা এক রিকশায় বাড়ি ফিরত, পথের খানাখন্দে রিকশার ঝাঁকুনিতে ওদের হাঁটুতে ঠোকাঠুকি হতো। সোহেল সিলভিকে ভালোবাসে যখন সিলভি কোরান পড়া শুরু করে, সিলভি যখন মায়ের পছন্দমতো বিয়েতে রাজি হয়, তখনো সোহেল তাকে ভালোবাসে। এমনকি সিলভি যখন নিজের শোবার ঘরের জানালার পাল্লাগুলো বন্ধ করে দেয় এবং সোহেল যখন পেনসিলের রাবারের প্রান্ত দিয়ে জানালায় মৃদু টোকা দেয় কিন্তু সিলভি জানালার কাছে আসে না, তখনো সোহেল ওকে ভালোবাসে।

হ্যাঁ, হয়তো কথাটা ঠিক। সোহেল তখনও ছাত্র, বয়স খুবই অল্প। এবং সে তার প্রথম হৃদয় ভাঙার কষ্ট সামলে উঠবে, যা ছেলেরা সহজেই পারে। কিন্তু তবুও রেহানার মনে হয়, এবারের অনুষ্ঠানটা মোটেও ভালো হলো না। কথা ছিল এই দিনটা হবে ছেলেমেয়েদের ফিরে আসার দশম বর্ষপূর্তির উৎসব, যেদিন মা তাঁর সন্তানদের ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন।

রেহানা অন্ধকারে শুয়ে থাকেন, ছেলেমেয়ে দুটির ফিরে আসার গল্পটা পুরোনো ছায়াছবির রিলের মতো আপনাআপনি ঘুরতে থাকে, ছবিগুলো এখনো জীবন্ত, এখনো জোরালো। এটাই এই আনুষ্ঠানিকতার শেষ অধ্যায়: অতীত পর্যালোচনা, কাছ থেকে দেখার একটা চেষ্টা।

প্রথমে রেহানা ইকবালের প্রাণপ্রিয় ভব্বল গাড়িটো বিক্রি করে দেন। মিসেস আকরাম স্বামীকে গাড়িটা কিনতে রাজি করান। তিনি রেহানাকে বলেন, ‘ওটা আমাদের কাছে বিক্রি করে দেন, প্রায় নতুনই তো আছে গাড়িটা। আমি আমার সাহেবকে দেখেছি গাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকতে। আমি ওকে রাজি করাতে পেরেছি, সে আপনাকে এক হাজার টাকা দেবে।’ রেহানা প্রথমে রাজি হননি,

কিন্তু উকিলের পাওনা মিটিয়ে দেয়ার পর তাঁর কাছে ছিল মাত্র ২৫০ টাকা। তিনি রাজি হলেন। ‘কাল সকালে আমি যখন বাজারে যাব, তখন আপনার সাহেবকে বলবেন ওটা নিয়ে যেতে।’ মিসেস আকরামকে তিনি বলেন, ‘গাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় আমি থাকতে চাই না।’ বিকেলে রেহানা যখন বাজার থেকে ফিরে আসেন, তখন গাড়িটা আর নেই, শুধু গাড়ি-বারান্দায় রয়ে গেছে তেলের গাঢ় কালচে দাগ আর চারটা চাকার সুস্পষ্ট ছাপ।

ভক্তল রেহানাকে এক হাজার রুপি এনে দেয়। কিন্তু এই টাকা ছেলেমেয়ে দুটিকে ফিরিয়ে আনা, লালন-পালন করা, তাদের ফিতা, মোজা আর স্কুলের পোশাকের বন্দোবস্তের জন্য মোটেও যথেষ্ট নয়। যথেষ্টর কাছাকাছিও নয়। রেহানা নিজের বাদবাকি গয়নাগাঁটি বন্ধক রাখেন : সূর্য-লকেট, তার সঙ্গে মানানসই কানের দুল, রুবি বসানো আংটি, কয়েকটি সোনার চেইন। রেহানা টাকা গুণে নেন: মোট ২,৬৫২ রুপি। তবুও যথেষ্ট নয়। ড্রেসিং টেবিলের উপরে বসানো সেগুন কাঠের কারুকাজ করা আয়নার ফ্রেমটি বিক্রি করে দিলেন। ওয়েলিংটন স্কয়ারের বাসার বনেদি জিনিস এটি, বিয়ের পরে ঢাকায় পাঠানো হয়, সঙ্গে ছিল তার বাবার একটা ছোট্ট চিরকুট : বড়ই খারাপ লাগছে, এটুকুই আমি বাঁচাতে পেরেছি। আয়নাটা সবসময় তাঁকে কলকাতার বাসায় বাবার শেষ দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দিত, খালি ঘরগুলোয় পায়চারি করতেন তিনি, তাঁর পায়ের শব্দে পরাজয় ধ্বনিত হতো,...যখন একটার পর একটা ট্রাকভর্তি সামগ্রী গলিপথ দিয়ে বেরিয়ে যেত আর সেগুলো যেত তাঁদের সিন্দুকে, যারা তাঁর কাছে টাকা, সোনা বা জমি পেত।

মিসেস চৌধুরী বুদ্ধি বাতলে দিলেন রেহানাকে। বাড়ি বানানোর বুদ্ধি।

রেহানা একজন স্থপতি ডাকলেন। সময়টা মে মাস, আদালতে মামলার দুই মাস পরে। বাড়ি যত বড় করে বানানো সম্ভব বানান, এটাই ছিল রেহানার একমাত্র অনুরোধ। জমকালো করে বানান। জুলাইয়ে ভিত গড়ার কাজ শুরু করে দিল মজুররা এসে, মাঝগ্রীষ্মের তীব্র উত্তাপে তাদের পিঠ কালে মুক্তার মতো চকচকে মসৃণ দেখাত। ওরা গর্তে সিমেন্ট ভরা শুরু করল। ভিত দাঁড় করাতে লোহার বড় বড় থাম পুঁতল। দেয়ালের জন্য কাঠের খসড়া তৈরি করল। কিন্তু আগস্টের মধ্যে পুরো টাকা শেষ হয়ে গেল।

ঋণ নেয়ার জন্য রেহানা ব্যাংকে গেলেন। প্রথমে চেষ্টা করলেন হাবিব ব্যাংকে, তারপর ইউনাইটেড আর ন্যাশনাল ব্যাংকে। রেহানার কোনো গ্যারান্টি ছিল না। ব্যাংক বলল, রেহানা চাইলে জমি বন্ধক রাখতে পারেন। কিন্তু রেহানা জমি বন্ধক রাখবেন না। তখন তেলতেলে কপাল আর গোলগাল মুখের এক লোক তাঁকে বলল, হ্যাঁ, কাজ করে দেবে বলে ভবনের পেছনে তাঁর অফিসে নিয়ে

গেল, যেখানে সে তাঁর হাত ওর কনুইয়ের নিচে প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতো ঢুকিয়ে দিল। এই প্রশ্নের জবাবে রেহানাও প্রায় বলতে যাচ্ছিলেন হ্যাঁ, যতক্ষণ পর্যন্ত না লোকটা কাছে এলো আর রেহানা তাঁর নিশ্বাসে তরকারির গন্ধ পেলেন আর দাঁতে দেখলেন সিগারেটের কালো কালো ছোপ। রেহানা এক লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন, তখনও হাতে ধরা ছিল সেই করার কাগজ, সবুজ ঝরনা কলম আর সেটির মাথায় লাগানো লেটার ওপেনার।

কয়েক মাস কেটে গেল। পাকা ভিতে শ্যাওলা ধরল। সেপ্টেম্বর, অক্টোবর। বর্ষাকাল সব ধুয়ে নিল, ইটগুলোকে বালিতে, বালির বস্তাগুলোকে ইটে পরিণত করল, যেখানে বাড়ির মোজাইক মেঝে হওয়ার কথা সেখানে তৈরি হলো একটা দুর্গন্ধময় বন্ধ ডোবা। রেহানা তার কিনারে দাঁড়িয়ে দেখলেন ব্যাঙাটির দল কালির রেখার মতো সেখানে সাঁতার কাটছে। বাগানের কেউটে সাপ থাম ঘিরে পঁচিয়ে উঠছে আর মশা ভনভনে বাতাসে কামড় দিচ্ছে।

তারপর তিনি টাকা পেলেন। ঠিক কীভাবে পেলেন তা এতগুলো বছর ধরে গোপন রেখেছেন, কারণ তিনি মনে রাখতে চেয়েছেন বাচ্চাদের ফিরিয়ে আনার জন্য কত কিছুই না তাঁকে করতে হয়েছে, কত দূর পর্যন্ত যেতে হয়েছে। আর রেহানা জানতেন, এসবের ভার শুধু তাঁকেই বহিতে হবে।

তারপর মনে হয় বাড়িটা যেন আপনাআপনিই উঠে গেল। বছর ফুরাতে না ফুরাতে দেয়ালগুলো দাঁড়িয়ে গেল; দুই মাস পর দেয়ালে মসৃণ পলস্তারা পড়ল, মার্চে বসন্তের তীব্র গরম নীলচে-ধূসর রঙের চুনকাম শুকিয়ে দিল এবং রেহানা দেখছিলেন কাঠমিস্ত্রি আবদুল মসৃণ এক টুকরো মেহগনি কাঠের ওপর অক্ষরগুলো খোদাই করছে, যেটা তিনি পুরনো বাড়ির কাজের সময় বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। ‘সোনা’, তিনি বলেছিলেন আর মিস্ত্রি জিজ্ঞেস করল, ‘আপনার মায়ের নাম?’ ‘না’ রেহানা উত্তরে বললেন, ‘শুধু এই বাড়িটার নাম।’ যা কিছু তিনি হারিয়েছেন এবং যা কিছু আর হারাতে চান না, তারই জন্য এই নাম।

পাকিস্তান অবজারভার-এ রেহানার বিজ্ঞাপনে সাড়া দিলেন সিনগু বাবু। ধানমণ্ডিতে সদ্য নির্মিত চার বেডরুমের বাড়ি। বসার ঘর, খাবারের ঘর, রান্নাঘর, বিশাল লন। ছয় মাসের ভাড়া অগ্রিম প্রয়োজন।

সিলেটে সেনগু বাবুর চা-বাগান আছে। মাঝে মাঝে তাঁকে কয়েক সপ্তাহের জন্য সেখানে যেতে হয়, উনি কৃতজ্ঞ থাকবেন যদি রেহানা তাঁর তরুণী স্ত্রীর দিকে এই সময় লক্ষ্য রাখেন। কয়েক মাস হলো তাঁদের বিয়ে হয়েছে, এ রকমই একটা বাড়ি তিনি খুঁজছিলেন, যেখানে প্রতিবেশীরা স্ত্রীকে একটু সঙ্গ দিতে পারবেন।

যদিও সুপ্রিয়া সেনগুকে দেখে মনে হলো না যে তাকে দেখে শুনে রাখার কোনো দরকার আছে। তিনি রেহানাকে বললেন যে তিনি একটা উপন্যাস

লিখছেন। আর বললেন যে তিনি রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের মতো হতে চান। রেহানা কি সুলতানার স্বপ্ন পড়েছেন?

রেহানা সুলতানার স্বপ্ন পড়েননি। কিন্তু তিনি মাথা নাড়লেন এবং জানালেন যে তাঁর ছয় মাসের ভাড়া আগাম দরকার। সেনগুপ্ত বাবু খয়েরি রঙের খামে তাঁকে টাকাটা দিলেন। রেহানা তাঁর হাতে এক গোছা চাবি তুলে দিলেন। তার পরদিন তিনি জজ সাহেবের কাছে হাজির হলেন, আদালতের নির্দেশপত্র শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে তিনি ব্যাগ গোছালেন, পরদিন সকালে বাচ্চাদের উদ্ধার করতে পিআইয়ের বিমানে যাত্রা করলেন।

বাচ্চাদের সঙ্গে আবার দেখা হওয়ার মুহূর্তটা তাঁর হৃদয় মনে আছে। ওরা বাগানে লুকোচুরি খেলছিল। ওদের মুখ আরও কালো আর পা আরও লম্বা হয়েছে এবং ওদের দেখার সঙ্গে সঙ্গে রেহানার নিশ্বাস থেমে গিয়েছিল। এমনকি এখনো, এই দশ বছর পরেও, কোনো এক মুহূর্তে সব আস্থা হারিয়ে তিনি হিম হয়ে যান, শক্তিত হন এই ভেবে যে তিনি আবার ওদের আবিষ্কার করবেন, নিজের করে নেবেন, বাড়িতে ফিরিয়ে আনবেন এবং ফের ওদের মা হবেন।

ঘটনাগুলো এভাবেই ঘটেছিল। রেহানা নিজেকে গল্পটা বলে শেষ করলেন আর গালের অশ্রু শুকিয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় রইলেন।



ভাগ্যক্রমে ওরা এগিয়ে ছিল।

পায়ের চারপাশে ধুলোর ঝড় তুলে হাঁটু উঁচিয়ে অপূর্ব কৌশলে আজমত রানা সীমানার বাইরে বল পাঠিয়ে দিয়ে যখন তার প্রথম অর্ধশত রান পূরণ করল, পুরো স্টেডিয়াম ফেটে পড়ল উচ্ছ্বাস আর হুল্লোড়ে। সবাই দাঁড়িয়ে দিগ্ভ্রম করে উঠল, পা মাটিতে ঠুকতে লাগল আর দেদারসে পেটাতে লাগল ড্রাম যা তারা সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। সবাই শিস দিচ্ছিল, আর গলায় ছিল স্লোগান 'জয় বাংলা! জয় বাংলা! জয় বাংলা!' দ্বিতীয় অর্ধশত রান পূর্ণ হওয়ার সময় চোঁচামেচিতে ঘোষকের গলা আর শোনা গেল না, আসন্ন বিজয়ের অনুভূতি আর উল্লাসে বাতাস যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলো।

ডিম্বাকৃতি স্টেডিয়াম কানায় কানায় ভরে গেছে সপরিবার আগত দর্শকে যারা এসেছে চডুইভাতির আয়োজন নিয়ে, হাতে হাতে ঘুরছে ঝালমুড়ির চোঁঙ্গা; এসেছে হাততালি দিতে, মাথায় রোদের উত্তাপ অনুভব করতে, ঝকঝকে বিকেলে তাকিয়ে দেখতে ওদের নায়কদের খেলা।

রেহানা এনেছেন চিকেন স্যাণ্ডউইচ। কাগজের মোড়ক খুলে তিনি তা সোহেলের দিকে এগিয়ে দিলেন, সোহেল ওর বন্ধু আরেফ আর আরেফের ভাই জয়কে নিয়ে পরের সারিতে বসেছে। একটা কামড় দিয়ে সোহেল বলল, ‘খুব ভালো হয়েছে।’ মায়ের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল আর স্যাণ্ডউইচগুলো বন্ধুদের মধ্যে বিলি করল।

রেহানা, মায়া আর মিসেস সেনগুপ্ত একসঙ্গে বসেছেন। ‘ওরা কি বিয়ের দিনক্ষণ পাকা করেছে?’ মিসেস সেনগুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন।

‘না,’ রেহানা অস্ফুট স্বরে বললেন।

‘মেয়েটার বয়স এত কম,’ সানগ্লাসটা কপালের ওপরে তুলে দিয়ে বললেন, মিসেস সেনগুপ্ত, ‘এত তাড়াহুড়োর কী আছে?’

রেহানা তার সঙ্গে একমত হতে চাইলেন, কিন্তু তা না করে মিসেস সেনগুপ্তর কনুইয়ে চাপ দিয়ে ইশারা করলেন প্রসঙ্গ পাল্টাতে। ‘চলেন সবাই ড্রিংকস নেই।’

সোহেল হাতের ইশারায় ডাকল পানীয় বিক্রেতা বালককে। ‘কারা লেমোনেড আর কারা অরেঞ্জ?’ তোলা হাতগুলো গুণে সে পকেটে হাত দিল।

মিসেস সেনগুপ্ত হাত নেড়ে সোহেলকে থামিয়ে বলেন, ‘না, প্লিজ, আমি দিচ্ছি।’

‘ও আচ্ছা, ঠিক আছে,’ বলে সোহেল বসে পড়ল।

স্টেডিয়ামভর্তি মানুষ আনন্দে চিৎকার করছে; তাদের উত্তোলিত হাতগুলো রেহানাকে ভালো করে দেখতে দিচ্ছে না। ক্রিকে থাকতে থাকতে আজমতকে আরেকবার ভালো করে দেখতে চান রেহানা, তাই তিনি বেঞ্চের ওপর উঠে সামনের সারিগুলোতে বসা হাজার হাজার মানুষের মাথার ওপর দিয়ে তাকালেন, সূর্যকে আড়াল করার জন্য হাত রাখলেন চোখের ওপর। চারপাশে একটা বিম-ধরানো ভাব। রেহানা টের পেলেন হাসির দমক তাঁর পায়ের পাতা বেয়ে উপরে উঠে আসছে। মন খুলে তিনি হাসতে শুরু করলেন। মাথাটা পেছনে হেলিয়ে চোখ কুঁচকে তাকালেন সূর্যের দিকে, মধ্য দুপুরের প্রখরতায় চোখ ঝলসে গিয়ে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। মনে হলো আজকের দিনটা হয়তো তাঁর জীবনের সবচেয়ে সুখী দিন। সিলভিকে নিয়ে যা-কিছু ঘটেছে সবই অচিরেই তুচ্ছ; অচিরেই সোহেল সব ভুলে যাবে। এখনই তাকে দ্যাখো না, বন্ধুদের হাতে হাত ধরে খেলা নিয়ে প্রকাশ করছে উল্লাস। রেহানা তাঁর মুখে হাসি করলেন, দূর করতে চাইলেন দুপুরে গরম ভাব।

মায়া মুখ ঘুরিয়ে অবাক হয়ে দেখে তার মা বেঞ্চ থেকে নেমে আসছে। ‘আম্মু, তুমি কী করছ?’

‘তোমাকে তো আগেই বলেছি, আজমত রানাকে আমার খুব ভালো লাগে। দেখতে কী হ্যান্ডসাম, ওকে দেখলে তোমার বাবার কথা মনে হয়। আজকে

আমরা চোখ বন্ধ করে জিতে যাব। নাও, আরেকটু লেমোনেড নাও, মায়া।’
মেয়ের দিকে বোতল বাড়িয়ে দিয়ে বললেন রেহানা। মেয়েটা সবসময় শোভন আর
বেশি ভদ্র, তিনি আপন মনে ভাবলেন। একটু আনন্দ করা এমন কী বড় ব্যাপার?

নাইজেল গিফোর্ড আজমত রানার দিকে বল করার জন্য তৈরি হলো।

মায়া তার জায়গায় ঠিকমতো বসে, দুটো হাত হাঁটুর ওপর রেখে একটু সামনে
ঝুঁকে পিচের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়েছিল। সোহেল পরের সারিতে বন্ধুদের সঙ্গে
তর্ক করছিল। তারা মিলিটারি-ব্যবসায়ী আঁতাত নিয়ে কিছু একটা বলল।
সোহেল জোর দিয়ে বলল যে পাকিস্তানের অংশ হয়ে থাকা না থাকায় কিছু যায়-
আসে না, যতদিন অর্থনীতির ধারা না বদলাচ্ছে ততদিন গরিবদের প্রতি অন্যায়-
অবিচার চলতেই থাকবে। রেহানা স্মৃতি থেকে প্রায় পুরো বক্তৃতাটা বলতে
পারবেন। আরেফ বলল, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব
অধিবেশন ডাকা আর মুজিবকে প্রধানমন্ত্রীর পদে বহাল করা। তা না হলে পুরো
নির্বাচন একটা প্রহসনে পরিণত হবে, আর কে জানে এরপর কী ঘটবে।

নাইজেল গিফোর্ড যখন তার ডান হাত উঁচু করে আঙুলের ডগা থেকে জীর্ণ
লাল বলটা ছুঁড়ে মারতে তৈরি হলো এবং মারল বাতাস ভেদ করে বুলেটের মতো
সোজা আজমতের দিকে, যে হাঁটু বাঁকিয়ে ব্যাট কাত করে অপেক্ষায় ছিল দুপুরের
খররোদের মেঘশূন্য আকাশের পটভূমিকায়, স্টেডিয়াম-ভর্তি মানুষ তখন টানটান
উত্তেজনায় রুদ্ধশ্বাস। ভরপুর স্টেডিয়ামের অন্তরঙ্গ পরিবেশে সবাই সেটা
একসঙ্গে টের পেল।

ওরা উঠে দাঁড়াতে শুরু করল আর ওদের মুষ্টিবদ্ধ হাত বাতাসে তরঙ্গ তুলল।
একটা গর্জন স্টেডিয়াম ছাপিয়ে উপরে উঠে গেল। কিন্তু এবার ওরা খেলা দেখে
হইচই করছে বলে মনে হলো না। খেলোয়াড়রা পিচ থেকে মাথা তুলে
স্টেডিয়াম-ভর্তি মানুষের দিকে অবাক হয়ে তাকাল, ওদের চোখে ধূসর রেহানা
চারপাশে তাকালেন, যে মানুষগুলো মুহূর্ত আগেও আনন্দে মেতেছিল, তাদের
অস্থির দেখাল; তাদের চোখ রাগে গনগনে; সবাই এক লক্ষ্যে ভুলে গেল
ক্রিকেট, বালমুড়ি, বাব্বভর্তি খাবার, বাদ্য-বাজনা সব। ওরা জানার আগেই
সবাই জেনে গেছে; কী জেনেছে সেটা খুব দরকারি মনে হলো না, মোদ্দা কথা
হলো, তাদের বাঁধনছেঁড়া আনন্দ হঠাৎ করে যেন উবে গেল।

কেউ একটা ইট ছুঁড়ে মারল মাঠের মধ্যে। আরেকজন ছুঁড়ে মারল একটা
ভাঙা লাঠি। ওপর থেকে খবরের কাগজের ছেঁড়া পাতার টুকরো ভাসতে ভাসতে
নিচে নেমে এলো। ‘কী হচ্ছে?’ রেহানা শুনলেন সোহেল জিজ্ঞেস করছে।

‘আমরা জানি না,’ কেউ একজন উত্তর দিল, ‘রেডিওতে কিছু বলেছে...’

রেহানা স্যাডউইচগুলো গোছাতে শুরু করলেন। ‘আমু চলো,’ সোহেল বলল, ‘এগুলো থাক।’ মানুষজন লাফিয়ে একের পর এক বেঞ্চ পার হচ্ছিল। গেটের কাছে উপচে পড়া ভিড়ে বের হওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। সোহেল, আরেফ ও জয় ভিড় ঠেলে ওদের জন্য পথ করে দিল।

ক্রিকেট খেলা বন্ধ হয়ে গেছে, খেলোয়াড়রা হাতের গ্লাভস আর টুপি খুলতে খুলতে মাঠের কিনারে ছড়িয়ে পড়ল। কেউ দেখল না মেঘ কেটে সূর্য বেরিয়ে এসে আজমত রানার ওপর জ্বলছে, রমনা রেসকোর্সের দিকে তাঁর দৃষ্টি, যেখানে কয়েক সপ্তাহ আগে সবাই জড়ো হয়েছিল শেখ মুজিবুর রহমানের বিজয় উৎসব পালন করতে। জনতাকে শান্ত হয়ে নিজ নিজ আসনে বসার জন্য ঘোষকের আহ্বান কারো কানে গেল না।

বেরুবার পথের দিকে এগোনোর সময় হুড়োহুড়ি আর ধাক্কাধাক্কি লেগে গেল। মায়ার পিচ্ছিল কনুই শক্ত করে ধরে থাকতে গিয়ে রেহানা মিসেস সেনগুপ্তকে হারিয়ে ফেললেন। তিনি সোহেলের ঘন চুলে ভরা মাথা বরাবর চলতে চেষ্টা করলেন। ঘাম আর বাসি নিশ্বাসের গন্ধ তাঁকে গ্রাস করল। ভয় আর ত্রাসে এক দৌড়ে পিছু ফিরে যাওয়ার তাগিদ থেকে তিনি নিজেকে কোনোক্রমে আটকালেন। কনুই আর বগলের সংঘর্ষ হলো, একের মুখের ওপর অপর মানুষের পিঠ আর বাচ্চাদের বুলে থাকা পা। রেহানা শক্ত করে মায়ার হাত ধরে ঠেলতে ঠেলতে সামনে এগিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামলেন। গাড়ি পার্কের জায়গাটায় সোহেল হাত নেড়ে সবাইকে জড়ো করল। ‘আমার পেছনে থাকো!’ ও বলল। ‘আমি জানি গাড়ি কোথায় আছে।’ সবাইকে হারিয়ে আবার খুঁজতে গিয়ে ওর গলা ধরে গেছে।

সোহেল মিসেস সেনগুপ্তর ১৯৫৯ মডেলের স্কোডা অস্ট্রাভিয়ার স্টিয়ারিং ধরল। জয় আর আরেফ ঠাসাঠাসি করে বসল সামনের আসনে। রেহানা, মায়া আর মিসেস সেনগুপ্ত পেছনে বসলেন। মায়া কাচ নামানোর হাতল ঘুরিয়ে বলল, ‘জানালা তুলে রাখি।’

ওরা স্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে পল্টনের রাস্তায় পড়ল। ‘কী হচ্ছে আমি দেখতে চাই,’ বলল মায়া।

‘এখান থেকেই দেখতে পারবে।’ গাড়ির ভেতরটা গুমোট তবু ঝুঞ্জন ওরা অন্তত নিরাপদ। রাস্তার ভিড় দেখে দেখে রেহানার অভ্যাস হয়ে গেছে...নির্বাচন পর্যন্ত কয়েক মাস জুড়ে কত যে মিছিল হয়েছে...তারপরও আজকের দিনটা কেমন অন্য রকম; বাতাসে যেন অশুভ কিছুর আঁচ পাওয়া যাচ্ছে। তিনি আয়নায় সোহেলের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলেন, কিন্তু সোহেলের সমস্ত মনোযোগ রাস্তার দিকে, ওর হাত স্টিয়ারিংয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে থাকল।

ওরা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ঢুকল। গাড়ির দ্রুত কার্জন হল পেরিয়ে গেল।

টিএসসির সামনে এসে ওরা দেখল সাদা পোশাক ও কালো ব্যাজ পরা ব্যানারবাহী মানুষের ঢেউ মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে তালে তালে শ্লোগান দিচ্ছে। মায়া দু' হাত মুখের সামনে গোল করে ধরে জানালার গায়ে ঠেকিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'জয় বাংলা! জয় শেখ মুজিব!'

মিছিলটা ওদের দিকে এগিয়ে এলে সোহেল ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিয়ে গাড়িটা পেছনে নেয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু সার করা গাড়ির মধ্যে ওরা আটকে যায়। শ্লোগান উচ্চকিত হচ্ছিল এবং শব্দগুলো ধীরে ধীরে বোঝা যেতে লাগল।

মায়া ভিড়ের লোকগুলোকে চেনার চেষ্টা করে। 'কারা এরা? ছাত্রলীগ?'

'বলতে পারব না,' সোহেল বলে; 'আমরা কি নেমে যাব?'

রেহানা মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'গাড়ির ভেতরেই ঠিক আছি আমরা। ভেতরেই থাকি।' মিসেস সেনগুপ্তও একমত হয়ে মাথা নাড়লেন। মায়া অস্থিরভাবে একবার পাশে একবার পেছনে দেখছিল, জানালার কাছে মুখ ঠেকিয়ে রাখছিল। রেহানা জানতেন মায়াকে স্থির হতে বলে কোনো লাভ নেই; মায়া যে দরজা ভেঙে বাইরে চলে যায়নি সেজন্য তিনি আল্লাহকে শুকুর জানান।

কয়েক মিনিটের মধ্যে মিছিল তাদের গ্রাস করে ফেলে। মিছিল যখন সাপের মতো এঁকেবঁকে এগোয় তখন কেউ কেউ গাড়ির ছাদে চাপড় দেয়। পেছনটায় কিল বসায়, দাঁত বের করে তাকায় এবং জানালার কাছে মুখ চেপে ধরে ওরা 'জয় বাংলা!' চিৎকার করল। তাদের নিশ্বাসের হাওয়া জানালার কাছে মেঘমালা তৈরি করে। 'পাকিস্তান নিপাত যাক! একনায়কতন্ত্র নিপাত যাক!'

একজন সোহেলকে চিনে ফেলল। সে আঙুলের গাঁট দিয়ে টোকা দিল। 'দোস্ত!'

মায়া জানালায় চাপড় মেরে বলল, 'ঝিনু!'

ছেলেটা হাত দিয়ে দূরবীন বানিয়ে ভেতরে উঁকি দিল। 'তোমরা গাড়ির ভেতর কী করছ?' সে চোঁচিয়ে উঠল।

সোহেল জানালাটা একটু খুলল আর ছেলেটা সেই ফাঁকে আঙুল আটকে রাখল।

'মা আর বোনকে নিয়ে আমি বাসায় যাচ্ছি,' সোহেল বলল, 'ব্যাপার কী?'

'তুমি শোন নাই? অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়ে দিয়েছে।'

'কী?'

'শালা ভুট্টো হারামজাদা ইয়াহিয়াকে বুঝিয়েছে কোনো বাঙালি পাকিস্তান চালাতে পারবে না।'

'কী?' মায়া বলল, 'নির্বাচনের রায় বাতিল?'

জয় আর আরেফ ঝিনুর দিকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়, জানতে চায় মুজিব

এখন কী করবেন বলে ওর ধারণা। ওরা সবাই বলেই যাচ্ছিল—‘আমরা জানতাম, এ রকমটা যে হবে আমরা জানতাম।’ শুধু কয়েকটা মুহূর্ত, কয়েকটা বাক্য, কিন্তু রেহানা টের পেলেন খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে ওরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। রেহানা নিজেকে বলতে থাকলেন, এখনও সবকিছুর দায়দায়িত্ব তাঁর। তাঁর সম্মতি ছাড়া কিছুই হবে না। তিনি সিটের সামনে ঝুঁকে এলেন।

‘সোহেল বেটা, ভিড় পাতলা হয়ে আসছে, আমাদের এখন যাওয়া উচিত।’

সোহেল স্টিয়ারিংয়ের ওপর আঙুলের টোকা দিতে দিতে জয়কে অক্ষুটে কিছু বলে, তারপর পেছনে মাথা ঘোরায়। ‘ঠিক আছে আম্মু, চলো যাই।’

যাক। বাসায় গিয়ে একটা উপায় বের করতে হবে, যাতে সোহেল আবার ফিরে না যায়।

‘আমরা আসছি,’ গাড়ির জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটাকে সে বলল, ‘এখনই ফিরে আসব।’

‘তাড়াতাড়ি এসো কিছু...পরে আমাদের টিএসসিতে পাবে।’

‘তোমরা এখনই যাও না, আমি চালিয়ে নিতে পারব,’ মিসেস সেনগুপ্ত বললেন।

‘না, সুপ্রিয়া, ওরাই আমাদের নিয়ে যাক,’ বললেন রেহানা।

মিসেস সেনগুপ্ত বললেন, ‘কী বলেন, ওদেরকে আবার এতটা পথ ফিরে আসতে হবে। সোহেল গাড়ি থামাও।’

রেহানা সেই দিনটিকে শাপ-শাপান্ত করলেন যেদিন সেনগুপ্ত বাবু তাঁর স্ত্রীকে গাড়ি চালানো শিখিয়েছিলেন। রেহানা চাচ্ছিলেন সবাইকে নিয়ে ঘরে ফিরে যেতে। তিনি মিসেস সেনগুপ্তকে বললেন, ‘আপনি কি মনে করেন আমরা, মানে শুধু তিনজন মেয়ের যাওয়া ঠিক হবে?’

‘অবশ্যই ঠিক হবে। আমরা তো গাড়িতেই থাকব, কী আর হবে?’

সোহেল সামান্য উদ্বেগের সঙ্গে বলে, ‘আম্মু, তোমরা ঠিকমতো যেতে পারবে তো?’

‘হ্যাঁ,’ উত্তরে বললেন রেহানা। তাঁর কণ্ঠ দুর্বল শোনাল, কিন্তু সোহেলকে আর বেশি আশ্বস্ত করার দরকার হলো না।

শেষ মিছিলটা পার হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ওরা অপেক্ষা করল। সোহেল রোকেয়া হলের সামনে গাড়ি থামিয়ে ইঞ্জিনটা চালু রাখল। ‘তোমরা পারবে তো?’

‘হ্যাঁ, চিন্তা করো না,’ মিসেস সেনগুপ্ত বললেন। ‘আমি বাড়ি পৌঁছে দেব। তুমি বন্ধুদের সাথে যাও তো। যাও।’

‘ঠিক আছে। আম্মু,...আমি শুধু কী হচ্ছে না হচ্ছে সেটা জেনে সোজা বাসায় চলে আসব।’

একটা শঙ্কা জেগে উঠল রেহানার বুকে, কিন্তু সেটিকে অতিক্রম করে তিনি ছেলেকে বললেন, ‘সাবধানে থেকো, বেটা।’

‘ভেবো না। যাই।’

‘খোদা হাফেজ।’

মিসেস সেনগুপ্ত ইতিমধ্যে গাড়ির সামনে চলে গিয়ে চালকের আসনে বসার অপেক্ষা করছেন। গাড়ির দরজাটা খুলে ধরে কায়দা করে রেহানার জন্য তিনি বললেন, ‘এত চিন্তা করবেন না।’

হঠাৎ করে লুপ্তিপুরা হালকা-পাতলা একটা ছেলে তাঁর পাশ দিয়ে তীরের মতো ছুটে চলে গেল। মিসেস সেনগুপ্তের কাঁধ থেকে শাড়ির আঁচল খসে পড়ল, দেখা গেল তাঁর ব্লাউজ ও অনাবৃত পেট। সামনে ঝুঁকে পড়ে আঁচলটা তুলতে গিয়ে তাঁর পা হড়কে গেল এবং হাত দিয়ে পড়ে যাওয়া ঠেকানোর আগেই তাঁর মাথা ঠুঁকে গেল চাকার সঙ্গে।

রেহানা তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে তাঁকে তোলার চেষ্টা করেন। ‘ব্যথা পেয়েছেন?’ মিসেস সেনগুপ্তকে টেনে তুলে চালকের আসনে বসিয়ে রেহানা দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিলেন। ‘ব্যথা পাননি তো?’ আবার জিজ্ঞেস করলেন রেহানা।

‘না, এমন কিছু না’ মিসেস সেনগুপ্ত বললেন, ‘শুধু একটু ময়লা লেগেছে।’

‘এই যে, রুমালটা নিন।’

‘সামান্য একটা দুর্ঘটনা। চিন্তার কিছু নেই।’ রুমাল নিয়ে মিসেস সেনগুপ্ত হাতের তালু ঘষে কাদা মুছতে লাগলেন।

‘সুপ্রিয়া,’ রেহানা বললেন, ‘আপনার টিপটা খুলে পড়ে গেছে।’

‘ও,’ মিসেস সেনগুপ্ত নিজের কপাল ছুঁয়ে দেখে শাড়ির ভাঁজের দিকে তাকালেন। ‘টের পাইনি,’ বলে জানালার কাচ নামিয়ে চোখে লেগে থাকা কয়েক ফোটা পানি ঝট করে মুছে ফেললেন। বিচলিতভাবে হাসতে হাসতে বললেন, ‘একটুখানি চমকে গিয়েছিলাম।’ তারপর সিট আসন করে আয়নার নিজের চেহারাটা দেখে নিলেন এবং মুঠি করে গিয়ারটা ধরলেন।

রেহানা পেছন ফিরে মায়ার দিকে তাকালেন। মেয়েটা মিছির দিকে তাকিয়ে আছে, মিছিল বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর পেরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে।

বাংলোর গেটের মুখে ওদের জন্য অপেক্ষা করছে শারমিন, চওড়া কাঁধ, বয়সের ছাপহীন দৃঢ় চেহারার লম্বা এক তরুণী। স্ট্রট কলেজের ছাত্রী, রাজনৈতিক পোস্টারের জন্য ক্যাম্পাসে সুপরিচিত, মায়ার সবচেয়ে ভালো বন্ধু, বা যে-সম্ভাষণটা তার বেশি পছন্দ—কমরেড।

ওরা গাড়ি থেকে নামতে শারমিন মায়াকে বলে, ‘কোথায় ছিলে?’

কাগজের একটা বিশাল রোল নিয়ে সে হিমশিম খাচ্ছে। মিসেস সেনগুপ্ত হাত বুলিয়ে মাথার পেছনটা পরিপাটি করে নেন। মিসেস চৌধুরীর কুকুর রোমিও আর জুলিয়েট একসঙ্গে ডাকতে শুরু করেছে।

মায়া শারমিনকে জড়িয়ে ধরে। ‘আমরা ক্রিকেট ম্যাচ দেখে ফিরলাম। পল্টনে আটকে গেছিলাম।’

‘খবর শোনার সাথে সাথে আমি তোমার খোঁজে আসলাম। এগুলো একটু ধরো তো।’

‘মনে হয় না তুমি আজকে ফিরতে পারবে।’ মায়া বলে, সে কাগজের অন্য প্রান্তটা ধরে।

‘সেটা নিয়ে চিন্তা করো না,’ রেহানা গেটের হড়কো খুলে বলেন, ‘এখানে থেকে যেয়ো।’ এই আমন্ত্রণের কোনো দরকার ছিল না; শারমিন সবসময় থেকে যায়। রেহানার খাটের নিচে একটা তোশক আছে, যেটাতে ধুলো জমতে পারে না। বাথরুমের আয়নার পেছনের তাকে ওর একটা টুথব্রাশও থাকে। ভিকারুননিসা নূন স্কুলে মায়ার একেবারে শুরুর দিনগুলো থেকে শারমিনের সঙ্গে ওর গভীর বন্ধুত্ব। সোহেল ও মায়া তখন সবে লাহোর থেকে ফিরেছে, রেহানা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ওদের এখন বাংলা শেখাটা খুব জরুরি। মিষ্টির দোকান বা খেলার মাঠে বলতে শেখা আধাখাসতা বাংলা নয়, প্রমিত বাংলা, যেমনটি স্কুলে শেখানো হয়। সুতরাং মায়াকে ভিকারুননিসায় পাঠানো হলো, যেখানকার শিক্ষিকারা সব পোড়-খাওয়া, মেয়েরা শক্ত বেগি বাঁধে আর হাঁটু পর্যন্ত সাদা মোজা পরে। সেই প্রথম দিন মায়া তার বেঞ্চে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করে, ‘আমার নাম শেহেরজাদী হক মায়া। বিখ্যাত একজন গল্পকারের নামে আমার নাম। আমার বাবা মারা গেছেন। আমি লাহোরফেরত। আমাদের বিরাট বড় একটা বাড়ি আছে, বাড়িটার নাম সোনা।’ কষ্ট করে অবাঙালি উচ্চারণে বলা মায়ার কথাগুলো শোনার জন্য মেয়েরা কানের পিঠে হাত রাখে, সারা ক্লাস জুড়ে এক ফিসফিসে নীরবতা। তারপর মায়ার কথা শেষ হতেই ‘বিহারি! বিহারি!’ চিৎকার মায়াকে ধাওয়া করলে সে ছুটে বেরিয়ে যায় হকি মাঠের এক কোনায়; তার স্কুলপোশাকের স্কার্টের প্রান্ত দোল খায় তার পায়ের কাছে; ওখানেই স্কার্টের ঘেরের মধ্যে বসে ওকে আমসত্ত্ব চুষতে দেখে শারমিন।

‘আমাকে একটু দেবে?’

‘আমি তো পুরোটা চুষে ফেলেছি।’

‘কিছু হবে না।’ ভেজা আমসত্ত্ব দুই আঙুলে চিমাটি দিয়ে তুলে নিয়ে মুখে চালান করে দেয় শারমিন। ‘তোমার বাবা মারা গেছেন, না? আমারও।’

‘কীভাবে মারা গেছেন তোমার বাবা?’

‘টাইফয়েড । তোমার বাবা?’

‘হাট অ্যাটাক ।’

ওরা চিরকালের বন্ধু হয়ে যায় ।

মায়া সবসময় শারমিনকে সমীহ চোখে দেখে, সে কখনোই বুঝতে পারে না আন্দোলনে এত সব জাঁদরেল মেয়ে থাকতে শারমিন কেন ওকেই বেছে নিয়েছে । কিন্তু মায়া জানে, শারমিন কতটা ভালোবাসার কাঙাল । রেহানার মতো সে নিজে কখনো প্রশ্ন তোলেনি, কেন নিজের পরিবারের সঙ্গে ছুটি কাটানোর বদলে শারমিন ধানমন্ডির এই বাংলাতে এসে অনেক সময় তার ছুটির দিনগুলো কাটায় । মনে হয় যেন মেয়েটির যাওয়ার কোনো জায়গা নেই । তাঁর বাড়িতে শারমিনের এই আসা-যাওয়া-থাকা রেহানা মেনে নিয়েছেন, যদিও এমন নয় যে তিনি মেয়েটিকে খুব পছন্দ করেন, তবু তাঁর ভাবতে ভালো লাগে যে তিনি এমন একজন সদাশয় যে পরকেও আপন করে নিতে পারে ।

বসার ঘরে মায়া ও শারমিন হাত ধরাধরি করে ধরে পোস্টারগুলো পরখ করছে ।

‘দারুণ হয়েছে,’ বলে মায়া ।

ক্যানভাসে একটা খালি জায়গা ব্রাশ দিয়ে দেখিয়ে শারমিন বলে, ‘মনে হয় এখানে আরেকটু রঙ চড়ানো দরকার ।’ ওর হাত সিক্ত, আঙুলগুলো সব্জে এবং রঙ লেগে আঁঠালো হয়ে আছে ।

‘হয়তো । তবে এরও একটা মানে হতে পারে, এই ফাঁকা জায়গাটা হতে পারে সম্ভাবনার প্রতীক, ভবিষ্যৎ ।’ মায়া বলে ।

‘সেটা বড় বেশি অ্যাবস্ট্রাক্ট হয়ে যায় না?’

‘হতে পারে ।’ মায়া কাঁধ ঝাঁকিয়ে বোঝাতে চায়, যারা খালি জায়গার প্রতীকী অর্থ বুঝতে পারে না, তারা এই পোস্টারের তাৎপর্য বোঝার যোগ্য নয় ।

রেহানা নিজের ঘরে চলে যান । তাঁর মাথাটা দপদপ করে । মিসেস সেনগুপ্তর লুটানো শাড়ি ও আতঙ্কিত মুখের ছবিটা রেহানা মন থেকে সরিয়ে পారেন না । সরাতে পারেন না স্টিয়ারিং হুইলে আঙুল দিয়ে সোহেলের তাল ঠোকার দৃশ্যটি । ছেলেটা এখন কী করছে? হয়তো যুক্তিবুদ্ধির স্বয়ং যোগ করতে চাইছে? রেহানা আপন মনে বলেন । ছেলেটা সবসময়ে এরকমই । ছাত্ররা যদি একটা হাস্যামা বাঁধাতে চায়, সে তখন বলেছে নেহাত একটা কিছু প্রমাণ করার জন্য ক্লাস লগুভণ্ড করা উচিত নয় । ধীরে ধীরে আলোচনার ধারা এমনভাবে পাল্টে দেবে যে ছেলেরা আর বদলা নেয়ার জন্য চিৎকার করে বলবে না, ওরা নিজেদের কী মনে করে?

ঘুরতে থাকা পাখার বাতাসের সঙ্গে রেহানা নিজের কপালে হাত বোলান । এক

মিনিটের জন্য আমি চোখ দুটো বন্ধ করব, তিনি ভাবেন, তারপর জেগে উঠব, আবার দৃষ্টিভ্রমে ডুবব।

কয়েক ঘণ্টা পর রেহানা যখন ঘর থেকে বের হন, ততক্ষণে বাইরে অন্ধকার নেমেছে, মৃদুমন্দ বাতাসে বাগানে পাতার মর্মর। বসার ঘর থেকে ভেসে আসা গলার স্বর শুনে তিনি এগিয়ে যান, দেখতে পান সোহেলের ঘর-ভর্তি বন্ধুবান্ধব।

‘সালাম-আলাইকুম, আন্টি,’ ওরা নানা কণ্ঠে একত্রে বলে। কেউ সিগারেট খাচ্ছে না, কিন্তু তামাকের গন্ধে ঘরের বাতাস ভারি। মায়া ও শারমিন আরেক শিট কাগজের ওপর ঝুঁকে আছে। আরেফ বাস্র থেকে তার গিটার বের করে।

‘আম্মু,’ সবার ওপর গলা চড়িয়ে সোহেল বলে, ‘শেখ মুজিব সাত তারিখে একটা মিটিং ডেকেছেন। তোমাকে যেতে হবে।’

‘আমাকে? কেন?’

‘ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটবে সেদিন।’

‘হ্যাঁ আন্টি,’ আরেফ গিটারের নব আঁটো করতে করতে বলে, ‘ওখানে যেতেই হবে আপনাকে... আগের মিটিংয়ের চেয়ে এটা আরও অনেক বড় হবে।’

‘তোমরা যেও,’ একটু জড়তার সঙ্গে বলেন রেহানা। ‘পরে এসে আমাকে সব বলো।’ তারপর হঠাৎ তিনি এক অস্বস্তির মধ্যে পড়ে যান, জিমখানায় কেবল পুরুষদের ঘরে ভুল করে ঢুকে পড়লে যে-রকম হতো ঠিক সেই রকম।

‘মা, শোনোই না ভালো করে,’ মাঝখানে বলে ওঠে মায়া, ‘ওখানে তোমার না গেলে চলবে না, মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে পারেন।’

‘জানি না, পরে দেখা যাবে, ঠিক আছে? তোমাদের কারও কিছু লাগবে? খিদা পেয়েছে?’

‘আমাদের নিয়ে ভেবো না আম্মু,’ ওর দিকে হাত নেড়ে সোহেল বলল। ‘বিপ্লবই আমাদের বাঁচিয়ে রাখবে।’

রান্নাঘরে যাওয়ার সময় রেহানা ভাবেন, জনসভায় যাওয়া তাঁর উচিত হবে কি না। ওরা সবসময় ওকে মিটিং-মিছিলে ওদের সঙ্গে যেতে বলে কিন্তু বয়সে তরুণ বা ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে এবং সমাজতান্ত্রিক দলের সভাপতি বা ছাত্র সংগঠনের নির্বাচনগুলোয় যোগ না দিয়ে, সোহেল আর মায়ার মতো কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো না পড়ে আর বটগাছের নিচে বসে প্রতিরোধের মূল প্রতিপাদ্য নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তর্ক-পাল্টা করে না করে... রেহানার মনে হয় না বাঙালি জাতীয়তাবাদীর আসল চরিত্র কিংবা বোধ বুকে ধারণ করা সম্ভব। তাঁর সেই তারুণ্যও নেই, চরিত্রও নেই, আর মুখে সেই বোলও নেই। ঠিক শব্দগুলো যদিও এরই মধ্যে তাঁর জানা হয়ে গেছে তবুও সহজাতভাবে তাঁর মুখ থেকে

সেগুলো বের হয় না: ‘কমরেড,’ ‘প্রলোতারিয়েত,’ ‘বিপ্লব’। শব্দগুলো কঠিন, যথাযথ...কিন্তু তাঁর বেছে নেয়া এই দেশটি সম্পর্কে রেহানার একান্ত অনুভূতি এই শব্দগুলো ধারণ করতে পারেনি। শত্রুর ভাষা উর্দু তিনি অনর্গল বলে যান। অন্য অনেকের মতো তিনি ভাব দেখাতে পারেন না উর্দু ছেড়ে তিনি এখন অনায়াসে শুদ্ধ বাংলা ধরতে পারেন, আসসালামু আলাইকুম-এর বদলে অবলীলায় বলতে পারেন নিরপেক্ষ সম্ভাষণ আদাব, বা এমনকি হিন্দু সম্বোধন নমস্কার। রেহানার জিভে এসব পরিবর্তন তালগোল পাকিয়ে যায়। উর্দুর প্রতি ভালোবাসা তিনি ছাড়তে পারেননি, এর গীতিময়তা, দ্ব্যর্থবোধকতা, এর তাল লয় ছন্দ তাঁর ভালো লাগে।

না, সত্যিকারের বিপ্লবী হওয়ার চারিত্রিক গুণ রেহানার মধ্যে নেই। কিন্তু অনেক আগেই তিনি উপলব্ধি করেন, তাঁর সম্ভানেরা তাঁর জীবনের মধ্যমণি হয়ে রইবে, কিন্তু তাদের মন থেকে তিনি ধীরে ধীরে মুছে যাবেন। এর মধ্যে যতদিন পারা যায় তাঁর সন্তা তিনি ধরে রাখতে চান, বিশেষ করে এখন, যখন তাদের স্বপ্ন হঠাৎ বিশাল হয়ে উঠেছে। রান্নাঘরে ঢুকে তিনি ভাবেন, এতগুলো ক্ষুধার্ত স্বপ্নচারীকে তিনি কী খেতে দেবেন।

‘আম্মু, তোমার জন্য একটা উপহার আছে,’ সবার খাওয়া-দাওয়া হয়ে যাওয়ার পর সোহেল বলে। রেহানা শেষমেশ খিচুড়ি রेंধেছিলেন, চট করে হয়ে যায় আবার আলাদা করে ডাল রাঁধতে হয় না, সঙ্গে কাঁচামরিচ আর পেঁয়াজ দিয়ে ডিম ভাজা। মুহূর্তের মধ্যে সব চেটেপুটে শেষ।

‘কী?’ রেহানা জিজ্ঞেস করেন।

সোহেল চেয়ারের নিচ থেকে বিশাল একটা ব্যাগ টেনে বের করে। তারপর সেটি খুলে এক টুকরো চারকোনা কাপড় তুলে ধরে। কাপড়ের রং ঘন মেটে সবুজ, গরানগাছের নিচু ডালের পাতাগুলোর মতো। তার মাঝখানে বুড়ো লাল কাপড় একটু অসমানভাবে সেলাই করা। আর সেই লাল বুড়োর ভেতরে হলুদ রঙে পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্রের আদল কেটে বসানো।

‘আম্মু, এটা আমাদের পতাকা।’ রেহানাকে পতাকার দৈর্ঘ্য পুরো দেখানোর জন্য সে দু’হাত মেলে ধরে। আরেফ এসে একপাশে তলে, তারপর সেটা ওরা আড়াআড়িভাবে ধরে টানটান করে দেখায়। কয়েকজন হাততালি দেয়। কেউ একজন চেষ্টায়, ‘জয় বাংলা!’ দেশ নেই কিন্তু পতাকা আছে, রেহানা ভাবেন, কিন্তু বলেন না। মায়া পতাকাটা টেনে শালের মতো গায়ে জড়িয়ে বাঁশের লাঠির খোঁজে ছুটে যায়,...যাতে পতাকাটা ছাদে টাঙানো যায়।

ক্রিকেট খেলার পরের দিনগুলোতে চলে মিছিল, হরতাল, কারফিউ অমান্য করে মাইকে মাইকে উচ্চারিত শ্লোগান। সোহেল আর মায়া দিনের প্রায় পুরো সময়টাই বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটায়, প্রতিদিন রাত করে বাড়ি ফেরে, দিনবদলের কথা বলতে গিয়ে ওদের মুখে খই ফোটে। কিন্তু ধানমণ্ডি এলাকা শান্ত, এদিকে সবকিছু প্রায় স্বাভাবিক। সিলভির বিয়ের বাজারের পাহাড়সমান প্যাকেট নিয়ে মিসেস চৌধুরী মাঝে মধ্যে রেহানার দরজায় এসে দাঁড়ান। একটার পর একটা শাড়ি কেনা হচ্ছে, আর তার সঙ্গে মিল রেখে ব্লাউজ পেটিকোট, ব্লাউজের হাতায় লাগানোর জন্য লেসের ঝালর, মাথায় গাঁজার জন্য মিলসই ক্লিপ, ফিতা, প্লাস্টিকের ফুল। মিসেস চৌধুরী একদিন স্রেফ হাতের ব্যাগটা নিয়ে হাজির হন, রেহানা বুঝতে পারেন উনি গয়নার দোকানে গিয়েছিলেন। লাল মখমলে মোড়া বাস্ত্র দুটো তিনি চট করে বের করেন, সেই বাস্ত্র থেকে উঁকি মারা লকেট ও কানের দুল দেখে রেহানাকে ‘কী সুন্দর!’ ‘কী চমৎকার!’ বলে তারিফ করে যেতে হয়।

প্রথম দিকে কিছু দ্বিধা থাকা সত্ত্বেও মার্চের সাত তারিখে রেহানা রেসকোর্স ময়দানে হাজির হন। একটু আগেভাগেই তিনি পৌঁছান, কিন্তু এর মধ্যেই ময়দান মানুষে মানুষে সয়লাব। যেন সারাদেশের মানুষ চলে এসেছে; জনতার ঢল নেমেছে। যতদূর চোখ যায়, মাইলের পর মাইল শুধু মানুষের মাথা...চকচকে কালো, তমসাচ্ছন্ন অস্ত্রির দিগন্তে যেন সূর্যের ছটায় জ্বলছে।

দূর থেকে একটা ছোট সাদা ফুটকির মতো শেখ মুজিবের অবয়ব দেখা যায়। কয়েক বছর ধরে চলমান আন্দোলনের নেতা হিসেবে তাঁর কালো হুস্ব কোট, নিভীক গলার আওয়াজ, সবসময় আকাশের দিকে উত্তোলিত তর্জনী পরিচিত দৃশ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু এখনো তাঁকে জলজ্যান্ত দেখার মধ্যে একটা আলাদা শিহরণ আছে। যখন তিনি মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেলেন জনতা উন্মত্ত হয়ে গেল, রেহানা দূর থেকে দেখলেন তিনি তাঁর জনগণকে শান্ত করার জন্য, ভরসা দেয়ার জন্য হাত নাড়লেন। তাঁর জনগণ। এখন ওরা তাঁর হয়ে গেছে; তাঁর দায়িত্বে, তাঁর সন্তান। ওরা তাঁকে পিতা বলে ডাকে। তাঁকে এমনভাবে ভালোবাসে যেভাবে অনাথরা স্বপ্নে দেখে হারিয়ে যাওয়া পিতামাতাকে : কোনো নিশ্চয়তা নেই, শুধু আশা। গলা পরিষ্কার করে তিনি কথা বলা শুরু করেন। জনতার প্রচণ্ড উল্লাস, শিসের শব্দ, কানফাটা হুল্লোড়ে রেহানা তাঁকে নামমাত্র শুনতে পান; রেসকোর্সের ময়দানজুড়ে মেঘের মতো দোদুল্যমান পতাকাগুলোয় বিকেলের সূর্য আলো ছড়িয়ে দিয়েছিল, মনে হচ্ছিল সেই গনগনে উদ্বেগ তাঁর কণ্ঠস্বর দূলে দূলে উঠছে। ‘ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো,’ রেহানা কেবল এটুকু শুনতে পেলেন।

পুরো দৃশ্যটা রেহানার চোখের সামনে চিত্তহারী সাদা-কালো ছায়াছবির মতো ফুটে উঠল; মুজিবের কোর্তা-পায়জামার সাদা রং, তাঁর খাটো কোটের কালো রং,

রেহানা জানতেন কালো...যদিও তিনি দেখতে পাচ্ছেন না...তঁার সেই মোটা ফ্রেমের কালো চশমা, মঞ্চটা ঢাকার জন্য সাদা শামিয়ানা। রেহানা উপলব্ধি করলেন শেষ হওয়ার মুহূর্তে কখন যেন তিনি নিজেও জনতার সঙ্গে গলা মিলিয়ে চিৎকার শুরু করেছেন জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা...বুকের হাঁপরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শব্দগুলো ওঠানামা করে, সঙ্গে সঙ্গে চিৎকারের শিহরণ তাঁর রক্তে কাঁপন তোলে। মায়ের দিকে তাকিয়ে মায়ার মুখে ফুটে ওঠে প্রশ্রয়ের প্রসন্ন হাসি। হঠাৎ রেহানার নিজেকে অল্পবয়সী মনে হয়, যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সীমাহীন সম্ভাবনার পৃথিবীতে।

৩৮ বছর বয়সে এসে রেহানার শরীর তার আসল বয়সটা টের পায়। যারা তাঁকে চিনত না, ভাবত ও বুঝি ছাত্রী বা অবিবাহিত। কারণ বিয়ের আংটি অথবা অন্য কোনো সোনার জিনিসই সে পরত না, কিন্তু এখন আর তা নয়। ওজন খানিকটা বেড়েছে, মাঝে মধ্যে হাত-পায়ের ভারি ভাব বরং তিনি উপভোগ করেন, পেটে সামান্য ভাঁজ, নড়াচড়ায় দমের কিঞ্চিৎ ঘাটতি, আর হাড়ে, নিশ্বাসে টের পাওয়া যায় বয়সের ধীর অথচ নিশ্চিত আগমন। তার শরীরের এখনকার স্বস্তিজনক নতুন কাঠামোয় এলো নতুন খুঁত: নাক আর থুতনির মাঝখানে তেরছা খাঁজ, ঠোঁটের ওপরে হালকা ছায়া, কোমরে ও গোড়ালিতে মেদের প্রকাশ। রেহানার কাছে এগুলো সৌভাগ্যের চিহ্ন। কারণ এ চিহ্নগুলো দিয়েই তার এই যুদ্ধক্লান্ত শরীর প্রমাণ করে বাচ্চাদের বড় করতে তার উদয়াস্ত ভালোবাসা ও পরিশ্রমের কথা।

মায়া সামনে ঝুঁকে মায়ের হাত ধরে, মাঝে মধ্যে সে যেভাবে ভরসার মৃদু চাপ দেয় এ তেমন নয়, এই হাতে হাত ধরা একাত্মবোধ থেকে। সহসাই রেহানার মনে হয়, সব সমস্যার সমাধান আপনাতেই হয়ে যাবে: শেখ মুজিব হবেন প্রধানমন্ত্রী, এই দেশটা তাঁর আপন আবাস হয়েই থাকবে, বাচ্চারা তাঁরই বাচ্চা থাকবে সারা জীবন। অচিরেই এই পৃথিবীটা আপনা থেকে ঠিক হয়ে যাবে, আর তারা যাপন করবে খুব সাধারণ, ব্যত্যয়হীন একটা জীবন।

২৫ মার্চ ১৯৭১



অপারেশন সার্চলাইট



তারা এজন্য দোষারোপ করে সম্মিলিত এক আকস্মিক বধিরতাকে যা তাদের গ্রাস করেছিল। এছাড়া আর কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায় বিমানবন্দরে একের পর এক সামরিক বিমান অবতরণ আর সৈন্যদের বোঝানো যে তারা দুনিয়া উদ্ধার করছে? তা না হলে কী করে এটা হয় যে কেউ কিছু জানতে ও শুনতে পারেনি? এবং পরে তারা হয়তো বলত যে তাদের দেখা উচিত ছিল গাছের পাখিদের পূর্ব দিকে উড়ে, ঝাঁঝি পোকাদের পালানোর শব্দ শোনা, শুনতে পারা বাদুরের ডানা গুটানোর আওয়াজ বা বাড়ির পাটাতনের ফাটলে ঘাসের মতো সবুজ টিকটিকিদের লুকানোর শব্দ।

কিন্তু তারা এসব কথা বলেনি। এবং এভাবেই এটা ঘটেছিল।

২৫ মার্চ রাতে মিসেস চৌধুরী লেফটেন্যান্ট সাবিরের সম্মানে সম্মেলন দাওয়াত দেন। শহরের আকাশে-বাতাসে দিনভর অদ্ভুত সব গুজব ছিল। মুজিব বৈঠকে বসেছেন, কিন্তু কেউ বলছে না এই বৈঠক আদৌ কাজের হবে কিনা। পিলখানায় ইপিআর কম্পাউন্ডে সামরিক হামলার গুঞ্জন শোনা যায়; ছাত্ররা হোস্টেল থেকে ভাঙা টেবিল-চেয়ার আর ইট এনে রাস্তায় ব্যারিকেড তোলার চেষ্টা করে।

দাওয়াতের জন্য রাতটা মোটেই উপযুক্ত ছিল না, তবু মিসেস চৌধুরী জোর করলেন। ‘এসব বুট-ঝামেলায় ওদের স্বাগ্‌দান পর্যন্ত করতে পারিনি,’ তিনি

বললেন, ‘বড় করে কিছু না, ছোট একটা অনুষ্ঠান, হয়তো সিলভিকে আংটি পরানো হবে, এই।’ আস্ত একটা ভেড়া তিনি রোস্ট করলেন, সেটাকে টেবিলের মাঝখানে বসানো হলো আর চোয়ালের ভেতরে একটা ঢাউস টমেটো ঠেসেঠুসে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। রেহানা না বলতে পারেন না; সোহেলও যেতে রাজি হয়, হয়তো নিজেকে পরীক্ষা করতে—রেহানার মনে হয়। সোহেল সিলভি-সাবিরের দিকে তাকায় না, ভেড়ার রোস্টের দিকে চেয়ে থাকে। মায়া মনমরা; ও বাধ্য হয়েছে শারমিনকে বোকেয়া হলে রেখে আসতে, যেখানে ছিল চাপা উত্তেজনার প্রকাশ আর সিঁড়ির নিচে গান গাইছিল একদল বাউল। নিজেদের পাড়ার এই শান্তভাব মায়ার ভালো লাগে না, তারা যে বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে সেটা যেন ধানমণ্ডির কেউ জানেই না বা পরোয়া করে না। লিফলেট বিলি করতে করতে ‘আমরা করব জয়’ গান গাওয়ার জন্য মায়ার রাজপথে থেকে যেতে ইচ্ছা হয়েছিল।

প্রতিবেশীরা টেবিলের চারপাশে জড়ো হলেন। সিলভির পরনে জমকালো কাজ-করা ফিরোজা রঙের সালোয়ার-কামিজ। লেফটেন্যান্ট সাবির যথারীতি সামরিক পোশাকে। মিঠুনকে সেনগুপ্তরা সিলভির ঘরে শুইয়ে দিয়ে রান্নাঘর থেকে ভেসে আসা সুঘ্রাণের দিকে মনোযোগী হন।

পরিবেশ কেমন থমথমে। কেউ কিছুই শুনল না; এমনকি পেয়ারাগাছ থেকে ফল পড়ার শব্দও না, মার্চ মাসে যা হরহামেশাই ঘটে।

‘চলেন, আমরা সবাই সিলভি আর সাবিরকে শুভেচ্ছা জানাই। আমার লক্ষ্মী মেয়ে আর হবু জামাই, খোদা ওদের দু’জনকেই সুখী করুন।’

শুভেচ্ছা জানাতে সবাই দুধের শরবত ভরা গ্লাস তুলে ধরল। রেহানা সোহেলের পাশে বসলেন, তার হাতটা ধরে সান্ত্বনার হালকা চাপ দিতে চাইলেন। কিন্তু সোহেলের হাত দুটো টেবিলের ওপর, সে বলল, ‘আমাদের দেশের জন্য শুভ কামনা। এই দেশটা যেন অগ্নিপরীক্ষা পেরিয়ে শক্ত মাটিতে দাঁড়ায়।’

সেনগুপ্ত বাবু হেলান দিয়ে বসে ভুঁড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, ‘বাঃ, বাঃ!’
‘আর মঙ্গল-কামনা সর্বহারাদের জন্য! বিপ্লবের জন্য!’ মায়া বলল, উঠে দাঁড়িয়ে শরবতের তলানিটুকু দ্রুত শেষ করল।

‘ঠিক আছে, ঠিক আছে,’ মিসেস চৌধুরী বললেন, এখন খাওয়া-দাওয়া শুরু হোক।’

মিসেস চৌধুরী যখন ভেড়ার ঢেউ খেলানো টুকচকে পিঠে ছুরি বসান ততক্ষণে জিপ আর ট্যাংকের বহর ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে সারা শহরে। সাপের মতো বের হয়ে আসে সেনানিবাস থেকে; রেলক্রসিং পার হয়ে বনানীতে ঢোকে, সেখানে পৌঁছে দুই ভাগ হয়ে যায়। এক ভাগ এলিফ্যান্ট রোডের ভেতর দিয়ে, শাহবাগের

ভেতর দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ঢুকল। আরেক ভাগ চলে গেল পিলখানার দিকে, সবুজ জিপে সবজে পোশাকের লোক উড়িয়ে দিয়ে সবুজ পাকিস্তানি পতাকা, কাস্তুর মতো চাঁদ যেখানে হাসছে বাঁকা হাসি।

এসবের কিছুই না জেনে না বুঝে ভেড়ার রোস্টে ওরা হাত ডুবিয়ে খায়, ঠোট চাটে, হাড়িগুলো চুষে শেষ করে। পরে ওরা নিজেদের হাপুস-হপুস করে খাওয়া নিয়ে সরস মন্তব্যও করে। খাওয়া-দাওয়ার পর মিসেস চৌধুরী সিলভি আর সাবিরকে একটা সোফায় পাশাপাশি বসতে নির্দেশ দেন। বেলি ফুলের মালা সিলভির হাতে দিয়ে সেটা সাবিরের গলায় পরিয়ে দিতে বলেন। সাবির মাথা নিচু করলে সিলভি মালাটা তাকে পরিয়ে দেয়। মায়া ছাড়া সবাই হাততালি দিয়ে ওঠে, সে ছাদের দিকে তাকিয়ে গুনগুন করে আপন মনে গান গাইছিল। *আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।*

রাত দশটায় ট্যাংকগুলো গোলাবর্ষণ শুরু করে।

যেন নববর্ষের রাতে হাজার আতশবাজির শব্দ, ধাতব পাইপ পাথুরে রাস্তার ওপর দিয়ে টেনে আনার শব্দ, গরম তেলের ওপর ফুটতে থাকা লাল মরিচের তড়পানি।

‘ইয়া আল্লাহ!’ মিসেস চৌধুরী ডুকরে ওঠেন। ‘কী হচ্ছে এই সব?’

‘যে যেখানে আছেন সেখানেই থাকেন,’ বলে সাবির।

‘আমি বাড়ি যেতে চাই,’ অস্থিরভাবে বলেন মিসেস সেনগুপ্ত। ‘মিঠুনকে নিয়ে চলো যাই।’ বাচ্চাকে কোলে তুলে নিয়ে তিনি দরজার দিকে মুখ ফেরান।

মায়া বলে, ‘আম্মু, শব্দটা দুই নম্বর রোড থেকে আসছে।’

বজ্রপাতের মতো প্রচণ্ড গর্জন হয়। ‘হায় আল্লাহ! হায় আল্লাহ! হায় আল্লাহ!’ মিসেস চৌধুরী আতর্জন করেন। ‘ব্যস, আমরা শেষ।’

তারপর গুলির শব্দে সবার কানে তাল লেগে যায়। সে শব্দ ছাপিয়ে কেউ কারও কথা শুনতে পায় না। মিঠুন জেগে উঠে কান্না শুরু করে। ওর মা ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে দোলাতে থাকেন আর কপালের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে কথা বলেন। বাইরে রোমিও-জুলিয়েট গোলাবর্ষণে তুমুলভাবে ঘেউ ঘেউ করে চলে।

‘সবাই শান্ত হোন,’ সাবির বলে, ‘শান্ত থাকেন, যে যেখানে আছেন সেখানেই থাকেন। সোহেল আর আমি ছাদে যাচ্ছি, দেখে আসি কী হচ্ছে।’

‘আমি বাসায় যাব,’ মিসেস সেনগুপ্ত বলেন।

রেহানা দেখলেন, সাবিরের চেয়ার সশব্দে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো, আর ও সিঁড়ির দিকে ছুটে গেল; শোনা গেল ওর বুটের দুপদাপ আর সোহেলের চপ্পলের চটাস চটাস শব্দ। ‘উপরে যেও না,’ মিসেস চৌধুরী বললেন, কিন্তু ওরা ততক্ষণে চলে গেছে।

জানালা দিয়ে আলোর ঝলক ঢুকে ঘরটাকে উজ্জ্বল করে দিল। পাঁজরের হাড়গোড় আর খুবলে খাওয়া রানসহ আধ খাওয়া লাশের মতো পড়ে আছে মিসেস চৌধুরীর ভেড়ার রোস্ট। টমেটোটা আর নেই, কিন্তু মুখটা এখনো হাঁ করা, খোলা। মিসেস চৌধুরীকে দেখে মনে হলো উনি হয়তো খাবার টেবিলের নিচে ডুব দেবেন, কিন্তু পরিবর্তে তিনি তার চেয়ারের আরও গভীরে তলিয়ে গেলেন, হাত দুটো বুকের কাছে মুঠো করা। ‘আল্লাহ! আল্লাহ!’ তিনি জপছিলেন।

সবার মুখে একই কথা, ‘কী হচ্ছে, কী হচ্ছে।’

পিলখানায় গোলাবর্ষণের আওয়াজ এত কাছে যে তা যেন রেহানার বুকে আঘাত করে। তিনি চিৎকার শুনতে পান। ঘুরে ঘুরে পাক খাওয়া বিলাপের মতো সাইরেনের শব্দ হতে থাকে। আগুনের ফিনকি দিগন্ত আলোকিত করে; দূরে কোথাও বজ্রপাতের মতো গমগম শব্দ বাতাস চিরে প্রতিধ্বনি তোলে; তারপর ধোঁয়া ওঠে, ছোট্ট একটা বিরতি, যেন সবকিছু সাস্প হয়েছে। কিন্তু হয়নি। কয়েক নিমেষ মাত্র, তারপর আবার শুরু হয় পুরোদমে। রেহানার ইচ্ছে করে ছেলেমেয়ে দুটিকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে থাকতে, দু’ হাতে ওদের কানগুলো চেপে ধরে রাখতে। কিন্তু মায়া জানালার গায়ে স্টেটে, আর সোহেল সাবিরের সঙ্গে ছাদে। ওপর থেকে দুই জোড়া পায়ের আওয়াজ রেহানার কানে ভেসে আসে।

মায়া টেলিফোন রিসিভারটা তোলে। ‘ফোন কাজ করছে না,’ সে জানায়। তারপর ট্রানজিস্টারটা হাতে নেয়, কিন্তু সেখানেও একটানা মৃদু যান্ত্রিক গুঞ্জন।

সোহেল আর লেফটেন্যান্ট সাবির মিসেস চৌধুরীর ছাদ থেকে লকলকে আগুনে আলোকিত শহরটা দেখে। অকস্মাৎ তারা সব শুনতে পায়: শিশুদের হত্যা, মেঘেদের ধীর আনাগোনা, নারীদের মৃত্যু, পলায়নপর পাখিদের দীর্ঘশ্বাস, ফুটপাতে রক্তের ধারা।

প্রথমে কথা বলে ওঠে সোহেল। ‘কারফিউ ওঠা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।’

সাবির নিজের সামরিক উর্দীর দিকে তাকায়। দেখে গাঢ় সবুজ ঝুংটা আঁধারে প্রায় অদৃশ্য, কিন্তু সেই কাস্তে, সেই হাসি বুকে জ্বলজ্বল করছে, দেখে লালচে গনগনে আকাশ, মিটিমিটি দিগন্ত।

‘আমি পাকিস্তান আর্মির একজন অফিসার,’ সে বলে অবশেষে।

‘কী করবেন আপনি?’

‘বুঝতে পারছি না,’ মুখ বাঁকানোয় ঠোঁটের ওপরকার কাটা দাগটা ফুটে ওঠে।

‘বাহিনীত্যাগের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড,’ সোহেল বলে।

‘সেটা নিয়ে আমি ভাবি না। আমি কখনো চিন্তা করি নি ঘটনা এতদূর পর্যন্ত গড়াবে।’

সাবির যে বেশি কিছু জানে না সে জন্য সোহেল তাকে ভর্তসনা করে না।

ওরা নিচের পার্টিতে ফিরে আসে। ডাইনিং চেয়ারে মিসেস চৌধুরী তখনো এলিয়ে পড়ছিলেন; মিসেস সেনগুপ্ত মিথুনের বুকের ওপর হাত রেখে তার মাথার কাছে বসেছিলেন। মায়া ট্রানজিস্টার নিয়ে রান্নাঘরে ঢোকে সিগন্যাল পাওয়া যায় কিনা দেখতে। রেহানা ওর সঙ্গে যান; তিনি সিলভির জন্য গ্লাসে কয়েক টুকরো বরফ নেন, সিলভি খুব ঘাবড়ে গেছে, ঘনঘন তেষ্ঠা পাচ্ছে তার।

কারও কিছুই করার ছিল না। ওরা অপেক্ষা করে। মায়া জিদ ধরে রেডিওর সামনে উবু হয়ে বসে থাকে, সাবির বসার ঘরে পায়চারি করে, পর্দা একপাশে টেনে জানালাগুলো একবার খোলে আবার বন্ধ করে। সিলভি সোফার কিনারে বসে হাতের ওপর ভর দিয়ে সামন-পিছু দোল খাচ্ছিল। সেনগুপ্ত বাবু খয়েরি ও সরু চুরুটে আগুন ধরান।

হঠাৎ মিসেস চৌধুরী চেয়ার ছেড়ে এমনভাবে উঠে দাঁড়ান যেন তিনি এই মাত্র কোনো দৈববাণী পেয়েছেন।

‘এখন গুগুগোল শুরু হবে, ভয়ঙ্কর গুগুগোল,’ তিনি সাবিরকে বলেন। তাঁর গলার স্বর শুনে রেহানার মনে হয় মিসেস চৌধুরী এবার একটা ঘোষণা দেবেন। ‘তুমি জানো আমি কি চাই। আমি চাই তুমি আমার মেয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।’

‘আপনার মেয়ের কিছু হবে না।’

‘নিশ্চিত হচ্ছে কীভাবে?’

‘অবশ্যই আমি নিশ্চিত,’ সাবির সিলভির দিকে তাকায়, সিলভি মেঝের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে মাথা নাড়ে।

‘কিন্তু তোমারই যদি কিছু হয়? ওরা যদি সিলভির জন্য আসে?’

‘কারা?’

‘কে বলতে পারে কারা? মানুষ! আমি!’ মিসেস চৌধুরী আবার চেয়ারে ঢলে পড়েন।

‘মা,’ সাবির বলে, ‘সিলভির কিছু হবে না।’

‘নিশ্চিত হওয়ার একটাই উপায় আছে। আজকে রাতেই ওকে তোমার বিয়ে করতে হবে।’

‘বিয়ে?’

‘তুমি বাচ্চা একটা ছেলে, বুঝতে পারছ না, কিন্তু এ রকম ভয়ঙ্কর সময়ের মধ্য দিয়ে আমি গেছি। এখন করণীয় হচ্ছে সমস্ত কুমারী মেয়েরা যাতে নিরাপদে থাকে তার ব্যবস্থা করা। তোমার কি ধারণা এই গেট গুপ্ত-মাস্তানদের আটকে রাখতে পারবে?’ মিসেস চৌধুরীর গলা কেঁপে ওঠে।

রেহানা দেখতে পান তিনি লেফটেন্যান্টের কানে ফিসফিস করে কিছু বলছেন। তিনি সিলভিকে দেখালেন, তার মাথা ঝুলিয়ে দিলেন, আবার তুললেন, আঙুল উঁচু করলেন, তারপর রুমাল বের করে তার চোখ মুছে দিলেন। লেফটেন্যান্ট অন্যমনস্কভাবে মিসেস চৌধুরীর কাঁধে মৃদু চাপ দিলেন।

মাঝরাত নাগাদ কামানের গোলাবর্ষণ কমে আসে, দূরে এখানে-সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে দুয়েকটা বিস্ফোরণের শব্দ হয়। মিসেস চৌধুরী সোহেল ও রেহানাকে সঙ্গে নিয়ে রান্নাঘরে আসেন। ‘সোহেল, তোমাকে আমার দরকার,’ তিনি বলেন। ‘সিলভির এই মুহূর্তে বিয়ে হওয়া জরুরি। তোমাকে সাক্ষী হতে হবে। দু’জন পুরুষ মানুষ থাকতে হয়। সেনগুপ্ত বাবু দ্বিতীয় সাক্ষী হবেন। উনার সাক্ষী হওয়াটা ঠিক হচ্ছে না, কিন্তু কিছু করার নেই। এভাবেই কাজ চালাতে হবে।’

মিসেস চৌধুরীর এরকম উদ্ভট কথায় রেহানার মাথা চক্কর দিয়ে ওঠে। তিনি বলেন, ‘বিয়ে দেওয়ার জন্য এই সময়টা কি ঠিক?’

‘অবশ্যই ঠিক। এর চেয়ে ভালো সময় আর কবে পাব? হয়তো আর কোনো সময়ই মিলবে না। একেবারেই না! কী হবে যদি লেফটেন্যান্ট মাসের পর মাস না ফেরে? যদি মারা যায়?’ তারপর বলেন: ‘কোরআন শরিফ থেকে কয়েকটা আয়াত বাছুন তো রেহানা। এত সুন্দর তেলাওয়াত করেন আপনি।’

মিসেস চৌধুরী সিলভিকে নতুন শাড়ি পরাতে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মায়া বিড়বিড় করে ওঠে, ‘হাস্যকর কাজ-কারবার...সিলভির আরেকটু আক্কেল থাকবে ভেবেছিলাম।’

রেহানা তাকের দিকে হাত বাড়ান, তাঁর জানা ছিল সিলভি কোথায় কোরআন শরিফ রাখেন। ‘সোহেল নামিয়ে দাও তো বেটা।’

‘আমি ওকে আর ভালোবাসি না,’ সোহেল এমনভাবে বলে যেন রেহানা তার কাছে এটা জানতে চেয়েছেন। তারপর সে বলে, ‘যে মুহূর্তে ওই সৈনিকের কথা শুনেছি তখন থেকে আমি আর ওকে ভালোবাসি না।’

রেহানা নীরব কিন্তু মায়া তাকিয়ে থাকে তীক্ষ্ণ চোখে, ঠোঁটের কোনায় সন্দেহ, যেন বাজিয়ে দেখছে।

‘আমি ভায়েলেসে বিশ্বাস করি না।’ সোহেল এমনভাবে ঘোষণা করে যেন যে দুই নারীর সঙ্গে সে কথা বলছে তারা সদ্যপরিচিত। ‘কোনো রকম ভায়েলেসই আমি সমর্থন করতে পারি না। যা হোক, এটা ওর ইচ্ছা। মেয়েদের নিজের ব্যাপারে মতামতের অধিকার দিতেই হবে।’

‘বোকার মতো কথা বলো না,’ মায়া বলে, ‘তুমি জানো ও চাপে পড়ে রাজি হয়েছে। মেয়েটা সত্যিই খুব গোবেচারি।’

‘চুপ করো,’ সোহেল বলে।

মায়া চোখ পাকিয়ে আবার রেডিওতে মন দেয়। ‘তোমরা যাও। এই প্রহসনের মধ্যে আমি নাই।’

রেহানা কোরআন শরিফ খুলে বসেন।

আবারও সিলভি ও সাবির ডবল সোফাটায় বসে। আবারও সিলভি মাথা নিচু করে নিজের কোলের দিকে তাকায়। রেহানা দেখতে পান ওর ঠোঁট কাঁপছে, তাঁর ইচ্ছে করে মেয়েটির কাছে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে যে, লেফটেন্যান্টকে বিয়ে করতে সে সত্যিই রাজি কিনা। তার কাছে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই সিলভি তার ধীরস্থির স্বভাবকে মুহূর্তের জন্য ভুলে গিয়ে দাঁত বের করে চকিতে হাসে। হাসিটা তার মায়ের জন্য, রেহানা জানেন, কিন্তু ঘরজুড়ে ঘনিয়ে ওঠা সন্দেহটা দূর করতে হাসিটা কাজে লাগে।

‘সোহেল,’ প্রয়োজনের চেয়ে জোরে সিলভি বলল, ‘ছবি তুলছ না কেন?’

‘তোমার ক্যামেরা আছে?’ সোহেল জিজ্ঞেস করল।

‘তোমারটা এখনো আমার কাছে,’ সোফার পাশের ড্রয়ার খুলে সিলভি উত্তর দিল; ‘তুমি আমাকে ধার দিয়েছিল, মনে আছে, ওই যখন আমি রোমিও আর জুলিয়েটের ছবি তুলতে চেয়েছিলাম।’

‘অবশ্যই,’ ইয়াশিকা খাপ থেকে বের করে তার মুখটা লেন্সের পেছনে নিয়ে বলে সোহেল।

সোহেল সোফায় বসা যুগলের ওপর ক্যামেরা স্থির করে।

‘হাসো!’ ফ্লাশ জ্বলে ওঠে।

রেহানা যেই মাত্র কোরআন শরিফ খুলতে যাবেন, তখনি আলো নিভে যায়। বিবাহ-সংক্রান্ত আয়াতগুলো তাঁকে স্মৃতি থেকে পড়তে হয়: আমি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের থেকেই দম্পতি সৃষ্টি করেছি, যাতে তাদের নিকটে তোমরা প্রশান্তি লাভ করতে পার। আমি তোমাদের হৃদয়ে প্রেম ও করুণা প্রদান করেছি।

সিলভি ও সাবির আংটি বদল করে। মিসেস চৌধুরী বললেন, ‘একটা কবিতা হোক সোহেল!’

‘না খালামণি, সত্যি, এখন পারব না।’

‘কী বলো, পুরোনো বন্ধুর জন্যও পারবে না?’

‘এর চেয়ে গান হয়তো বেশি ভালো লাগবে,’ সোহেলকে বাঁচাতে চেষ্টা করেন রেহানা।

‘মায়াকে বলেন না একটা গজল গাইতে?’

কিন্তু মায়া ওদের দিকে পিঠ দিয়ে বসে থাকে, ভান করে যেন কিছুই শুনতে পাচ্ছে না।

ঘোমটার নিচে সিলভির কাঁধ ভীষণ কাঁপে ।

‘লক্ষ্মী মেয়ে, ভয় পেয়ো না,’ মিসেস সেনগুপ্ত সান্ত্বনা দিয়ে বলেন । বিয়ের অন্য সব কনের চেয়ে সিলভিকে বেশি বা কম মনমরা দেখায় না ।

‘আমরা সবাই এখন একটা পরিবার । কবিতা হবে না তা-ই কি হয়,’ মিসেস চৌধুরী নাছোড়বান্দা ।

বর-কনের মুখোমুখি হয় সোহেল, তারপর চোখ বন্ধ করে আবৃত্তি শুরু করে:

তুমি যখন গাইতে আদেশ করো মনে হয় যেন আমার হৃদয়

গর্বে ভেঙে হবে খানখান

তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার অশ্রুর নোনা স্বাদ টের পাই

ভালোবাসা আমার পাখা মেলে, সাগর পেরিয়ে উড়ে আসা

কোনো এক তৃপ্ত পাখির মতো ।

শুধু এতেই আছে, আমার এই স্বর এই কণ্ঠে, তোমার কাছে যা সাক্ষী হয়ে আছে ।

আনন্দ-উচ্ছ্বাসে মত্ত, পৃথিবী ছাড়িয়ে, এমন সঙ্গীতে, আমি নিজেকে বিস্মৃত হই

আর বন্ধু বলে ডাকি আসলে যে আমার ঈশ্বর ।

আমাকে তুমি অশেষ করেছ; এমনই তোমার লীলা ।

এবং ব্যাপারটা তাই ছিল । মিসেস চৌধুরীর ড্রয়িং রুমে আটকা পড়ে তাঁরা মেশিনগানের গর্জন শুনতে থাকেন । রাত কাটে একটা দুঃস্বপ্নের মতো, কোনো নড়াচড়া নয়, নিজেদের মধ্যে টুঁ-শব্দটিও নয় ।

ভোরের দিকে গোলাগুলির শব্দ থেমে যায় । পূব আকাশে গোলাপি-কমলা অস্বচ্ছ রেখা মিলিয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে সূর্য ওঠে । গাছে-গাছে আর ঘরবাড়ির ছাদে ধুলো জমতে শুরু করে । তারা ঘরে ফেরার সিদ্ধান্ত নেয় । মিসেস চৌধুরী হাতের ওপর খুতনি রেখে চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন । ওরা আলগোছে সদর দরজা খুলে বেরিয়ে দেখতে পায়, ঘুমন্ত রোমিওকে ঘিরে ঘুরপাক খাচ্ছে জুলিয়েট । রোমিওর মাথা বেঁকে আছে, ঘুরতে থাকা জুলিয়েটের কান শায়িত রোমিওর মুখ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় । ভেজা ও ফোলা ফোলা নাকে জুলিয়েট মৃদু ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করে । রোমিও নড়ে না । সোহেল কুকুরটার পেটের ওপর হাত রাখেন ‘মারা গেছে,’ সে বলে, ‘নিশ্চয়ই হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল ।’

বাড়ি ফিরে রেহানা ছেলেমেয়ে দুটিকে একটু ঘুমিয়ে নিতে বলেন, কিন্তু বসার ঘর থেকে কেউ নড়ে না । দুপুরের দিকে বাংলার সামনে একটা ট্রাক এসে থামে, ইঞ্জিনের গৌঁ গৌঁ আওয়াজ শোনা যায় । নিস্তব্ধ রাস্তায় প্রতিটা শব্দ অনেক বড় হয়ে কানে বাজে । মেগাফোন থেকে তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে আসে ।

‘বাঙালিরা, বাড়ির ওপর থেকে পতাকা নামাও। পতাকা নামাও। পতাকা নামাও। পতাকা তোলা বেআইনি। তোমাদের শ্রেফতার করা হবে। পতাকা নামাও।’ কণ্ঠস্বর পাতলা আর আনুনাসিক। তারপর, যেন আর কিছু ভেবে যোগ করে : ‘পতাকা নামা, বেইমান হারামজাদা।’

‘মায়া— পতাকা!’

মায়া খালি পায়ে এক দৌড়ে ছাদে গেল।

কয়েক মিনিট পর দেখা গেল পতাকা কাঁধে জড়িয়ে নিয়ে মেঝেতে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে সে। ছাদের দিকে আঙুল উঁচিয়ে মশাদের সংখ্যা গুনল। মিসেস চৌধুরীর গাড়ি বারান্দা থেকে জুলিয়েটের উদ্ভাস্ত ডাক শোনা গেল।

ওরা বসে রইল কিছু-একটা ঘটার অপেক্ষায়। সোহেল বারান্দায়, বাগানে, ছাদে ক্রমাগত পায়চারি করতে থাকে। মায়া পতাকা জড়িয়ে ঘুমিয়ে গেছে। রেহানা ফ্রিজ পরখ করে দেখেন আর ভাবেন, এই খাবারে কত দিন চলবে। ক’টি মুরগি আছে গুনে দেখলেন। চাল কতটুকু আছে দেখলেন। তিন দিন যাবে, মনে মনে বলেন। আমি তিন দিন চালাতে পারব। ফিরে গিয়ে আবার সবকিছু দেখলেন। পেঁয়াজ, মিষ্টি কুমড়া, লাউ জড়ো করলেন। পাঁচ দিন।

ট্রাকটা আবার ফিরে আসে। ‘আগামীকাল দুপুর দুই ঘটিকায় চার ঘণ্টার জন্য কারফিউ তুলিয়া নেওয়া হইবে। সন্ধ্যা ছয়টা হইতে পুনরায় কারফিউ বলবৎ হইবে। সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার মধ্যে নিজ নিজ বাড়িঘরে সবাইকে ফিরিয়া যাইতে বলা হইতেছে। সাবধান, কারফিউ চলাকালে কেহ ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিলে সৈন্যরা দেখা মাত্র গুলি করিবে। পুনরায় বলা হইতেছে, দেখামাত্র গুলি করিবে। কারফিউ দুপুর দুই ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ছয় ঘটিকা পর্যন্ত মূলতবি থাকিবে।’

ট্রাকটি ৫ নম্বর রোড থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় জুলিয়েট ঘেউ কেউ করে ওঠে।

পরদিন কারফিউ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সোহেল আর মায়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেল। রেহানা জানালা থেকে দেখতে পেলেন লেফটেন্যান্ট সেক্সির ও সিলভি গেট দিয়ে বের হয়ে পরস্পরকে অল্প কথায় বিদায় জানাল। রেহানা বাংলাতেই থাকলেন। তিনি ভাবছিলেন কয় ঘণ্টা কেটেছে তাঁর মা ঘুমিয়ে, তাঁর ক্লান্ত লাগা উচিত কিনা। ঠিক সেই মুহূর্তে কে যেন সবচেয়ে দরজা দিয়ে ঢুকল। সুপ্রিয়া।

‘ওদেরকে ফিরিয়ে দিতে পারলাম না।’

‘কাদেরকে?’

‘আপনি দেখেননি? বারান্দায় গিয়ে দেখুন।’

রেহানা সীমানা প্রাচীরের ওপর দিয়ে সোনার বাগানে উঁকি দিলেন। কিছু যেন

নড়ছে, ঘামে শব্দ উঠছে। ‘কী দেখব?’

‘মানুষ...উদ্বাস্তু, রেহানা।’

‘কতজন?’

‘বিশ-তিরিশ, আমি ঠিক জানি না। সব ওরা আসতে শুরু করেছে। ওরা কি ওখানে থাকতে পারবে?’

‘অবশ্যই। অবশ্যই থাকতে পারে।’

‘আমরা কাউকেই চিনি না। কিন্তু এই রাস্তায় আমরাই একমাত্র হিন্দু পরিবার।’

‘ওদের সঙ্গে কি বাচ্চাকাচ্চা আছে?’

‘কয়েকজন। বেশির ভাগই পরিবারের লোক, কিছু রাস্তার মানুষ। ওরা খুব একটা কথাবার্তা বলছে না।’

‘আমি কিছু খাবার নিয়ে আসছি।’

রেহানা ফ্রিজ থেকে মুরগিগুলো বের করলেন। টমেটো দিয়ে ঝাল করে রাঁধলেন দুটো, তৃতীয়টা দিয়ে শিশুদের জন্য কোরমা করলেন। কোনো দই ছিল না, দুধ দিয়েই করলেন। বাঁধাকপি আর আলু দিয়ে একটা ভাজি, পেঁয়াজ দিয়ে টেঁড়স ভাজি, মিষ্টি কুমড়া আর শাক মিলিয়ে ঝোল করে রাঁধলেন। সব খাবার রন্ধে ফেলায় মুহূর্তের জন্য একটু চিন্তিত হলেন, কিন্তু খুব দ্রুত চিন্তাটা ঝেড়ে ফেললেন। কে জানে এই মানুষগুলোর কী দশা হয়েছে, কী কারণে, কেন ওরা এই পর্যন্ত এসেছে।

রান্না শেষ করে খাবারের ট্রে নিয়ে রেহানা সোনায় গেলেন, মলিন কমলগুলোর মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে। সেখানে শিশুরা ছিল, আর মহিলারা, চেহারা বয়সের ছাপ-আঁকা বৃদ্ধরা, যারা তার দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতায় হাসতে চেষ্টা করল। কিন্তু কেউ কথা বলল না, এমনকি নিজেদের মধ্যেও না। নিঃশব্দে বসে রইল, নিজেদের টিলেঢালা পোঁটলাগুলো নেড়েচেড়ে দেখল, মনে মনে হিসাব করল কতটুকু তারা বাঁচাতে পেরেছে।

ওদের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ করেই তাঁর আরো জানার তাড়না বোধ হয়। তাঁর মনে হলো, সেই রাত্রির কঠিন সত্য তিনি সব বুঝতে শুরু করেছেন, গোলাগুলির প্রচণ্ডতা, মিসেস চৌধুরীর কাতরতা সবকিছু। তাঁর জানার ইচ্ছে হলো এই মানুষগুলো কীভাবে রাতটা পার করেছে, এখানে কীভাবে এসেছে। একটা অস্থিরতা তাকে গ্রাস করল, দেখতেই হবে...রাইরে যাই ঘটে থাকুক না কেন, সেটা তাকে তলিয়ে দেখতেই হবে, কোন গভীর বেদনা তাদের বাধ্য করেছে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে তার দোরগোড়ায় এসে আশ্রয় চাইতে।

*

‘বিশ্ববিদ্যালয়,’ তিনি বললেন।

‘ওই দিকে না যাওয়াই ভালো আপা,’ রিকশাওয়ালা বলল।

‘বিশ্ববিদ্যালয়,’ তিনি আবার বললেন, রিকশায় উঠে হুডটা মাথার ওপর টেনে দিলেন।

রিকশাওয়ালা ঘাড় নেড়ে রওনা হলো, ঘুরে মিরপুর রোডের দিকে চলল। রাস্তায় লোকজন খুব কম। যে অল্প ক’টা গাড়ি রাস্তায় চলছিল তাদের ইঞ্জিন শোভনভাবে মৃদু আওয়াজ করছিল। কেউ হর্ন বাজায় নি। আর রিকশা যখন নীলক্ষেতের দিকে মোড় নিল, হাতের ইশারায় তারা পাশ কাটিয়ে যেতে দিল।

সবকিছু প্রায় আগের মতোই আছে, রেহানা ভাবলেন। নিউ মার্কেটের গেট বন্ধ, ঢোকার মুখে সার বাঁধা ছোট ছোট দোকানগুলোর পাল্লা তোলা, যে দোকানিরা কাঁঠাল আর আমড়া বিক্রি করত, তাদের কেউ আশপাশে নেই। তবুও, এখন শুক্রবার দুপুরও হতে পারত, যখন জুমার নামাজের জন্য সবকিছু বন্ধ হয়ে যায়, অথবা কোনো হরতালের দিন। কিছুদিন ধরে কত যে হরতাল গেল।

রিকশাওয়ালা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ঢোকার আগে চক্করটা পার হলো, আর এখান থেকে পরিবেশ বদলে যেতে শুরু করল: মাটি কামড়ে থাকা নিচু কুয়াশা ফুটপাত ছেয়ে রেখেছিল, না, কুয়াশা নয়, ধোঁয়া, রাস্তার বুক চিরে হিসহিস করে চলেছে, ধোঁয়াটে টক স্বাদ জিভে লেপ্টে গেল। রিকশাওয়ালা যখন হলগুলোর কাছাকাছি রেহানাকে নিয়ে গেল, ধোঁয়াচ্ছন্ন বাতাস আরও ভারি হলো; রিকশাওয়ালা একটু থেমে মাথা থেকে গামছা খুলে মুখের ওপর বেঁধে নিল। ইশারায় রেহানাকে তার শাড়ি দিয়ে একই কাজ করতে বলল। রেহানা এক হাতে শাড়ির আঁচল নাকে চেপে ধরলেন আর অন্য হাত দিয়ে রিকশার ফ্রেম আঁকড়ে রইলেন, কারণ রাস্তাটা এখানে টালমাটাল, ইতস্তত পড়ে আছে আবর্জনার টুকরো। নিচে তাকিয়ে তিনি বুঝি নামাজের টুপি আর একটা অক্ষত চশমা পড়ে থাকতে দেখলেন। কেউ দৌড়ে পাল্লানোর সময় হয়তো তা ছিটকে পড়েছে। তাঁর ইচ্ছে হলো চশমাটা রাস্তা থেকে তুলে হাত উঁচিয়ে আশপাশে দেখান, যদি কেউ তা নিতে আসে, কিন্তু রিকশা ততক্ষণে জায়গাটা পার হয়ে গেল। এখন রাস্তাজুড়ে লম্বা একটা লাল ফিতা পড়ে আছে। রেহানা সামনে ঝুঁকে দেখলেন, ঠিক ঝুঁকতে পারলেন না, ফিতাটি ভেজা, চকচক করছে।

ওরা যত সামনে এগিয়ে গেল রাস্তায় ইটের টুকরো তত ঘন হতে লাগল; মানুষের বেড়ে-ওঠা ভিড়ে রেহানা সচেতন হলেন, এই অসমান রাস্তা আর চারপাশের মানুষ ঠেলে এগোতে গিয়ে রিকশাওয়ালার ঘাম ছুটে গেল।

গোটা রাস্তায় ইট আর পলস্তারা জমে আছে, ধুলোর আন্তর পথের রং ছাই-সাদায় পাল্টে ফেলেছে।

ওরা কার্জন হলের সামনে এলো। সেই ভেজা ফিতা পুরোটা পথ ওদের পিছু পিছু এসেছে, এখানে এসে সেটা গিয়ে পড়েছে একটা ড্রেনে, ড্রেনটাও লাল, পাশে এক জোড়া হাত, আঙুলগুলো মোনাজাত অথবা ভিক্ষার ভঙ্গিতে তুলে ধরা, আর হাত দুটোর পাশে একটা মুখ। মুখটা ছোট্ট, কেবল একটা হালকা গোলাপি আভা চুপসে আছে জখমের সাক্ষী হয়ে।

ছোট্ট একটা মেয়ে। চুলগুলো ওর মুখের অর্ধেকটা ঢেকে আছে। চুলের জটার নিচে রেহানা একটা খেঁতলানো বন্ধ চোখ দেখতে পেলেন।

রেহানা নিজেকে সেখান থেকে দ্রুত সরিয়ে নিলেন। মাত্র মিনিটখানেকের জন্য তাকিয়ে ছিলেন, কিন্তু তা-ই অনেক দীর্ঘ সময় মনে হলো, এত কাছে ঠাহর হলো যে তিনি যেন মেয়েটির নাকের ফুটো আর ছোট্ট দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে যাওয়া শেষ নিশ্বাসের গন্ধ পেলেন।

‘চলো,’ রিকশাওয়ালাকে বললেন। তারপর আর কিছুই তিনি দেখলেন না। পরে তিনি বলবেন তিনি সব দেখেছেন : ফুটপাথের ওপর লাশগুলো টিবির মতো উঁচু হয়ে ছিল, যেন দোকানের জানালায় সাজিয়ে রাখা কেক; প্যাডেলে পা রেখে রিকশাওয়ালারা সেখানেই ঢলে পড়েছিল; হলগুলোর দেয়ালে বিশাল সব ফুটো—রোকেয়া হল, জগন্নাথ হল আর মুহসীন হল। ওরা যখন ইতস্তত ঘুরছিলেন, রেহানা চোখ দুটো শক্তভাবে বন্ধ করে ছিলেন, ধ্বংস হয়ে যাওয়া শহর যেন তিনি আর দেখতে চাননি।

সোহেল আর মায়া যখন ফিরে এলো, ওরা স্তব্ধ হয়ে রইল, ওদের চেহারা ছাইবর্ণ। গত রাতের ভয়াবহতা সবার কাছে উন্মোচিত হলো ধীরে ধীরে। প্রথম, মুজিবকে গ্রেফতার করা হয় এবং বিমানযোগে পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে যাওয়া হয়। সেনারা তাদের বর্বর হামলা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় শুরু করে, গোলাবর্ষণ করে হল, ক্যান্টিন, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে। পুরান ঢাকার দিকে যাওয়ার পথে ট্যাংকের বহর ফুলবাড়িয়া রেললাইনের দু’পাশের বস্তিগুলো ধূলিসাৎ করে এগোয়, শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাওয়ার জন্য সেই রেললাইন তাদের দরকার, তাই কার্ডবোর্ড সন্ধি পাতলা টিনের খুপরিগুলো ঝাঁঝরা করে দেয় তাদের গুলি, সিনেমার পোস্টার সাঁটা সেই নড়বড়ে চালাগুলো চাকার নিচে পিষ্ট হয়। তারপর তারা জিপের বহর নিয়ে হিন্দুপাড়ায় হানা দেয়, কারণ তাদের ট্যাংকগুলো সরু গলিতে প্রবেশে অক্ষম, আর জিপ বোঝাই সেনারা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে যায় খিড়কি ও দরজা ভেদ করে, শাট

চিহ্নে, বুক ঝাঁঝরা করে দিয়ে।

সন্ধ্যার সময় রেহানা ও তাঁর দুই ছেলেমেয়ে রেডিওতে একটা ঘোষণা শুনলেন :

আই, মেজর জিয়া, প্রভিসিয়াল কমান্ডার ইন চিফ অব দ্য বাংলাদেশ লিবারেশন আর্মি, হিয়ারবাই প্রক্লেইম, অন বিহাফ অব আউয়ার গ্রেট ন্যাশনাল লিডার শেখ মুজিবুর রহমান, দ্য ইনডিপেনডেন্স অব বাংলাদেশ। আই অলসো ডিক্লেয়ার উই হ্যাভ অলরেডি ফর্মড এ সোভেরেইন, লিগাল গভর্নমেন্ট আন্ডার শেখ মুজিবুর রহমান। আই অ্যাপিল টু অল নেশনস টু মোবাইলাইজ পাবলিক অপিনিয়ন ইন দেয়ার রেসপেকটিভ কান্ট্রিজ এগেইনস্ট দ্য ব্রুটাল জেনোসাইড ইন বাংলাদেশ।

এটাই তাহলে ঘটনা, যুদ্ধ তাদের দুয়ারে এসে দাঁড়াল। যা কিছু ঘটার ছিল এরই মধ্যে ঘটে গেছে; এখন কেবল সেসবের ছায়ার নিচে বাস করা। রেহানা দু'হাত দিয়ে নিজেকে জড়িয়ে ধরেন, নিজের ভেতরে সেই পুরনো শক্তি জাগিয়ে তোলার ইচ্ছায় নিজেকে আরো জোরে আঁকড়ে ধরেন।

এপ্রিল



স্বাধীন বাংলা বেতার



শহরটা ধীরে ধীরে অবরুদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। অভ্যস্ত হয়ে ওঠে রাস্তায় রাস্তায় সেনাদের টহলে, যাদের শিরদাড়া খাঁড়া, পরনের উর্দিতে কড়া মাড়, আর সর্বদা মলিন মুখমণ্ডল খিঁচিয়ে আছে। অভ্যস্ত হয়ে ওঠে রাস্তার মাঝখানে থাকা মেরে বসে থাকা ট্যাংক আর চেকপয়েন্টে, যেখানে পাকসেনারা গাড়ির জানালার কাছে মুখ এনে চিৎকার করে হুকুম দেয় আর চালকেরা হাত দুটো ওপরে তুলে মাথা ঝাঁকায়, প্রাণপণে চেষ্টা করে নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করতে। আর অভ্যস্ত হয়ে ওঠে স্তব্ধতায়, কারণ আর নেই কোনো ভাষণ, প্রতিবাদ, মিছিল, শহরজুড়ে শুধু এক থমথমে অস্বস্তিকর নীরবতা, যা দিনে দু'বার বিঘ্নিত হয় কারফিউ সাইরেনের তীক্ষ্ণ বিলাপে; কিন্তু এছাড়া সব নিশ্চুপ, সুনসান; শুধু রয়েছে পাতার মর্মর ধ্বনি আর এপ্রিলের গন্ধে সূর্য, যা দিন আর রাতের মধ্যে সীমারেখা টানে।

এই নিস্তব্ধতায় নানান গুজব ছড়িয়ে পড়ে। পাকসেনারা লাশ গায়েব করার জন্য গণকবর খুঁড়ছে। শহরের উপকণ্ঠে কোথায় একটা গুদামঘর আছে, সেখানে তারা বন্দিদের নির্যাতন করে। মিরপুর চিড়িয়াখানার জীবজন্তুরা, এমনকি বাঘও, ভয়ে-আতঙ্কে মারা যাচ্ছে। কিন্তু কেউ নিশ্চিত করে কিছু জানে বলে মনে হয় না। খবরের কাগজগুলো ঘোষণা করে, 'ইয়াহিয়া পাকিস্তান রক্ষা করেছেন!' আর ঢাকা

এত দিন ধরে বিরামহীন সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দুতে থেকেও এখন অধিকৃত ফাঁকা শহর, যে শহর তার সব অভিজ্ঞতা গোপন করে আছে।

যেসব মানুষ কখনো এই শহরের স্থায়ী অধিবাসী ছিল না, তারা শহরের বুক থেকে সব চিহ্ন মুছে নিয়ে ফিরে গেছে নিজ নিজ গ্রামে। কসাই, দর্জি, গোয়ালা, রিকশাওয়ালা, রিকশার পেছনে সিনেমার নায়িকাদের ছবি আঁকত যেসব ছেলে, আর তাদের চেয়েও ছোট ছেলেরা, যারা ফুটপাথের পাশে মুদির দোকানে জংধরা কেতলিতে চা বানাত, সবাই নিঃশব্দে চলে গেছে। কাপড়ের পোঁটলা কাঁধে, বাচ্চাদের পিঠে ঝুলিয়ে সাপের মতো ঐক্যবৈক্যে শহর ছেড়ে চলে গেছে মানুষ।

শহরটার খালি হয়ে যাওয়া দেখতে দেখতে রেহানার নিজেকে ভাগ্যবতী বলে মনে হয়।

ছেলেমেয়ে দুটি ভালো আছে।

ভালো আছেন মিসেস চৌধুরী আর সিলভিও।

জিন-রামি খেলার মহিলারা। মিসেস আকরাম সেই রাতটা পার করেছেন দরজা-জানালা বন্ধ করে, হাত দুটো কানের ওপর চেপে ধরে। ওঁর স্বামী পরে বলবেন, তিনি উন্মাদের মতো হয়ে গেছিলেন, কেয়ামত কেয়ামত বলে চিৎকার করেছিলেন; ওঁরা বাধ্য হয়ে খাটের পায়ার সঙ্গে তাঁকে বেঁধে রেখেছিলেন, হাত দিয়ে চেপে ধরে ছিলেন তাঁর মুখ। তাঁর অবশ্য কিছুই মনে নেই। কারফিউ উঠে যাওয়ার দু'দিন পরে তিনি যখন রেহানাকে দেখতে আসেন, তখন হাতে কেটে বসা দড়ির দাগ লুকাতে কাচ বসানো মোটা মোটা চুড়ি পরে এসেছিলেন। তিনি বেঁচে আছেন।

রোমিও মারা গেছে। মিসেস চৌধুরী বাগানের সবচেয়ে উঁচু নারকেল গাছটার নিচে তাকে কবর দিয়েছেন।

মিসেস রহমানের প্রাণ প্রায় যেতে বসেছিল। বাল্যের এক স্কুলবান্ধবীর বাড়িতে রাতের দাওয়াত গ্রহণ করেছিলেন তিনি। পুরান ঢাকার নবাবপুর রোডে বান্ধবীর স্বামীর একটা দর্জির দোকান ছিল, ওপরতলায় ওরা থাকত। ওখানে যেতে হলে সরু রাস্তাগুলো পেরোতে হবে এই ভয়ে, পুরোনো মলিন আসবাব আর হাড়িসার তরকারি, যা আগেরবার তাকে গিলতে হয়েছিল, তা মনে করে মিসেস রহমান শেষ মুহূর্তে মাথাব্যথার অজুহাত দেখিয়ে যাওয়া বাতিল করেন। কিঞ্চিৎ অপরাধ বোধ হলেও নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দেন যে পরদিন কিছু একটা উপহার পাঠিয়ে দেবেন। শাড়ি বা এক জোড়া কানের দুল, যা হোক একটা-কিছু।

পাকসেনারা যখন পুরান টাউনের মধ্য দিয়ে হিন্দু এলাকা শাঁখারীপট্টির দিকে যাচ্ছে, সেই যাওয়ার পথে নবাবপুর রোড পড়ল। হয়তো তারা ঘুরপথে গেছে;

হয়তো ম্যাপটা উল্টো করে ধরেছে, অথবা ওখানে পৌঁছাতে ধারণার চেয়ে বেশি সময় লেগেছে...তাই স্বভাবতই ধৈর্য হারিয়ে ফেলে ওরা, আর ত্বকের নিচে তাদের উষ্ণ রক্ত টগবগ করে ফোটে। পথ, দোকান, কুকুর, ঘরবাড়ি সবকিছুর ওপর দিয়ে ওরা মেশিনগান ট্যাট্যাট্যা করে ঘুরিয়ে আনে, সামনে-পেছনে, ডানে-বাঁয়ে, আর ছুটন্ত বুলেটগুলোর একটি নবাবপুর রোডের বাসাটাকে পেয়ে যায়। মিসেস রহমানের স্কুলবান্ধবীর গাল ঘেঁষে বেরিয়ে যায় গুলি, তিনি পাশ কাটিয়ে দেন ঠিকই কিন্তু তাঁর স্বামী, যিনি খাবার টেবিলের নিচে উবু হয়ে বসে ছিলেন, তিনি পারেন না।

রেহানার সন্তানেরা ভালো আছে এটাই সবচেয়ে জরুরি বিষয়। সেই রাতে সিলভির বাগদান অনুষ্ঠানের জন্য রেহানা মিসেস চৌধুরীর প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ না করে পারেন না। ছেলেমেয়ে দুটো হাজার হোক সঙ্গে ছিল, বাসার কাছে ছিল। ওরা তো খুব সহজেই সেদিন কোনো একটা হলে থাকতে পারত।

সোহেল আর মায়া তাদের বন্ধুবান্ধবদের খোঁজ করে। অন্য ছাত্রদের মতো জয় আর আরেফও এই গুপ্তন শুনেছিল যে শহরে হামলা হতে পারে। হলের ক্যাফেটেরিয়ায় ঢুকে ওরা সব চেয়ার তুলে নেয়, নীলক্ষেতে ঢোকার রাস্তায় জড়ো করে রাখে সেগুলো। কাচের বোতলে আগুন ধরিয়ে রাস্তায় ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে। কিন্তু ট্যাংকগুলো যখন ব্যারিকেড মাড়িয়ে চেয়ারগুলো গুঁড়িয়ে এগিয়ে চলে, তখন তারা দুদাড় পালায়; ঘরবাড়ি-দালানকোঠার ফাঁক-ফোকর দিয়ে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে কার্জন হলে। সৈন্যদের বুলেট তাদের নাগাল পায় না।

কিন্তু শারমিন। শারমিনকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রথম দিকে মায়া কিছুটা তিত্তিবিরক্ত ছিল এ কথা ভেবে যে সে এই সমস্ত কিছু থেকে বাদ পড়েছে। সেই রাত নিয়ে তার সব বন্ধুবান্ধবের বুলিতে কত রকমের গল্প জমেছে, আর সে যখন শুধু ‘ভাগিস আমি ক্যাম্পাসে ছিলাম না,’ ছাড়া আর কিছুই বলতে পারে না, তখন মনে রয়ে যায় সামান্য আক্ষেপ। কিছু চিহ্ন, কিছু দাগ সে চাইছিল,...মানে তারও কিছু হয়েছে, এই আর কি। অন্ততপক্ষে গালে একটা জখমের দাগ। ব্লাউজের ছেঁড়া অংশ

মায়া শারমিনের অপেক্ষায় থাকে, কখন মেয়েটি গেটের কাছে এসে উদয় হবে আর তাকে অভিজ্ঞতার কিছু অংশ দান করবে।

কিন্তু তৃতীয় দিনেও শারমিনের কোনো দেখা মিলল না।

‘সব ঠিক আছে,’ রেহানা বলার মতো কিছু না পেয়ে মেয়েকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করেন। ‘এর নিশ্চয়ই কোনো ব্যাখ্যা আছে।’ তিনি শারমিনকে যতটুকু জানেন, তাতে ওকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। মেয়েটি এত বড়সড় আর এমন চটপটে যে সে স্রেফ গায়েব হয়ে যেতে পারে না। মায়াও নিশ্চয়ই তাই মনে

করে, কারণ সে শারমিনকে নিয়ে উদ্বেগে ভুগতে চায়নি।

চতুর্থ দিনে সেনগুপ্তরা চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। রেহানা সোনায়ে গিয়ে দেখলেন বসার ঘরের মেঝেতে সুপ্রিয়ার গোলাপি কার্পেটের ওপর লগুভগু হয়ে পড়ে আছে তাদের সব জিনিসপত্র।

‘আমাদের যেতে হবে,’ সুপ্রিয়া শুরু করেন। বোঝা যায়, তিনিই তাঁর স্বামীকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে যেতে রাজি করিয়েছেন; তাকে বেশ নার্ভাস দেখায়, তিনি আঁচল কাঁধের ওপর তুলে শাড়ির ভাঁজ সোজা করে নেন।

রেহানা কিছু বলেন না, শুধু মাথা নাড়েন।

‘শহরটা হিন্দুদের জন্য নিরাপদ নয়,’ সেনগুপ্ত বাবু কৈফিয়ত দেন। ‘আপনি তো সবই জানেন।’ রিফিউজিরা দু’দিন ছিল, উঠোনে তাদের থাকার চিহ্ন পড়ে আছে। রাতভর পাহাড়ায় ছিল হারিকেনের মিটিমিটি আলোর সঙ্গে আনা চৌকাঠের কাঠ হাতে নিয়ে। তারপর সেনগুপ্ত বাবুদেরও চলে যেতে হয়, হয়তো প্রত্যন্ত গ্রামে, অথবা সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে। সহৃদয়তার জন্য তাঁরা রেহানাকে ধন্যবাদ জানান, জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পেছন থেকে দরজা লাগিয়ে দিয়ে চলে যান।

‘আপনারা কি ভারতে যাচ্ছেন?’ রেহানা জানতে চান।

সেনগুপ্ত বাবু বিস্ময়ের ভাব করেন। ‘কেন? না, আমরা ভারতে যাব কেন? পাবনায় গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছি, অনেক দিন সেখানে যাওয়া হয়নি। মিঠুনেরও দাদাবাড়ি দেখা উচিত, খুড়তুতো ভাই-বোনদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া উচিত।’ সেনগুপ্ত বাবু নেটের পর্দা সরিয়ে দেখেন বাগানে তাঁর ছেলে একটা কাকের পিছু পিছু ছুটছে।

‘তা তো ঠিকই,’ রেহানা বলেন। ‘কী করা উচিত আপনিই তো ভালো জানবেন। কিন্তু অনেক খারাপ খবর পাওয়া যাচ্ছে। এই ধরেন, ওরা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছে। হিন্দুদের খুঁজে খুঁজে হত্যা করছে।’

‘এগুলো সব গুজব। শহরগুলো বিপজ্জনক, কিন্তু গ্রামে ওরা অত ভেতরের দিকে যায় না,’ বললেন তিনি। ‘আমাদের ওখান থেকে শহরে পৌঁছাতেই দু’দিন লাগে...কাদামাটির পথ, কোথাও পাকা রাস্তা নেই। অতঃপর আমেলার দরকার কী ওদের?’ মুখ দিয়ে স্নিগ্ধ হাসি আর নাক টানার কাছাকাছি একটা শব্দ বের হলো।

‘গ্রামের মানুষদের আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন তো?’ রেহানা বলেন। আরও একটু বাজিয়ে দেখেন তাঁকে।

‘আমার গ্রামের মানুষ? অবশ্যই! কয়েক পুরুষ ধরে আমাদের পরিবার ওই গ্রামে থাকে। মিসেস হক, আপনার কি ধারণা সব হিন্দু ভারতে পালিয়ে যাচ্ছে।’

রেহানা দেখতে পান তাঁর প্রশ্নে সেনগুপ্ত বাবু বিব্রত হয়েছেন। ওঁর বলার ভঙ্গিতে

স্পষ্টতই একটা চ্যালেঞ্জ, তিনি তলিয়ে দেখতে চান রেহানার অবস্থান কোন দিকে। সেনগুপ্ত বাবু একবার এক পায়ে ওপর আরেক পা তুলে বসেন, আবার নামিয়ে নেন। মিসেস সেনগুপ্ত বিব্রতভাবে শাড়ির আঁচল আঙুলে পেঁচাতে থাকেন। ওঁর দিকে তাকিয়ে রেহানার নিজের কম বয়সের কথা মনে পড়ে, যখন তিনি আরো আত্মবিশ্বাসী ছিলেন, যখন তাঁর হয়ে অন্য কাউকে সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ দিতে নিজেকে গুটিয়ে নিতে পারতেন; অবলীলায় তর্কের সমাপ্তি টানতে পারতেন।

মিসেস সেনগুপ্ত ঝুঁকে পড়ে রেহানার একটি হাত নিজের হাতে তুলে নেন। ‘আপনাকে একা রেখে চলে যেতে খুব খারাপ লাগছে। সবকিছু সামলে নিতে পারবেন তো?’

‘অবশ্যই পারব,’ রেহানা বলেন। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মনে হয়, সেনগুপ্ত বাবুরা ফিরে না আসা পর্যন্ত তিনি বাড়ি ভাড়ার কোনো টাকা পাবেন না। যেভাবে সুপ্রিয়া তাঁর দিকে তাকান তাতেই রেহানা বুঝে ফেলেন যে ঠিক এই কারণেই তিনি দুঃখ প্রকাশ করছেন। সুপ্রিয়া একটা খাম বের করে রেহানার হাতের মুঠোর মধ্যে ধরিয়ে দেন। ‘না, না সুপ্রিয়া, এটা করবেন না।’

‘এটুকু করতে না পারলে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না।’ বলে মিসেস সেনগুপ্ত স্বামীর দিকে ঘুরে তাকান। দেখে মনে হয় সেনগুপ্ত বাবু নিজেকে সামলে নিয়েছেন, তিনি স্ত্রীর কথায় সজোরে মাথা নেড়ে সাই দেন। ‘বেশি কিছু না। আর আমরা তো আপনাকে একেবারে খালি হাতে রেখে যেতে পারি না।’

‘না না, আমি কোনো কথা শুনব না।’ রেহানা বলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও তাঁর মনে হয় যে কতক্ষণ তিনি এমন ভান করতে পারবেন যে টাকার দরকার তাঁর নেই। বিড়বিড় করে আপত্তির আরো কিছু কথা তিনি বলেন, কিন্তু শেষতক টাকাটা হাতে নেন এবং সেনগুপ্ত দম্পতিকে বলে দেন যে, তাদের ফিরতে যদি খুব বেশি দেরি হয় তাহলে হয়তো তাকে নতুন ভাড়াটে দেখতে হবে। টাকার এই অবস্থায় কেউ বাড়ি ভাড়া নিতে আসবে, সেই সম্ভাবনার অবাস্তবতায় সবাই হেসে ফেলে।

‘ইস, এত অগোছালোভাবে বাসাটা ফেলে যাচ্ছি, খুব খারাপ লাগছে,’ ঘরের চারপাশ দেখিয়ে মিসেস সেনগুপ্ত বলেন।

‘চিন্তা করবেন না। মায়া আর আমি বাকিটা সামলে নেব।’

‘সত্যি?’

‘হ্যাঁ। আপনারা শুধু সেসব জিনিসপত্র নিয়ে যান যেগুলো একান্তই দরকার। আমি জানি, আপনারা শিগগিরই ফিরে আসবেন।’

‘মিঠুন,’ সেনগুপ্ত বাবু বাগানের দিকে গলা বাড়িয়ে ডাকেন। ‘তোমার আন্টিকে বিদায় জানাও!’

স্বাভাবিক দেখানোর শত চেষ্টা সত্ত্বেও সুপ্রিয়াকে জড়িয়ে ধরার সময় রেহানার চোখ জ্বালা করতে লাগল। ‘আল্লাহ আপনাদের সহায় হোন,’ বন্ধুর কাঁধে হালকা চাপ দিয়ে রেহানা বলেন, ‘আমি আপনাদের জন্য অপেক্ষা করব।’



এপ্রিলের মাঝামাঝিতেই ওরা বুঝে গেল যে ঢাকার ওপর হামলা ছিল সবে শুরু। সেনারা এখন গোটা দেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ছে; ধিকিধিকি জ্বলতে থাকা গ্রামের ভস্মচিহ্ন পেছনে ফেলে ওরা জেলার পর জেলা মাড়িয়ে যাচ্ছে। গুঞ্জন বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে যে অল্পবয়সী ছেলেরা বাড়ি থেকে পালিয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিচ্ছে, মধ্যরাতে পা টিপে বেরিয়ে যাচ্ছে জুতো জোড়া হাতে নিয়ে, যাচ্ছে সীমান্ত পেরিয়ে মেজর জিয়াকে খুঁজতে, যিনি রেডিওতে স্বাধীন বাংলার ঘোষণা দিয়েছেন।

একদিন জয় আর আরেফ একটা ট্রাকে করে বাংলাতে এলো। ট্রাকটা নানা আকারের বাক্সে ভর্তি, সেগুলো ওরা নামিয়ে গেটের কাছে স্তূপ করে রাখল।

‘এগুলো কী?’ রেহানা জিজ্ঞেস করলেন।

‘আন্টি, আপনার সাহায্য আমাদের দরকার,’ জয় বলল। ‘কিছু জিনিস আপনার বাসায় লুকিয়ে রাখতে হবে।’

সোহেল ওর ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, ‘এসব কোথায় পেলো?’

‘কিছু বুঝতে পারছি না, কী ব্যাপার বলো তো?’ রেহানা জিজ্ঞেস করলেন। ওরা এমন ভাব করছিল যেন যা হচ্ছে তার সবকিছু খুব স্বাভাবিক। যেন মানুষেরা প্রতিদিন দিনে-দুপুরে ট্রাকভর্তি করে আজব সব জিনিস নিয়ে মানুষের বাসায় উপস্থিত হয়।

‘আম্মু,’ সোহেল বলল, ‘আমরা খবর পেয়েছি যে সীমান্তের ওপারে রিফিউজিদের জন্য উদ্বাস্তু শিবির গড়ে উঠেছে। ওদের ওষুধপত্র দরকার।’

‘এত সব কোথায় পেয়েছ?’

জয়ের উত্তর শোনার অপেক্ষায় রইল সোহেল। আরেফ ট্রাকে রয়ে যাওয়া বাক্সগুলো গুনছিল। ‘পিজি হাসপাতালে।’ সে কোমরে দুই হাত রেখে বলল। একটু নীরবতা, এর মধ্যে ছেলেদের মনে হয় রেহানা নিশ্চয় স্বাধীন জিজ্ঞেস করবেন ওরা কীভাবে পিজি হাসপাতালের ডাক্তারদের ভজিয়ে এক ট্রাক ভর্তি ওষুধ নিয়ে এলো।

কিন্তু রেহানা তা জিজ্ঞেস করলেন না। যদি জিজ্ঞেস করতেন তাহলে ওদের বলতে হতো যে ওরা এগুলো চুরি করে এনেছে। ‘ভালো আইডিয়া,’ শেষে রেহানা বললেন। ‘সব ভেতরে নিয়ে আসো। তোমরা কি দুপুরে খেয়ে যাবে?’

ট্রাকের ওপরে দাঁড়ানো আরেফের চোখ চকচক করে উঠল। ‘আমরা

জানতাম, আপনি বুঝবেন,’ খুশিভরা গলায় সে বলল।

পরদিন ওরা আবার এলো। সঙ্গে নিয়ে এলো আট বাস্ক ঝুঁড়োদুধ, তিন বাস্ক তুলো, চার বস্তা চাল, ষোল বাস্ক ডাল, বালতি, কোদাল। রেহানা তার শোবার ঘর আর রান্নাঘরের মধ্যকার প্যাসেজে খাবারগুলো রাখলেন। এখন রান্নাঘরে ঢুকতে হলে তাদের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে যেতে হবে। ডাইনিং চেয়ারগুলো টেবিলের ওপরে তুলে দেয়া হলো আর ওষুধপত্র তার নিচে ওরা জমা করে রাখল। খাবার সময় প্লেটগুলো কোলের ওপর রেখে খাওয়ার অভ্যাস করল।

বাড়িভর্তি জিনিসে মায়ার মনটা কিছুটা ঠাণ্ডা হলো। এই সে তুলোর বাস্কগুলোর ওপর খুতনি রাখে, ওই ওষুধের বাস্কগুলোর ওপরে আঙুল বুলায়।

প্রায় দুই সপ্তাহ হয়ে গেল, অথচ শারমিন এখনো লাপাত্তা। মেয়েটা যে কোথায় গেল কেউ জানে না, এদিকে বাংলোর সবাই যখন আপন মনে কল্পনা করে মেয়েটির ভাগ্যে কী ঘটে থাকতে পারে, তখন প্রত্যেকেই এ বাড়িতে তার অস্তিত্ব অনুভব করে। কিন্তু মায়া এ নিয়ে কথা বলতে চায় না। ধূসর এক খণ্ড মেঘের মতো বাড়িজুড়ে ভেসে বেড়ায় শারমিন। রেহানা প্রসঙ্গটি তোলার চেষ্টা করেন, কিন্তু প্রত্যেকবারই তাঁর মনে হয় এটা অনধিকারচর্চা হয়ে যাচ্ছে।

একদিন শেষমেষ জিজ্ঞেস করলেন, ‘ওর মা কোথায়?’

‘ময়মনসিংহ।’

‘শারমিন ওর মায়ের কাছে গেছে হয়তো।’

‘আমি ওর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। ও ওখানে নেই।’

‘ওর কি কোনো ভাই আছে?’

‘ভাই বলা যায় না।’

রেহানার মনে পড়ল শারমিনের মা আবার বিয়ে করেছিলেন। সে ঘরে অন্য ছেলেমেয়ে আছে। আর আছে সৎবাবা। সেজন্যই শারমিন হোস্টেলে থাকত, সব ঈদের ছুটি সে বাংলাতে কাটাত। সেজন্যই আলমারিতে মায়ার কাপড়ের সঙ্গে ওর কাপড়ও মিশে আছে; আর বাথরুমের তাকে ওর টুথব্রাশ। এই বাড়িতে ওর একটা ভাগ আছে। রেহানা এর সবই জানতেন, ওর জীবনের কাহিনী যখন মনোযোগের কেন্দ্রে এলো, রেহানার নিজেকে অপরাধী মনে হলো এই ভেবে যে বাংলাতে শারমিনের উপস্থিতি তিনি সবসময় ভালোভাবে নিতে পারতেন না। মেয়েটির প্রতি আরেকটু সদয় হওয়া যেত। কিন্তু হয়তো তিনি রক্ষা করতে পারতেন না, কিন্তু ভালোবাসা তো যেত!

রেহানা বুঝতে পারেন না মায়াকে নিয়ে কী করা যায়। ‘খিদে পেয়েছে তোমার?’
‘না।’

রেহানা আর কথা খুঁজে পান না। মায়া যদি শারমিনের ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ

না করে, তাহলে তাকে রেহানা কীভাবে, কী বলে সান্ত্বনা দেবেন। যে বেদনা মেয়েটির বুকে চেপে আছে তার খানিকটা ভার গ্রহণের কোনো পথ খুঁজে পান না রেহানা।

তিনি প্রায়ই ভাবেন, একটি সন্তানকে অন্যটির চেয়ে বেশি ভালো না বেসে তিনি পারেন কি। মেয়ের জন্য তাঁর ভালোবাসা ক্লান্ত, ভোঁতা, সে-ভালোবাসা যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসতে চায় না। সোহেল তাঁর প্রথম সন্তান, বড়ই কোমল; আর মায়া এত কঠিন, ওর সমস্ত দরদ ফুটে ওঠে মিছিলের চিৎকারে, ঝঙ্কৃত শ্লোগানে। বড় বেশি কঠোর কথা বেরিয়ে আসে তার মুখ থেকে। ওর ভাবনাগুলো যেন বেদনাদায়ক, সে বেদনা তাকে এমনভাবে দখল করে ফেলে যে শরীরের আদলও বদলে যায়, মুখমণ্ডলের সব ভাঁজ নড়ে ওঠে, এমন তীক্ষ্ণ হয়ে যায় যে তাকে আর তরুণ দেখায় না, সুন্দরও দেখায় না। এবং তার পছন্দ কেবল বৈধব্যের শাদা শাড়ি, যা রেহানার কাছে তিরস্কারের মতো মনে হয়।

কোমল সন্তার দুটো জের আছে তার : মোটা বেগি, ফুলে ওঠা কালো নদীর মতো যা সর্পিল ভঙ্গিতে পিঠ বেয়ে নেমে গেছে; আর ওর গানের গলা। কেবল এ দুটো জিনিসই বেঁচে গেছে উৎসর্গ হওয়া থেকে। সে প্রায়ই মাকে ভয় দেখায় ছোট চুলের মেয়েদের ছবি দেখিয়ে; ছেলেদের মতো করে ছাঁটা চুলের যেসব মেয়ে ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ থেকে তাকিয়ে থাকে। মায়ার বান্ধবীদের কেউ কেউ পারলারে গিয়ে সাহস করে ওইভাবে চুল কাটিয়ে নিয়েছে। কিন্তু এত ভয় দেখানো সত্ত্বেও, যে কারণেই হোক, মায়া ওভাবে চুল ছেঁটে ফেলেনি। এই সরল সঘন, ভারি ও উজ্জ্বল কেশরাশিই অব্যর্থভাবে বলে দেয় মায়া রেহানা বৈ অন্য কারো মেয়ে নয়। সেই চুল ছেঁটে ফেলা তো দূরের কথা, বরং মায়া চুলে ভালো করে চিরুনি চালাচ্ছে, বা নারকেল ঘষছে কেশ-পরিচর্যার এমন দৃশ্যও মা দেখেছেন। কিন্তু তিনি সাহায্য করতে এগিয়ে গেলেই মেয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ছোট্ট করে বলে, 'কিছু করছি না।'

আর যখন ও গান গায়, শীত-ভোরের হালকা কুয়াশার কোমলতা ওর মুখশ্রী ঢেকে ফেলে। ওর কণ্ঠে কর্কশ বলে কিছু নেই...বরং একটু বালিকাসুলভ, যা ওর কথা বলার কাঠিন্যকে ছাপিয়ে যায়। ও মুখ খোলে, আর ওর ঠোঁট থেকে, গলা থেকে, অপরিণত হৃদয় থেকে, উঠে আসে মিষ্টি, অনির্বচনীয় সঙ্গীতসুধা। ও মায়ের কাছে গজল শিখেছে, কিন্তু রাজনীতি তাকে নিষিদ্ধ রবীন্দ্রসঙ্গীতের দিকে টেনে নিয়েছে, সেই গানগুলো ওর গলায় আরও বেশি করে খোলে। কারণ, সেসব প্রত্যাখ্যাত ভালোবাসার শোকে বিহ্বল কাতর নয়, বরং অনুভূতির অনঘ, সহজ প্রকাশ, যা রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরের, পৃথিবীর, সৌন্দর্যের সহজাত প্রেমিক হিসেবে বিপুলভাবে উপহার দিয়েছেন। হারমোনিয়ামের ওপর ওর হাত দুটো খুব নাজুক, দংশিত-নখ আঙুলগুলো যেন এই নিবিষ্ট কাজে অর্ঘ্য সাঁপে দিচ্ছে; গানের আবেশে

ওর অজোড়া একে অন্যের সঙ্গে মিলে যায়। গান গাওয়ার মুহূর্তে, যদিও স্বল্পক্ষণ, গভীরভাবে ঐশ্বরিক উপস্থিতি কামনা করে, ঘোর অবিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও যা সে অস্বীকার করতে পারে না।

রেহানার মনে হয়, এটা তাঁর সবচেয়ে বড় হার। মেয়েটা তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করার পথ খুঁজে পায়নি।

একদিন জয় আর আরেফ ট্রাক ছাড়াই হাজির, আরেকটা ছেলে তাদের সঙ্গে। ছেলেটি হিন্দু, নাম পার্থ। ওর আত্মীয়স্বজন সবাই শহর ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

‘ওদের আসতে দিয়ো না,’ সোহেল রেহানাকে বলে। কিন্তু ওরা ইতিমধ্যে গেট ডিঙিয়ে চলে এসেছে। আরেফ এক পায়ের ভর অন্য পায়ের ওপর নেয়, আঙুলের ডগা দিয়ে চশমা ঠিক করে। পার্থ আর জয়ের মাঝখানে একটা বড়সড় কালো ব্যাগ।

রেহানা বুঝতে পারেন না সোহেল কেন ওর বন্ধুদের এড়াতে চাইছে।

জয় মুখের সামনে হাতটাকে মাইকের মতো ধরে চিৎকার করে। ‘সোহেল, দোস্ত, আয় না! বাইরে আয়!’

সোহেল যখন উত্তর দিল না, রেহানা বারান্দা পেরিয়ে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ওরা কী চায়। ওদের বেশ উষ্ণ দেখাচ্ছে, যেন বেশ ক’দিন গোসল করেনি বা কাপড় বদলায়নি। জয়ের চুলগুলো কমা চিহ্নের মতো মাথার ওপর কুঁকড়ে, আর আরেফেরগুলো কান বরাবর ঝুলে আছে। রেহানাকে ছাড়িয়ে বাংলোর জানালা গলিয়ে ভেতরে তাকাচ্ছিল পার্থ, সোহেল বের হয় কিনা দেখতে।

‘আসসালামু আলাইকুম আন্টি,’ আরেফ বলল। ‘সোহেল আছে?’

ওরা ওর বন্ধু, ওদের ভেতরে ডাকলে সোহেল নিশ্চয়ই রাগ করবে না।

‘তোমরা কি ভেতরে আসতে চাও?’

জয় আর আরেফ কালো ব্যাগটার দিকে তাকাল। ‘না,’ জয় বলল। ‘আমরা বরং এখানেই থাকি।’

আরেফ একটা ম্যাচের বাক্স নিয়ে উসখুস করছিল। সে এক প্যাকেট সিগারেট বের করে পার্থর দিকে এগিয়ে ধরে, পার্থ মাথা ঝাঁকায়। আরেফ একটা সিগারেট ধরায়, ‘ও কি বাসায় আছে?’ সে জানতে চায়।

রেহানা ভাবলেন মিথ্যা বলবেন কিনা। কিন্তু না, স্থির করলেন, মিথ্যা বলবেন না। ‘আমার মনে হয় ওর মন খারাপ।’

বন্ধুদের সম্পর্কে সোহেলের মনের এই ইঙ্গিত পরিবর্তনের কারণ বুঝতে না পেরে রেহানার বিরক্ত লাগে। কখনো বন্ধুদের সঙ্গে আঠার মতো লেগে আছে, আবার পরমুহূর্তেই দেখাটা পর্যন্ত করতে চায় না, এসব কী!

‘আমরা শুধু কথা বলতে চাই। ও কি জানালার কাছে আসতে পারে?’

‘আমি জানি না, দেখি।’ রেহানা বসার ঘরে ঢুকে দেখতে পেলেন সোহেল পায়চারি করছে। তার ঢিলা পায়জামার ফিতা দুই হাঁটুর মাঝখানে লটপট করছে। ‘ওদেরকে চলে যেতে বলো।’ ফিতা কোমরে গুঁজে সে বলল।

‘কত দূর থেকে এসেছে...’

‘আসুক।’

রেহানা একটু থামেন, পেরেশান লাগে তাঁর। ‘ঠিক আছে, আমি এর মধ্যে নেই। সোনায় যাচ্ছি। বন্ধুদের নিয়ে কী করবে না করবে সেটা তোমার ব্যাপার।’

সোনায় রেহানা আর মায়া সুপ্রিয়াদের ফেলে যাওয়া জিনিসপত্র গুছিয়ে তুলছেন, এমন সময় সোহেল প্রবেশ করে। ও খাবার ঘরের দরজার মুখে ঝুলে রইল, সুপ্রিয়ার প্লেটগুলো রেহানা খবরের কাগজ দিয়ে মুড়ে তুলে রাখছেন, তা-ই দাঁড়িয়ে দেখল। পত্রিকার বড় অংশই ফাঁকা, তিব্বত সাবান ও ব্রায়েল ক্রিমের বিশাল সব বিজ্ঞাপন ছাড়া আর বিশেষ কিছু নেই।

মায়া সেই কাগজে মোড়া প্লেটগুলো একটা বাক্সে তুলে রাখতে রেহানাকে সাহায্য করছে, কিন্তু যে মুহূর্তে সে সোহেলকে দেখল, কাজ থামিয়ে হাত গুটিয়ে নিল।

‘কী ব্যাপার, ভাইয়া?’ সে জিজ্ঞাসা করল।

‘কিছু না। আমরা ঠিক আছি কিনা দেখতে আরেফ আর জয় এসেছিল। ঘটনা কোন দিকে মোড় নেয় সেটাই এখন দেখার অপেক্ষায় আছি।’

‘কিসের অপেক্ষা?’

‘ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে বিদেশি সাংবাদিকেরা সবকিছু দেখেছে। হারামজাদাগুলোর আম্পর্দা চিন্তা করতে পারো? তারা তাদের কীর্তি ঢাকারও কোনো চেষ্টা করেনি। আন্তর্জাতিক খবরে সবকিছু বেরিয়ে যাবে।’

‘তোমার বন্ধুরা..., কী চায় ওরা?’

‘জাতিসংঘের সাহায্য আমাদের দরকার।’

‘কথা ঘুরিও না,’ মায়া খোঁচা দেয়। ‘তোমরা একটা কিছুর পরিকল্পনা করছ।’

‘কিছুই না...কী পরিকল্পনা করব?’

‘ওদের কাছে কী একটা ছিল...একটা ব্যাগ...আমরা আমাকে বলেছে। ওরা কি তোমাকে কিছু লুকিয়ে রাখতে দিয়েছে?’ সে চিপে ধরল। রেহানা জানেন, সোহেল মিথ্যা কথা সহ্য করতে পারে না।

সোহেল সোজা মায়ার দিকে তাকাল, এমনভাবে যেন সাহস থাকে তো আরেকবার জিজ্ঞেস করো। ‘তুমি যাচ্ছে, তাই না?’

‘যাচ্ছে? ও কোথায় যাবে? দাঁড়াও’, রেহানা বলতে চাইলেন। ‘আমি

ভাবলাম, তোমরা কোনো ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে তর্ক করছ। কোনো তুচ্ছ বিষয় নিয়ে। যাওয়া নিয়ে নয়। ওরা যদি বলত, ওরা যাওয়া নিয়ে কথা বলতে এসেছে, তাহলে আমি নিজে দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে ওদের ভেতরে আসতে নিষেধ করতাম।’

সোহেল চোখের ওপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে দেয়। রেহানা তার শিরা-উপশিরা বেয়ে ধেয়ে আসা আতঙ্কের সঙ্গে লড়াই করতে লাগলেন।

‘ভাইয়া, আমাকে শুধু একটু বলো, প্লিজ, আমি কথাটা কেবল জানতে চাই,’ মায়া বলল। প্লেটের বাক্সের দিকে সে তাকিয়ে রইল, যেন বলতে চায়, তোমার ওপর এটা আমার দাবি।

‘আম্মু,’ পরদিন সোহেল বলল, ‘তোমাকে আমার কিছু বলার আছে।’ ঢাকার আকাশে পূর্ণিমা। বাংলোর জানালা গলে ঢুকে পড়েছে চাঁদের কিরণ, সে কিরণে গাঢ় ছায়া ফুটে উঠেছে সোহেলের খুতনি ও পাকানো মুঠির ওপরে, যে মুঠি একবার খোলে, ফের বন্ধ হয়।

‘বলো আমাকে।’

খুব বেদনার্ত দেখাচ্ছে সোহেলকে। ‘আমাকে যেতে হবে।’

‘যেতে হবে? কোথায়? কোথায় যাবে তুমি?’

‘শুনেছি সীমান্তের ওপারে প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। বাঙালি সেনারা সবাই বিদ্রোহ করেছে। জিয়ার ঘোষণা তুমি শোননি?’

‘এটা সৈন্যদের ব্যাপার। তুমি ওখানে গিয়ে কী করবে?’

‘ওদের স্বেচ্ছাসেবক দরকার। আরেফ, জয় আর পার্থও যাচ্ছে।’

‘আমি মনে করতাম, তুমি শান্তিবাদী।’ শব্দটার ওপর জোর দিলেন রেহানা। শান্তিবাদী। এমন একজন যে সবকিছু ফেলে যুদ্ধে ঝাঁপ দেয় না। এমন একজন যে পেছনে থাকে, মায়ের বুক ভেঙে চলে যায় না।

‘আমি সত্যিই নিজের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করেছি আম্মু। আমি ঝুঁকতে পেরেছি এছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই।’

‘তুমি নিশ্চয় নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেবে। সবসময়ই তুমি নিজের ইচ্ছায় চলো।’ রেহানা মাথাটা দু’হাতে চেপে ধরলেন, চোখ মুছে ফেললেন যেন তাঁর কথা মরিয়ার মতো না শোনায। ‘কিন্তু তোমার যদি কিছু হয়ে যায়?’ রেহানার গলা ধরে আসে। সোহেল শার্টের একটা বোতাম লিগায়নি। লাল আর নীলের চেক এই শার্টটা ওর খুব প্রিয়। রেহানা সেই না-লাগানো বোতামটা লাগিয়ে দিতে একটু ঝুঁকলেন, সোহেল মায়ের মাথার ওপর হাত রাখল, যেন দোয়া করছে। ‘আমার ধারণা ছিল তুমি যুদ্ধকে ঘৃণা কর।’ দুর্বল স্বরে বললেন রেহানা।

‘এটা যুদ্ধ নয়। গণহত্যা।’

‘সিলভির জন্য চলে যাচ্ছ?’

‘না। মোটেও নয়।’ সোহেল একটু থামে, মনে হয় দম নেয়, তারপর বলে, ‘কিছুই না করে আমি ঘরে বসে থাকতে পারি না, মা। সবাই যুদ্ধ করছে। এমনকি যারা দ্বিধাবিহীন ছিল, যারা পাকিস্তানের সঙ্গে থাকতে চেয়েছিল, তারাও।’

‘কীভাবে যাবে?’

‘আরেফের চাচাতো ভাই রাজুর গাড়ি আছে। ও আমাদের সীমান্ত পর্যন্ত নিয়ে যাবে।’

সোহেল বলে না কখন সে যাবে। রেহানা যদি কোনোভাবে বিলম্ব ঘটাতে পারেন, তাহলে হয়তো ওর যাওয়াই হবে না। রেহানার ইচ্ছা করে, ব্যাপারটা যেন সোহেল তাঁর ওপর ছেড়ে দেয়। ‘সিদ্ধান্তটা পরে নেওয়া যায় না? আগামীকাল? একটু কবরস্থানে যেতাম।’

‘যাওয়াটা তো অল্প কয়েক দিনের জন্য না,’ সোহেল বলল। ‘চলো, এখন ঘুমাতে যাই।’

রেহানা মাথা নাড়েন। তারপর হঠাৎ তাঁর মনে হয়, যদি অন্য ছেলেদের মতো তাঁর ছেলেটিও তাঁকে না জানিয়ে মধ্যরাতে চলে যায়? হয়তো সে-ই ভালো হবে। না। না, সেটা ভালো হবে না।

‘আমাকে না বলে যেয়ো না।’

‘না, যাব না।’

‘কথা দাও।’

‘দিলাম।’

‘আমার গা ছুঁয়ে কথা দাও।’

‘তোমার গা ছুঁয়ে কথা দিলাম আমি।’

পরদিন রেহানা আর সোহেল কবরস্থানে যাওয়ার জন্য একটা রিকশা নিলেন। পুরোটা পথ রেহানা নীরব, যদিও তাঁর মাথার ভেতরে একটা চিন্তা: যেয়ো না! দোহাই লাগে যেয়ো না!

একদল স্কুলবালককে অতিক্রম করে গেল তাদের রিকশা। রেহানা ভাবেন, এই ছেলেগুলোও কি সোহেলের মতো কেবল যুদ্ধের চিন্তাই করছে? যুদ্ধের ভাবনাকেই কি ওরা ওদের মুখের হাওয়া মিঠাই বানিয়েছে? ওরাও কি মাকে বলে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছে?

কবরস্থান ঝকঝকে নিখুঁত, ওপরে পরিষ্কার খোলা আকাশ।

এই যে তোমার ছেলে, রেহানা ইকবালকে বলেন। আমি জানি, এ রকমটা চাইতে না তুমি। দেশের জন্য তোমার ছেলে যুদ্ধ করতে চায়। ও বলে, এছাড়া ওর গত্যন্তর নেই। আমি চাইলেও ওর সঙ্গে রাগ করতে পারি না। তাই তোমার ওপর ছেড়ে দিলাম।

কবরস্থানের শুকনো ঘাসে শান্ত মর্মর, পাশ দিয়ে চলে যাওয়া রিকশার টুংটাং, কেরোসিন কুপি থেকে দারোয়ানের ধরানো বিড়ির লালচে আভা। সবকিছু যেন চিৎকার করে বলে, যেয়ো না, যেয়ো না।

‘তুমি যেয়ো না,’ অবশেষে চেষ্টা করে বলে ওঠেন রেহানা। ‘অন্যভাবেও তো তুমি তাদের সাহায্য করতে পার।’

সোহেল এমন করে মার দিকে তাকাল যেন বলতে চায়, যাওয়া নিয়ে কথা আব্দুর সামনে থাক না। কিন্তু ইকবালের উপস্থিতিতে রেহানা জোর পেলেন। কারণ দু’জনের মধ্যে কেউ প্রতিবাদ করলে ইকবালই সেটা করতেন। তিনি একদমই নিষেধ করে দিতেন, হ্যাঁ, নিষেধ। আমি তোমাকে যেতে নিষেধ করছি, তিনি বলতেন। নিষেধ করছি! এই শব্দটা উচ্চারণ করার চেষ্টা রেহানাও করতেন; শব্দটার একটা ঝঞ্জু, অদম্য শক্তি আছে।

কিন্তু রেহানা নিষেধ করতে পারেন না। হঠাৎ এক শ্রান্তি তাঁকে পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলে। ‘আমি শুধু মনে মনে দোয়া করছি তুমি তোমার মন বদলাবে।’

সোহেলের পরনে তখনো সেই লাল-নীল চেক শার্ট; কলারটা জুতোর দিকে তাক করা। রেহানা দেখলেন ওর ভেতরে তর্ক-বিতর্ক চলছে, সর্বোত্তম সিদ্ধান্তটি নেয়ার জন্য হিসাব-নিকাশ করছে সে। ভাবছে, সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের জন্য কী করা প্রয়োজন। যাওয়ার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তুলনা করে দেখছে যেতে চাওয়ার অপরাধবোধকে। তার মনে নিশ্চিত ভেসে ওঠে বাড়িতে মা একা, শুধু মায়া তাঁর নীরব সঙ্গী। তারপর সে নিজেকে কল্পনা করে সামরিক পোশাকে। কোনটা বেশি খারাপ? সেটাই সে বেছে নেবে।

রেহানার মনে হয়, তিনিও ঠিক এটাই করতেন। একইভাবে একই পথে সারা বিশ্ব টুঁড়ে বেড়াতেন সেই জিনিসের খোঁজে যা কখনোই পাওয়া হয় না। হঠাৎ তিনি বুঝতে পারলেন, এই ব্যাপারে ছেলেটি কতখানি স্থায়ের মতো। উপলব্ধি যেন একটা খোলা জানালা।

সোহেল তখনো লড়ে যাচ্ছে। ওর হাতটা শাফের পকেটের ওপর ঘুরে মরছে। জাহাজের গায়ের মতো জ্বলজ্বল করছে ইকবালের কবরফলক।

‘খাক বেটা, অত চিন্তা কোরো না,’ এছাড়া আর কিছু বলতে পারলেন না রেহানা। ‘বাবাকে বিদায় জানাও।’

সোহেল মোনাজাতের ভঙ্গিতে হাত দুটো মুখের কাছে তুলল।

আমি ওকে থামাতে পারব না। তুমি যদি থাকতে, হয়তো পারতে। কিন্তু আমি পারব না। কী বলে ওকে আটকাব, ব্যাপারটা যে অনেক বড়।

বিকেলে সোহেল ব্যাগ গোছায়, রেহানা তার দিকে চেয়ে থাকেন। সোহেলকে সাহায্য করার জন্য তাঁর হাত নিশিপিশ করে, তাই চেষ্টা করেন অন্য কিছুতে মনোযোগ দিতে। তাকের বইগুলোতে। দেয়ালে ঝোলানো পোস্টারে। মাও জে দং। চে গুয়েভারা। কার্ল মার্কস। সে কখন চলে যাবে, কীভাবেই-বা শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছে—এসবের কিছুই সে তাঁকে বলবে না।

‘তুমি না জানলেই ভালো,’ সোহেল বলে।

মা নিজের আরেক রূপ দেখতে পান ছেলের মধ্যে: খিটমিটে, তর্কিক।

‘কেন? আমি না জানলে ভালো কেন?’

‘কারণ কেউ আমার কথা জিজ্ঞেস করলে তুমি বলতে পারবে, তুমি জান না।’

তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। জেদ করতে চাইলেন। ‘না। তুমি যখন যাবে আমাকে সামনে থাকতে হবে। আরেফ আর জয়কে বলো তোমাকে তুলে নিতে। এত রাখড়াকের কোনো দরকার নেই,’ তিনি বললেন। ‘ওদের বলো এখানে আসতে। আমি জানতে চাই কোন মুহূর্তে তুমি দরজা ছেড়ে বাইরে পা দিচ্ছ, কখন গেট পেরিয়ে যাচ্ছ। আমি ওই সময় আয়াতুল কুরসি আর সুরা ইয়াসিন পড়তে চাই।’

‘ঠিক আছে,’ শার্ট ভাঁজ করতে করতে সোহেল বলল।

এই পুরো সময়টায় মায়া দরজার কপাটের গোড়ায় দাঁড়িয়ে রইল।

‘তোমার জন্য একটা জিনিস রেখেছি,’ মায়া বলল। জিনিসটা লাল পাতলা কাগজে মোড়া। দেখে নরম মনে হলো।

‘কী এটা?’ রেহানা জিজ্ঞেস করলেন।

‘পরে খুলো,’ বলল মায়া।

রেহানার মনে হলো তাঁর যদি একটা ভাই থাকত; এমন একজন যাকে চলে যাওয়ার মুহূর্তে উপহার দেয়া যায়, যাকে নিশ্চিতমনে ভালোবাসা যায়।

রেহানা মিসেস চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। ভাবলেন, হয়তো সব তাঁকে বলবেন : সোহেলের কথা, প্যাসেজে ছেলেদের রেখে যাওয়া চোরাই জিনিসপত্রের কথা, শারমিনের হারিয়ে যাওয়ার কথা। তিনি কল্লীর চোখে দেখলেন, মিসেস চৌধুরী বরাবরের মতোই তাঁর হাত ধরে বলছেন, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।

মিসেস চৌধুরী তাঁর বাগানের নারকেল গাছগুলোর দিকে মুখ করে বারান্দায় বসে ছিলেন। রেহানা যখন ঝুঁকে তাঁর গালে চুমু খেলেন, তখন দেখতে পেলেন মিসেস চৌধুরীর মাথায় মেহেদি বাটা লাগানো।

‘সেনগুপ্তদের কোনো খোঁজ পেলেন?’ ওঁর নিশ্বাসে ডিমের গন্ধ।

‘না। আমি ভেবেছিলাম ওরা চিঠি লিখবে। সিলভি কোথায়?’ ওই রাতের পর রেহানা আর সিলভিকে দেখেননি।

‘নিজের ঘরে। নামাজ-কালাম পড়ছে বোধ হয়। আজকাল সারা দিন তাই করে।’ মিসেস চৌধুরী হাত নেড়ে প্লেটে করে আনা কাটা পেন্সে বাবুর্চিকে নিয়ে যেতে বললেন। ‘এসব কী? আমার জন্য সমুচা নিয়ে আসো!’

‘কোনো ভাজা জিনিস চলবে না খালাম্মা। সিলভি আপার হুকুম।’

‘যা বলছি তা-ই করো। আমার যদি সমুচা খেতে ইচ্ছা হয় আমি তা-ই খাব। যাও!’ বলে তিনি হাত ঝাঁকালেন, কয়েক প্রজন্মের সোনার আংটিতে ভরা আঙুলগুলো বেজে উঠল।

রেহানা মিসেস চৌধুরীর দিকে চেয়ে প্রশ্রয়সুলভ হাসেন; তিনি বুঝতে পারেন নগরীর কোনো কোনো অংশে জীবন আগের মতোই চলছে। মহিলারা সমুচা খাওয়ার জন্য জেদ করছেন। মানুষেরা ব্রিফকেস নিয়ে কাজে যাচ্ছে, জুঁকুঁচকে টাইপ করছে।

মিসেস চৌধুরী রেহানার চুপ থাকাকে ভুল বুঝলেন। ‘অত চিন্তা করবেন না। সেনগুপ্তরা তাড়াতাড়িই ফিরবে।’

‘সময়টা ভালো না।’

‘বাজে কথা। সবকিছু খুব শিগগিরই আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে। সব ঠিক হয়ে যাবে।’

মিসেস চৌধুরীর কথাগুলো রেহানার মনে সান্ত্বনা জোগায় না। তিনি অবাক হয়ে ভাবেন, গণহত্যার পর মিসেস চৌধুরী কি একদিনও বাড়ির বাইরে যাননি; তিনি কি মৃত্যু দিয়ে মোড়ানো শহরটি দেখেননি! তাঁর নিজের একটা কুকুর মারা গেছে, তিনি হয়তো এটুকুই দেখেছেন। রেহানার ভেতর ঠাণ্ডা আর গরম স্রোতের তোড় বয়ে যায়, তিনি চেয়ারটা আঁকড়ে ধরে দুলতে থাকেন।

‘আল্লাহ, আপনি তো বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছিলেন!’ মিসেস চৌধুরী দু’হাত ধাক্কা দিয়ে শব্দ করলেন। ‘এই অকর্মার ধাড়ি, এই দিকে আসো, বরফ নিয়ে আসো! জলদি!’

রেহানা চোখ দুটো বন্ধ করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন; বরফ-ঠাণ্ডা পানি তাঁর ঠোঁটের কাছে আনা হলো; তিনি চুমুক দিলেন, তারপর গা এলিয়ে দিলেন সোফায়।

আমি শুধু কয়েক মিনিটের জন্য এখানে বসে থাকব, তিনি নিজেকে বললেন। মাত্র কয়েক মিনিট।

‘কাল,’ সোহেল ফিসফিস করে বলল। ‘আমরা আগামীকাল যাচ্ছি।’

রেহানা সোহেলকে একাই ব্যাগ গোছাতে দিয়েছেন, কিন্তু ও কী কী নিয়ে যাচ্ছে তা ব্যাগ খুলে না দেখে থাকতে পারলেন না। কয়েকটা শার্ট নিয়েছে।

একটা লুঙ্গি। ওর টুথব্রাশ তার হাতে ঠেকল। মনে হলো যেন ওর চুলে রেহানা হাত বুলাচ্ছেন। সন্তুষ্ট হয়ে রান্নাঘরে গেলেন।

তিনি খাবার তৈরি করলেন। রান্নাবান্না তাকে দিনভর শান্ত রেখেছিল। কত যে কাজ!

চিংড়ির মালাইকারি করলেন। পোলাও। চিতল মাছের কাঁটা ছাড়িয়ে সেটাকে বেঁটে পরে কোণ্ডা বানান। মুরগির রোস্ট। সামি কাবাব। ঘন ডাল।

এটা আমার দায়িত্ব, নিজেকে বলেন তিনি। ভরপেটে ছেলেকে যুদ্ধে পাঠানো। তারা খেল।

মায়ার কাপড় হঠাৎ করেই তার শরীরে ঢলঢলে ঝালর হয়ে ঝুলছে, সে একটা চামচ দিয়ে তার পাতে পোলাও বেড়ে দিল। রেহানা উপলব্ধি করলেন মেয়েকে তিনি কতটা অবহেলা করেছেন। তার মুখে খাবারগুলো দানা দানা আর পানসে লাগল। একমাত্র সোহেলই খাচ্ছিল, আঙুল চাটছিল আর হাসি চুইয়ে পড়ছিল ওর পেটে।

এরপর কী হবে এই নিয়ে ওরা কোনো কথাবার্তা বলল না।

মিষ্টি আর হালুয়া খাওয়ার পরে সোহেল হাতে হাত ঘষে যাওয়ার জন্য তৈরি হলো।

‘ওদের সঙ্গে আমার সদরঘাটে দেখা হবে।’

‘রিকশা ডেকে দেব?’

‘না।’

‘আমাকে আমার মতো যেতে দাও,’ রেহানা তাকে বলতে শুনলেন। সোহেল মায়ার দিকে ঘুরল, মায়ার ঠোঁট জোড়া একটা সরু রেখায় মিলেছে। সে ওর কাঁধ জড়িয়ে ধরল। সোহেলের বাহুর মধ্যে মায়াকে পলকা দেখায়। সোহেল বোনকে নিজের বুকে টেনে নেয়, মায়া যেন চুরচুর হয়ে ভেঙে পড়ে।

‘বেজন্মাদের উচিত শিক্ষা দিয়ো,’ ফিসফিস করে বলে মায়া। তারপর ওদের রেখে চলে যায়।

আলো মিটমিট করে জ্বলছে।

‘তোমাকে যেতে দিতে মন চায় না বেটা,’ রেহানা বললেন। তিনি দেখলেন, সোহেল চেয়ে আছে তাঁর কপালের দুটো ভাঁজের দিকে, যার একটির নাম তিনি দিয়েছেন ১৯৫৯, অন্যটির ১৯৬০। আর রেহানা দেখলেন সোহেলের খুতনির নিচের দাগটা, যেটির নাম সে দিয়েছে সিলভি।

‘যাও,’ অবশেষে তিনি বললেন। ‘আল্লাহ তোমার সাথে থাকবে।’

আর তারপর সে চলে গেল। ওর ঘর ঝকঝকে, তকতকে, বিছানার চাদর টানটান করে পাতা, তাকে বইগুলো সার বেঁধে সোজা করে সাজানো, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মীর্জা গালিবের গজল আর কালেস্টেড পোয়েমস অফ ডিলান টমাস,...বহ

পঠিত, কাজীকৃত, সময়ের চাপে দীর্ঘ পাতাগুলো এখন সুবিন্যস্তভাবে রাখা। ওর পছন্দ দেখে রেহানা স্মিত হাসেন। এর মধ্যে কবিতাগুলো ওর মুখস্থ হয়ে গেছে, বহু পঠনে বইয়ের মলাট মলিন করে ফেলেছে। সোহেল নিশ্চিতভাবে কবিতাগুলো ওর সহযোদ্ধাদের আবৃত্তি করে শোনাবে, যারা বেপরোয়া বন্দুকবাজ হওয়া সত্ত্বেও অখণ্ড মনোযোগে তা শুনবে।



সোহেল চলে যাওয়ার পর রেহানা মেয়ের মুখোমুখি দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু মায়া যেন এই দুনিয়ায় নেই, এমনকি ও যখন রেহানার ঠিক সামনে বসে থাকে তখনো মনে হয় সে যেন সেখানে নেই। সে এমন আচরণ করতে থাকে যেন কেউ তাকে বলেনি যে একবার যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে অপেক্ষা করা ছাড়া তার আর কিছুই করার থাকবে না। কেউ তাকে বলেনি যে দূর থেকে কল্পনা করা ছাড়া তার আর কিছুই করার থাকবে না। কেউ তাকে বলেনি যে কতটা নিঃসঙ্গ, তপ্ত আর ক্লান্তিকর হবে যুদ্ধের দিনগুলো। এবং কেউ তাকে বলেনি যে তার বন্ধুকেই সবার আগে চলে যেতে হবে।

মায়া ওর পুরো সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটাতে শুরু করল, সকালে কারফিউ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চলে যায় রেহানার দেয়া নাশতা উপেক্ষা করে, দ্রুত কিছু কথা বলে ছুঁড়িয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়, আর প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় সাইরেন পড়ার ঠিক আগে ক্লান্ত আর টানটান মন নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। রেহানা যখন জিজ্ঞেস করেন সারাটা দিন সে কী করেছে, উত্তরে বলে ওর কাজ ছিল।

সত্যি বলতে কি, সকালে ও যখন বেরিয়ে যায় তখন পুরো বাড়ি যেন হাঁফ ছাড়ে। এমনকি গাছের পাতাগুলো পর্যন্ত স্বস্তি পায়। ফাঁকা বাড়িতে রেহানা চেষ্টা করেন তাঁর কল্পনাকে লাগামছাড়া না করতে। তাঁর সময় কাটে আশ্চর্য নিপুণতায় ঘরের কাজ করে; আর বারবার তিনি খাবারের মজুদ হিসাব করেন। সারা দেশে ছড়িয়ে পড়া নৃশংসতার খবর রেডিও শুনে জানতে পারেন। মৃত্যুর খবর, প্রেতাতারের খবর। অনাথ হয়ে যাওয়া বাচ্চাদের খবর। শূন্য কোল নিয়ে বসে থাকে মায়েদের খবর। একজোড়া জুতো বা চিরুনি ফেলে রেখে উধাও হয়ে যাওয়া মানুষের খবর।

এর মধ্যে একদিন মিসেস আকরাম আর মিসেস রহমান বেড়াতে এলেন। 'মিসেস চৌধুরী বলছিলেন আপনার নাকি খুব মন খারাপ' মিসেস রহমান শুরু করলেন।

সোহেল তাঁকে বিশেষভাবে বলে গেছে ওর চলে যাওয়া সম্পর্কে যেন কাউকে কিছু না বলেন।

'সময়টা খুব খারাপ যাচ্ছে। সবাই চলে গেছে, সেনগুপ্তরা, আর মায়ার বান্ধবী

শারমিনকে মনে আছে? ওকে আমরা কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না।’

‘আমাদের সবারই চলে যাওয়া উচিত,’ মিসেস আকরাম বললেন।
‘ছেলেমেয়েদের জন্য ঢাকা শহর একদম নিরাপদ নয়।’

‘কেন যাব আমরা?’ মিসেস রহমান বললেন। ‘আসামির মতো আমাদের পালিয়ে যেতে হবে কেন? এটা আমাদের শহর। ওরা যত পারুক টহল দিক আর ভাব দেখাক যে দখল করে নিয়েছে। আমি কোথাও যাচ্ছি না। এখানে আসার পথে ওই খানসেনাদের পাশ দিয়ে এসেছি...কতগুলো বাচ্চা ছেলে, আমার ছেলেমেয়েদের চেয়েও ছোট। ওরা কী করে ভাবে আমি ওদের ভয় পাব!’

মিসেস রহমানের বাহাদুরি জাহির করবার মধ্যে হাসির খোরাক ছিল, কিন্তু রেহানার হাসতে ইচ্ছা করল না।

‘আপনি যাবেন?’ মিসেস আকরাম জিজ্ঞেস করলেন রেহানাকে। ‘পাকিস্তানে আপনার বোনেরা থাকেন না?’

‘পাকিস্তান?’ মিসেস রহমান বললেন। ‘উনি পাকিস্তানে যাবেন কোন দুঃখে? জানেন, ওখানে আমাদের ওরা কী করত?’

‘না,’ রেহানা খানিকটা সময় নিয়ে বললেন, যেন ব্যাপারটা নিয়ে ভেবে নিলেন, ‘আমার মনে হয় না। বাচ্চারা যেতে চাইবে না।’

‘আমার কথা, সবার এখানে থেকে উপযুক্ত জবাব দেওয়া উচিত।’

‘ঠিক কী ধরনের জবাব?’ মিসেস আকরাম জিজ্ঞেস করলেন।

‘মানে আমাদের কিছু করা উচিত। আমি অত সহজে হাল ছাড়ব না।’

‘বোকার মতো কথা বলবেন না। আপনি তো গৃহিণী মাত্র। আপনার পক্ষে কি করা সম্ভব?’

‘দেখেন না কি করি। বুঝিয়ে দেব যে আমি শুধু জিন-রামি খেলি না।’

কয়েকদিন পর রেহানার মনে হয়, মায়ার সংগুপ্ত চলাফেরা যথেষ্ট হয়েছে, এবার একটা বিহিত হওয়া দরকার। তাঁর জানার ইচ্ছে জাগল মায়ী সারা দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে কী করে। মিসেস চৌধুরীর গাড়ি ধার করে এনে রেহানা ড্রাইভারকে বললেন তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে নিয়ে যেতে। তিনি জানেন না কোথায় খুঁজবেন মেয়েকে—গোলায় বিধ্বস্ত হলগুলোতে, ক্যান্টিনে, নাকি ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে। কিন্তু তিনি নিশ্চিত, মায়াকে খুঁজি পাবেন, আবার এই চিন্তাও তাঁর মন থেকে যায় না যে মেয়েটি নিশ্চয়ই তুল কিছু করছে। রেহানার অস্থির লাগে। মায়ী তো বিপদেও পড়তে পারে। যাই হোক না কেন, রেহানা সব উদ্ঘাটন করবেন, এই অস্থিরতার পরিসমাপ্তি টানবেন। তাঁর দুশ্চিন্তা হয়। হতে পারে, অকারণেই। তবুও নিশ্চিত হওয়া দরকার।

রেহানা আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে একবারই গেছেন, যখন সোহেল তাকে ক্যান্টিনের বিখ্যাত ফুচকা খাওয়ার জন্য ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। সে বাজি ধরে মাকে বলেছিল, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ফুচকা ধানমন্ডির হরলিকা স্ন্যাকসের ফুচকার চেয়েও মজাদার। রেহানা বলেছিলেন সেটা অসম্ভব। তিনি আর ইকবাল ঢাকা শহরের সব ফুচকার স্বাদ নিয়ে দেখেছেন, হরলিকা স্ন্যাকসের ফুচকা সেরা, এর ধারে-কাছেও আর কোনো ফুচকা নেই। সোহেল বলেছিল যে সেটা এক দশক আগের কথা, এতদিনে অনেক কিছু বদলে গেছে। সময় বদলে গেছে, স্বামী আজ নেই—এসব কথা স্মরণ করতে ভালো লাগে না রেহানার। কিন্তু ছেলের উৎসাহে তিনি সাড়া না দিয়ে পারেন না, তিনি রাজি হন নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে সেখানকার ফুচকা খেয়ে দেখবেন। ওরা হরলিকা স্ন্যাকস থেকে এক ডজন ফুচকা কিনেছিল এবং একটা রিকশায় করে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে সেই ফুচকার বাস্ক হাঁটুর ওপর রেখেছিল, ঝাঁকুনিতে পড়ে না যায় সেজন্য সামলে রাখতে হয়েছিল বাস্কটি।

ক্যান্টিনে পৌঁছে সোহেল আরও বারোটা ফুচকার ফরমাশ দেয়। রেহানার সামনে সে ফুচকার কাপগুলো সারি করে রাখে। তারপর প্রত্যেকটির মধ্যে একটু করে তেঁতুল-পানি ঢালে, ঠোঁট চেটে হাততালি দিয়ে বলে, ‘হরলিকা বনাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়! জিতবে কে?’ কয়েকজন ছাত্র কথা থামিয়ে গলা বাড়িয়ে তাকায়। ক্যান্টিনের মালিক কাউন্টারের পেছনে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের পক্ষে হাততালি বাজায়। সোহেল রেহানাকে বলে, বিচারের নিরপেক্ষতার স্বার্থে রেহানার উচিত হবে চোখ বন্ধ করে প্রথমে একটা ফুচকা খাওয়া, তারপর আরেকটা।

শেষতক রেহানা ক্যান্টিনের ফুচকাগুলোই বাছাই করেছিলেন।

আসলেই তো অনেক কিছু বদলে গেছে। ক্যান্টিন আর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ছোটবড় সব চালাঘর সেই কালরাত্রিতে জ্বলেপুড়ে গেছে।

রেহানার খুঁজে বের করতে হলো না মায়াকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে গাড়িটা ঢোকান সঙ্গে সঙ্গে তিনি ওকে দেখতে পেলেন। মেয়েদের একটা সারির একেবারে সামনে মায়া, সবার চেয়ে জোর কদমে আর সবার চেয়ে জোরে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে। তাহলে সে এসবই করে বেড়াচ্ছে? ভীতে ধরা বন্দুকটা নিয়ে তাকে মোটেও ভীরা বা সঙ্কুচিত মনে হলো না, যদিও সেটা একটা কাঠের লাঠি মাত্র। ‘হাট-দুই-তিন-চার! হাট হাট হাট!’ মায়া চিৎকার করছে।

রেহানা ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বলেন। মেয়েরা মার্চ করে তার পাশ দিয়ে যায়, তিনি চেয়ে থাকেন। কেউ কেউ থেমে জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি মেরে রেহানাকে দেখে। একজন সলজ্জ হাসে, আরেকজন হাত নাড়ে। মায়ার দৃষ্টি সামনে, সে মাকে খেয়াল করে না। গাড়ি থেকে কয়েক গজ দূরে এগিয়ে মেয়েরা থামে, তারপর কাঠের লাঠির ওপরে হাত রাখে, গুলি ছোঁড়ার ভঙ্গি করে, নিশানা

তাক করে, গুলি ছোঁড়ে, আবার বন্দুকে কার্তুজ ভরে। ওদের পরনে সরু নীল পাড়ের মাড় দেয়া সুতি শাড়ি। ওদের ধোপানিদের মতো দেখায়। মুখের ভাব গুরুগম্ভীর। কিন্তু মায়ার চেয়ে বেশি গুরুগম্ভীর কাউকেই মনে হয় না।

রেহানা গাড়িতে বসে মেয়ের দিকে চেয়ে রইলেন, অপেক্ষায় রইলেন কখন ওদের প্রশিক্ষণ বা কসরত, যা-ই বলা হোক না কেন, শেষ হয়। সেটা শেষ হওয়ামাত্র তিনি গাড়ির দরজা খুলে মায়াকে লক্ষ্য করে হাত নাড়লেন। কিন্তু মায়ার নজরে তিনি পড়লেন না কারণ মেয়েটি কথা বলছে একটা ছেলের সঙ্গে; ছেলেটি বাতাসে সিগারেটের ধোঁয়ায় রিং ছুঁড়ে দিল, এবং তার চোখে পড়ে রেহানা হাত নাড়ছেন, তখন ছেলেটি মায়ার কানে কানে কিছু বলে, আঙুল দিয়ে দেখায়। মায়ী শান্ত ও সতর্ক পদক্ষেপে মায়ের দিকে এগিয়ে আসে; তার কপাল কুঁচকে আছে।

‘তুমি কি আমার পেছনে গোয়েন্দাগিরি করছ?’ মায়ী বলে। কিছুক্ষণ আগের মহড়ার ফলে ওর চোখেমুখে একটা মারমুখী ভাব। ওর বেগি খুলে গেছে, এলোমেলো চুলগুলো ঘামে ভিজে কপালের সঙ্গে লেপ্টে আছে।

‘না, আমি আসলে...তুমি আজকাল এত বাইরে থাকছ। সময়টা খুব খারাপ। আমি শুধু দেখতে চাচ্ছিলাম তুমি কোথায়, কী করছ।’

‘ঠিক আছে, এখন তো দেখলে।’ মায়ী মুখের ওপর থেকে চুলগুলো হাত দিয়ে সরিয়ে দিল। ‘আমিও কিছু ভূমিকা রাখতে চাই।’

‘এইসব করে? কাঠের নকল বন্দুক নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে?’

মায়ী তার স্বভাবসুলভ আক্রমণ শুরু করে, ‘তুমি কেন আমাদের ফিরিয়ে এনেছিলে?’

‘মানে?’

‘কেন ফিরিয়ে এনেছিলে লাহোর থেকে? এতো ঝামেলা করে আমাদের নিয়ে আসার কী দরকার ছিল? এই জায়গার জন্য তোমার তো কোনো দরদ নেই।’

ও এটা কী বলল। ‘এখানে আমার বাড়ি। তোমার বাবার বাড়ি।’

‘তাহলে আমাকে কিছু করতে দিতে চাও না কেন?’

‘আমি স্রেফ তোমাকে আগলে রাখতে চাই। আমি যা কিছু করেছি, সবই তোমার আর তোমার ভাইয়ের জন্য করেছি। তর্ক না করে এখন গাড়িতে ওঠো, কারফিউ শুরু হতে বেশি দেরি নেই।’

‘আমি যাচ্ছি না।’

‘কী?’

‘আমি যাচ্ছি না। তুমি বাসায় যাও, আমি এখানে থাকব।’

‘তুমি এখনই আমার সঙ্গে যাবে। গাড়িতে ওঠো।’ এসব যে অনর্থক, রেহানা তা টের পেলেন, তবুও তিনি জোর খাটালেন, মায়ার কনুই শক্ত করে ধরে ওকে টেনে

তুললেন গাড়ির ভেতরে। নিজের শক্তিতে নিজেই অবাক হয়ে গেলেন রেহানা। মায়া ঝটকা দিয়ে তার হাত ছুটাতে চেষ্টা করল কিন্তু রেহানা তার মুঠি আরও শক্ত করলেন। 'এখানে হাস্যকর কিছু কোরো না,' ঠাণ্ডা গলায় বললেন তিনি।

ওরা গাড়িতে কেউ কারও সঙ্গে একটা কথাও বলল না। বাসায় পৌঁছার পর মায়া রেহানার ওপর আরেকবার চড়াও হলো, চিৎকার শুরু করল, 'তুমি মনে করো না তুমি আমাকে আটকে রাখতে পারবে। ভাইয়াকে ধরে রাখতে পারনি, আমাকেও ধরে রাখতে পারবে না!'

'ধরে রাখা' কথাটা বিষাক্ত তীরের ফলার মতো বিঁধল রেহানাকে।

'তুমি জানো না তুমি কী বলছ।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে...আবু মারা যাওয়ার পর থেকে...একটা জিনিস তোমাকে পেয়ে বসেছে...আমাদের বাসায় ধরে রাখা, আটকে রাখা। উন্মাদ হয়ে গেছ তুমি! পারলে তুমি আমাদের তালাবদ্ধ করে আটকে রাখতে চাও!'

রেহানা প্রসঙ্গ পাল্টানোর চেষ্টা করলেন। 'শারমিনের জন্য আমিও কষ্ট পাচ্ছি, ওর ব্যাপারটা তোমাকে যে কুরে কুরে খাচ্ছে, আমি জানি।'

'ওকে নিয়ে কোনো কথা বলবে না। তুমি কখনো বুঝতে পারবে না।'

'অবশ্যই আমি বুঝব।'

'না, আমি বলছি আমার আর ভাইয়ার কেমন লাগে তুমি কখনোই বুঝতে পারবে না।'

'তোমার ভাইকে এখানে টেনে এনো না।'

'ভাইয়া,' মায়ার কণ্ঠে তিক্ততার বিষ, 'ও এখন কোথায়? হয়তো মারা গেছে, তোমার কোনো পাকসেনার হাতে খুন হয়েছে!'

ঘটনাটা দ্রুত ঘটে গেল। রেহানা এত জোরে মারতে চাননি। যখন মায়ার গালে বসে যাওয়া পাঁচ আঙুলের লালচে দাগ দেখলেন, তখনই শুধু বুঝতে পারলেন তিনি কী করেছেন।

মায়া নিজের গালে হাত বুলায়, তাকে একটু বিস্মিত দেখায়, পরক্ষণেই প্রশান্ত। তারপর সে বলে, 'তোমার উচিত ছিল আমাদের পাকিস্তানেই রেখে দেয়া।'

রেহানার ইচ্ছে করে চড় মারার জন্য মেয়ের কাছে ক্ষমা চাইবেন, মেয়ে যতক্ষণ না ক্ষমা করছে ততক্ষণ তিনি মেয়ের কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে থাকবেন। কিন্তু রেহানা কিছুই করেন না, শুধু অপলক চোখে চেয়ে থাকেন মেয়ের দিকে, আর মনে মনে কামনা করেন, তাঁর দুর্বল ঠোঁট দুটোই কাঁপন যেন মেয়ের চোখে পড়ে।

মায়া কথা বলা বন্ধ করে দিল। কোনো প্রীতি সম্ভাষণ নেই, কোনো 'সুপ্রভাত' নেই; 'খাব না, খিদে পায়নি' নেই। সোহেল নেই, সেনগুপ্তরা নেই; মিসেস

চৌধুরী আর সিলভি স্বগৃহে স্বেচ্ছাবন্দি। ফলে পরিত্যক্ত নগরীর সঙ্গে নিজেকে একাত্ম মনে হয় রেহানার। মায়া প্লেট নিয়ে সোহেলের ঘরে চলে যায়, নীরবে খাবার খায়। গভীর রাত পর্যন্ত আলো জ্বলে। দরজার নিচের ফাঁক গলে আসা এক চিলতে মলিন হলুদ আভা, আর ঘরের ভেতরের মৃদু টুকটাক শব্দে রেহানা মেয়েকে চিনতে শুরু করেন। কখনো পাখা চালু করার খট শব্দ, বিছানার চাদর তোলার খসখস শব্দ, বইয়ের পাতা উল্টানোর হালকা শব্দ। এভাবেই কাটে প্রায় দুই সপ্তাহ, এপ্রিলের শ্বাসরুদ্ধকর অবিরল দাহ ক্রমেই আরো প্রতারক হয়ে ওঠে।

তারপর একদিন মায়া হঠাৎ ঘোষণা দিল: ‘আমাদের যোদ্ধাদের জন্য অনেক কাঁথা দরকার। আমরা পুরোনো শাড়ি জোগাড় করছি।’

‘তুমি কাঁথা সেলাই করছ?’

‘হ্যাঁ। কাঁথা সেলাইয়ের জন্য কাপড় দরকার, যেসব কাপড় তোমরা ফেলে দাও।’

কিছু বুঝে ওঠার আগেই রেহানার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো, যা তাকে পুরোনো স্টিলের আলমারির কাছে নিয়ে গেল, যেটা তিনি বহু বছর ধরে খোলেন না। রান্নাঘরের একেবারে নিচু তাকের পেছনে আলমারির ভারি চাবিগুলো তিনি খুঁজে পেলেন, যেখানে দুঃসময়ের জন্য চাল-ডাল মজুদ করে রেখেছেন। চড়াই-উৎরাইয়ের জীবন থেকে তিনি এই শিক্ষা নিয়েছেন যে কোনো কিছুই একদম শেষ করে ফেলতে নেই। তিনি সবসময়ই বেঁচে-যাওয়া ছোটখাটো জিনিস তুলে রাখেন, এক টুকরো আদা, একটু দারচিনি, এক মুঠো চাল, যেন পরের বার যখন বাজারে যাবেন তখন এসব হয়তো নাগাল এড়িয়ে যাবে, দারিদ্র্যের কারণে অথবা দেশের অনিশ্চিত ভাগ্যের কারণে।

অনেক বছর অব্যবহৃত থাকা সত্ত্বেও চাবিটা মসৃণভাবে তালায় ঢুকে গেল। চাবি ঘুরিয়ে আলমারির হাতল মোচড় দিতে রেহানা পুরোনো ধাতুর ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ চিনতে পারলেন, সিল্ক আর ন্যাপথলিনের গন্ধের জন্য হৈসি হলেন। ঝটকা মেরে এক টান দিলেন, আলমারির দরজা মৃদু আপত্তি জানিয়ে খুলে গেল, তারপর তিনি ভেতরের জিনিসগুলো ভালো করে দেখলেন। আট বছরের বিবাহিত জীবনে ইকবালের দেয়া সব শাড়ি এখানে আছে। তার মৃত্যুর পর তিনি শাড়িগুলো ধুয়ে ইস্ত্রি করে সাজিয়ে রেখেছিলেন।

শাড়িগুলো পাওয়ার প্রতিটি উপলক্ষ তাঁর মনে আছে। শাড়ির দোকান থেকে লাল-সাদা কার্ডবোর্ড বাক্সে শাড়ি আসত, তখনো বাজারের আতর আর তরুণ দোকানিদের সিগারেটের গন্ধ লেপ্টে থাকত, যাদের কাজ ছিল দোকানের উঁচু সব তাক থেকে শাড়ি নামানো আর তাদের কচি কোমরে সেগুলো হালকা গিঁট দিয়ে মেয়েলি ভঙ্গিতে পরে দেখানো। মেয়েদের ভাব নকল করে ওরা শাড়ি মেলে

ধরত, এক হাত টানটান করে এর আঁচল দোলাত, যাতে সুতার কারুকাজ, রঙের সন্তরণ চোখে পড়ে।

সময় অনুযায়ী শাড়িগুলো গুছিয়ে রাখা এমন কোনো কঠিন কাজ ছিল না, যতো দিন যাচ্ছিল ইকবালের সামর্থ্য আর স্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতাও বেড়ে চলছিল, যা প্রতিফলিত হতো বেশি দামের শাড়ি কেনায়। সাধারণ সুতির শাড়ির বদলে পাতলা শিফন শাড়ি, হাতের কাজ করা শাড়ির মর্যাদা দিতে গিয়ে ছাপা শাড়ি পরিত্যাজ্য হয়েছিল, প্রতিটি শাড়ির সুতার ভার সবসময় তার আগেরটার চেয়ে ভারি হতো, কাজগুলো হতো আরও সুচারু, রেশম হতো আরও মসৃণ, মৃত্যুর মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে ইকবাল তাঁকে সবচেয়ে চোখ-ধাঁধানো শাড়ি উপহার দিয়েছিল—একটা নীল বেনারসি।

রেহানা মুঞ্চ চোখে চেয়ে রইলেন শাড়িগুলোর দিকে আর স্মরণ করার চেষ্টা করলেন এসব শাড়ি পাওয়ার সময় তাঁর কেমন লেগেছিল: একই সঙ্গে আবৃত ও মুক্ত হওয়ার বাসনা, কোমরে আর দুই পায়ে পঁচানো কাপড়ের আড়ষ্টতা, ব্লাউজ আর পেটিকোটের মাঝের উন্মুক্ত জায়গায় অপ্রত্যাশিত পুলক—তল দিয়ে বয়ে যাওয়া হালকা হাওয়ার শিহরণ, আজব সব জায়গায় উত্তাপের ছোঁয়া...পিঠ আর উদোম পেট। শাড়ি যেন দিন আর রাত্তিকে এক করে দেয়: যেমন শরীরকে ঢেকে দেয়, আবার উন্মুক্তও করে, যাতে এক শরীর, এক রমণী তার একান্ত সত্তার জটিলতা বুঝতে পারে।

শাড়িগুলো রেহানার দিকে তাকিয়ে রইল যেমন করে ফটো অ্যালবামে রাখা ছবিগুলো তাকিয়ে থাকে, স্মৃতিজাগানিয়া আর খানিকটা অনুযোগ নিয়ে। একটা শাড়িও তিনি এতগুলো বছরে পরেননি। শাড়িগুলো হারানোর জন্য নয়, তাঁর দুঃখ হয় এই ভেবে যে শাড়িগুলো পরার কোনো উপলক্ষ আর আসবে না। হাতের ওপর শাড়িগুলো তুলে দ্রুত বসার ঘরে গেলেন। রাখলেন মেয়ের সামনে।

‘নাও। তোমার মুক্তিযোদ্ধাদের কাঁথার জন্য। আমি তোমাকে সেলাইয়ে সাহায্য করব।’

মায়া মায়ের দিকে তাকাল। ‘আমি তোমার কাছে সুতির শাড়ি চাইলাম।’ সে শান্তভাবে বলল। ‘এসব দামি শাড়ি দেয়ার মানে কী? এগুলো দিয়ে কাঁথা বানালে গা চুলকাবে।’

‘এগুলো কাঁথার ভেতরে ঢুকিয়ে দিও। দেখতে দেখতে শীত চলে আসবে, তখন রেশমের বেশি ওম হবে।’

শাড়িগুলোর দিকে চেয়ে মায়ার ভেতরটা নাড়া খায়।

‘এগুলো দিয়ো না,’ কোমল স্বরে বলে সে।

‘কেন দেব না? তুমি কখনো সাদা ছাড়া কিছু পরো না।’ রেহানা চেষ্টা করলেন

তার কথাগুলো যেন এমন না শোনায় যে তিনি মেয়েকে শাস্তি দিচ্ছেন। কেন যে শত চেষ্টার পরেও মেয়ের সঙ্গে তার কথাগুলো কড়া হয়ে যায়!

মায়ার মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই ওর ভেতরে কী হচ্ছে। ‘এগুলো দেয়া বোকামি হবে, কোনো কাজে আসবে না, এগুলো বরং তুলে রাখো।’

রেহানা মিসেস রহমান আর মিসেস আকরামকে বাংলাতে ডেকে আনলেন। ‘আমার সঙ্গে আসেন,’ সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠতে উঠতে তিনি বললেন। একটা পাটি বিছিয়ে কয়েকটা কুশন তার ওপর রাখলেন। একটা বাক্সে শাড়িগুলো স্তূপ করা ছিল। বাক্সের পাশে রেহানার সেলাইয়ের সরঞ্জাম রাখা: কতগুলো সুই আর চওড়া এক বাড়িল কালো সুতা। কাটআউট করা, কিছু নমুনা আঙুলে পরার জন্য কয়েকটা ঠুঁই আর সুই গঁথে রাখার জন্য টমেটো আকারের পিন-গাঁথুনি।

‘এসব কী জন্য?’ মিসেস রহমান বললেন। পা থেকে চপ্পল খুলে পাটির ওপর থপ করে বসে পড়লেন। ‘দর্জির দোকান খুলতে চান নাকি?’

‘কী হচ্ছে কিছু জানেন না? আমাদের চারপাশে যুদ্ধ আর আমার মেয়ে বলেছে আমার কিছু করা উচিত, এই দেশটা যে আমারও, সেটা প্রমাণ করার জন্য। তাই আমি কিছু একটা করছি।’ রেহানা টের পেলেন অশ্রুর ফোঁটা তার চোখ বেয়ে নামতে শুরু করেছে, মাথা পেছন দিকে হেলিয়ে সেটাকে তিনি আবার ফেরত পাঠালেন। ‘কিছু করার চেষ্টা করছি। রিফিউজিদের জন্য কাঁথা বানাচ্ছি।’ রেহানা ঠোঁট কামড়ে ধরলেন।

‘ব্যাপার কি, কী হচ্ছে? সোহেল কোথায়?’ মিসেস আকরাম জিজ্ঞেস করলেন।

বলার জন্য রেহানা ব্যগ্র হয়ে ছিলেন। ‘ও এখানে নেই—করাচি পাঠিয়ে দিয়েছি।’

‘সত্যি? আমি তো ভেবেছিলাম—’

‘আপনারা জানেন না ভার্শিটির ছাত্রদের ধরে নিয়ে ওরা কী করে? সোজা গায়েব করে দেয়। আমাকে কি করতে বলেন? চুপচাপ বসে থেকে ওদের হাতে সোহেলকে তুলে দিতে বলেন?’

‘রেহানা,’ মিসেস রহমান সিন্ধু শাড়িগুলো আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, ‘এগুলো ব্যবহার করার দরকার নেই। পুরোনো সুতির শাড়ি সহজেই জোগাড় করা যাবে।’

রেহানা তার সিদ্ধান্ত থেকে নড়বেন না। ‘এগুলো নয় কেন? প্রত্যেককে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, তাহলে আমি করব না কেন? এটা আমারও দেশ।’

‘অবশ্যই এটা আপনার দেশ—’ মিসেস আকরাম শুরু করলেন।

‘আমার মেয়ে তা মনে করে না।’

‘ও এ কথা বলেছে? আমি ঠিকই জানি ও সেটা বোঝাতে চায়নি, আপনি তো জানেন, ছেলেমেয়েরা কীভাবে কথা বলে।’

‘আমি ওকে চড় মেরেছি।’

‘আহ, করেছেন কী!’ মিসেস আকরাম রেহানার হাতের ওপর হাত রাখলেন।

‘নিজেকে সামলাতে পারিনি, মেরে দিয়েছি। ও খুব অবাধ্য হয়ে গেছে।’

‘আপনাকে ধৈর্য রাখতে হবে,’ মিসেস রহমান বললেন।

‘ধৈর্য? বাচ্চাদের জন্য ধৈর্য ছাড়া আমার আর কী আছে? সারা শহর চষে বেড়াচ্ছে, এই বিপ্লব, ওই গণতন্ত্র—ধৈর্য ছাড়া আর কী আছে আমার?’

‘সোহেলের জন্য হ্যাঁ, কিন্তু...’

‘এটা আপনি কী বলছেন?’

দুই মহিলা একে অপরের সঙ্গে সতর্ক দৃষ্টি বিনিময় করেন। ‘আমরা জানি, মায়াকে সামলানো খুব সহজ নয়,’ মিসেস রহমান বললেন। ‘কিন্তু আপনি ওর ব্যাপারে একটু বেশিই ক্ষমাহীন।’

‘ক্ষমাহীন? আমি? একা একটা মানুষ আমি, সবকিছু আমাকেই করতে হয়—এটা কি সম্ভব? মানুষের পক্ষে সম্ভব?’ কিন্তু রেহানা জানেন ওঁরা ভুল বলেননি। এটা তিনি জানেন এবং সেজন্য ভেতরে ভেতরে তাঁর যন্ত্রণা হয়। কিন্তু সেকথা তিনি তাঁদের বলতে পারেন না। তিনি মুখ ফুটে তাঁদের বলতে পারেন না, আপনারা ঠিকই বলেছেন। আমি মায়াকে সমানভাবে ভালোবাসতে পারিনি। বরং তিনি তাঁদের বলেন, ‘আপনারা আমাকে সাহায্য করতে চান? তো সেলাই ধরেন।’

এপ্রিলের শেষ দিনটিতে বৃষ্টি নামল। রেহানা দেখলেন তুলোর মতো মেঘ থেকে জলের ধারা ক্ষুধার্ত ফেটে যাওয়া মাটিতে তুমুলভাবে ঝড়ছে। তিনি কল্লনার চোখে দেখলেন এই বৃষ্টি যশোর রোড আর ময়মনসিংহ রোডে মানুষের অন্তহীন যাত্রার ওপর ঝরে পড়ছে, আর ঝরে পড়ছে স্বামীহারা বিধবাদের ওপর, ফুলে ওঠা পেটের ওপর, চেষ্টা করছে সবার চোখের পানি ধুয়ে দিতে, ধীরে এগিয়ে চলা মানুষদের ওপর পুরো আকাশ ভেঙে অবিরল ধারায় পানি পড়ছে তো পড়ছেই। আর তাঁর সোহেল, সোহেলের বন্ধুদের ওপর, যখন তাঁর সাবধানে পা টিপে টিপে প্রান্তরের ঘন সবুজ ঘাসের ভেতর দিয়ে, নিচু ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে, গাদা করে রাখা সোনালি গম চিরে যুদ্ধের খোঁজে যাচ্ছে, সঙ্গে নিয়ে তাদের বৃষ্টিভেজা হাসি, কিছু কবিতা আর মৃত্যুকে অস্বীকার করা টগবগে তারুণ্য।

মে



বাংলার কসাই টিক্কা খান



মিসেস রহমান আর মিসেস আকরাম তাস খেলার মতো একই উৎসাহে সেলাইয়ের কাজ হাতে নিলেন। সেলাইয়ের যাবতীয় সরঞ্জাম নিয়ে তৈরি হয়ে তাঁরা প্রতি সপ্তাহে রেহানার বাংলোতে জড়ো হন! মিসেস রহমান তাঁর পরিচিতজন আর আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে পুরোনো সুতির শাড়ি পাওয়ার একটা ব্যবস্থা করেছেন। চেনাজানা নানা রকম মানুষের নামের একটা তালিকা তিনি তৈরি করেছেন—দূরসম্পর্কের মামাতো-চাচাতো বোনদের, শ্বশুরবাড়ির দিকের আত্মীয়দের, তার দর্জির—এই যুদ্ধের নিরন্তর সংগ্রামে সবারই অবদানের কিছু না কিছু চিহ্ন থাকুক। অবশ্য তিনি সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে একথাও বলে দিয়েছেন যে, সবচেয়ে ভালো কাপড়গুলো দিয়ে দেয়ার মতো বোকামি যেন কেউ না করে।

মিসেস আকরাম, যাকে অন্যরা কিছুটা অকর্মা স্বভাবের মনে করে, তিনিই সবার চেয়ে দ্রুত সুই চালিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলেন। আর শাড়ির মাঝখানে সস্তা মোটা কাপড় ঢুকিয়ে কাঁথাগুলোকে আরও মজবুত করার যন্ত্রটিও তাঁরই।

‘চলেন, আমরা নিজেদের নাম দিই সেলাইদলের ‘উগিনী,’ বললেন মিসেস আকরাম। ‘অথবা, দাঁড়ান আমি বলছি, কাঁথা সেলাই প্রকল্প।’

‘আরে, এখন এটার একটা নামও দিতে পারছেন, কেন, আপনি না বলতেন, তাস খেলা ছাড়া আমরা আর কিছুর পারি না?’

‘আমি কখনো এমন বলিনি,’ দাঁতের ফাঁকে সুই আটকে মিসেস আকরাম প্রতিবাদ করলেন। ‘এ ধরনের ফালতু কথা আমি বলি না।’

এটা সত্যি, রেহানা ভাবলেন। এ ধরনের কথা তিনি আর বলেন না। মাত্র দু’মাস আগের দিনগুলোকেও মনে হয় যেন সুদূর অতীত। এখন মে মাস। যুদ্ধ চলছে মার্চ থেকে। আগে যা ছিল অদ্ভুত, এখন তা অদ্ভুত নয়। যেখানে যায় সেখানেই সেনাদের সবুজ উর্দি দেখতে দেখতে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। কারফিউ সাইরেন বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে একান্ত অনুগতের মতো নিজ নিজ বাড়িঘরে ফিরে আসা নিয়মে পরিণত হয়েছে। ধূলিওড়া নির্জন রাস্তাঘাট, বন্ধ দোকানপাট, হাসপাতালগুলোর বন্ধ গেট, ফল-বিক্রেতাদের আধাশূন্য ঝুড়ি—এইসব দৃশ্যে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে ঢাকা শহর। যুদ্ধের দৃশ্যপট পরিচিত হয়ে উঠছে, তারই মধ্যে জীবনযাপনের পথ ও পস্থা খুঁজে নিয়েছে সবাই।

মায়া এখনো রেহানার ওপর রেগে আছে। মা-মেয়ের মধ্যকার নীরবতা যেন চারপাশে মুখরিত হতে থাকে। তাই নিয়ে চলে পরস্পরের মধ্যে খটাখটি। মাঝে মধ্যে এমন হয়, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মায়ার ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে রেহানা ভাবেন, এবার কিছু বলবেন, মিটিয়ে ফেলবেন; নিজের ভেতরে কোমল কথার বুদবুদ টের পান তিনি। ‘আমি দুঃখিত, আমি তোমার গায়ে হাত তুলেছি।’ কিন্তু কথাগুলো তিনি উচ্চারণ করতে পারেন না। যখনই মেয়েটা বাসায় ফেরে, যখনই রেহানা দেখতে পান ওর কুঁচকানো চিড়বিড়ে চোখ-মুখ, দড়াম করে দরজা লাগিয়ে ভেতরে ঢাকা, তাঁর বিরক্তি সবেগে ফিরে আসে। ও কেন হাসতে পারে না, একটু হালকা হওয়ার আভাসও কি দিতে পারে না? না, পারে না, আর রেহানাও বরফের মতো হিম হয়ে থাকেন, শব্দগুলো তাঁর হৃদয় ও তাঁর মুখের মাঝামাঝি কোথাও আটকে থাকে।

যত সময় যায় পরিস্থিতি ততই কঠিন হয়ে ওঠে। রেহানা বাড়িটি গোছান, বাংলাতে ছেলেদের রেখে-যাওয়া জিনিসগুলো সাজিয়ে রাখেন। কাথা সেলাই করেন। সময়টা একান্ত নিঃসঙ্গ আর পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে। র‍্যাইডও শোনা, এই একটা কাজই মায়া আর তিনি একসঙ্গে করেন। সকালে শোনে বিবিসি বাংলা আর দুপুরে ভয়েস অব আমেরিকা। কিন্তু যে অনুষ্ঠান শোনার জন্য তারা অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করেন, সেটা হলো স্বাধীনতা হাঙ্গামা বেতার কেন্দ্র, যা প্রতিদিন বিকেল সাড়ে চারটায় মুক্তাঞ্চলের কোনো এক গোপন, অজানা জায়গা থেকে সম্প্রচারিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গে ঢুকে পড়া শরণার্থীর সংখ্যা ১০ লাখে পৌঁছেছে। আন্তর্জাতিক রেডক্রস সংস্থা জানিয়েছে যে, ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্তের কাছাকাছি আশ্রয় শিবিরগুলো

অত্যধিক জনাকীর্ণ হয়ে উঠেছে এবং সেখানে বিগুপ্ত পানি, যথাযথ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং ওষুধপত্রের অভাব দেখা দিয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের মানুষকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন যে, মুক্তিকামী বাঙালিরা খুব শিগগিরই পাকিস্তানি স্বৈরাচারী ফ্যাসিবাদী সরকারের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে।

সোহেল যখন ঢাকায় ফিরল তত দিনে শহরটা মোটামুটি একটা নিয়মে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। মধ্যরাতে ফিরে ও রেহানার খাটের পায়ার কাছে দাঁড়িয়ে থাকল। রেহানা পরে বলবেন, সোহেল যে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তা তিনি প্রথম থেকেই জানেন, ইচ্ছা করেই চোখ দুটো বন্ধ করে রেখেছিলেন, ওর বেঁচে ফিরে আসার স্বস্তিকর মুহূর্তটা উপভোগ করার জন্য, কিন্তু আসলে ওই পুরো সময়টা তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন—গেট দিয়ে সোহেলের ঢোকা, সবার অলক্ষ্যে আসবাব আর ওষুধের বাস্তুগুলো পাশ কাটিয়ে সন্তর্পণে পা টিপে টিপে এগোনো, তারপর ওর সবচেয়ে প্রিয় শব্দ উচ্চারণ করার আগে প্রাণভরে শ্বাস নেয়া।

‘মা।’

রেহানা নিজের গাল সোহেলের গালে ঠেকালেন। ওর গায়ে পেট্রল আর সিগারেটের গন্ধ। সোহেলের শার্টের স্পর্শে তিনি এক গভীর মর্মঘাতী একাকীত্ব অনুভব করলেন।

‘বেটা তুমি খেয়েছ?’ তিনি জানতে চাইলেন। তারপর নিজেকে নিয়ে হাসলেন। উঠে এক লহমায় ঢুকলেন রান্নাঘরে, সোহেল গেল মায়াকে জাগাতে। ওকে খুঁটিয়ে দেখার জন্য সে মাত্র কয়েক মুহূর্ত পেল। ও একটা ছাইরঙা শার্ট আর নীল প্যান্ট পরেছে—কাপড়গুলো ওর গায়ে ঢলঢলে আর ময়লা দেখাচ্ছে। ওর চোখের চারপাশে খয়েরি ছোপ, চুল-দাড়ি বেড়ে উঠেছে। নির্দিধায় বলা যায়, ওর মধ্যে এখন কেমন একটা অচেনা ভাব চলে এসেছে, যেন অন্য কারো হাত ওর গঠন বদলে দিতে শুরু করেছে, যে হাত তার মতো অতটা ভালোবাসায় পূর্ণ বা অতটা কোমলও নয়। আমার বাচ্চারা সবসময় আমার বাচ্চা ছিল না। পুরোনো ক্ষতটা ভেতরে আবার জেগে উঠলো।

রান্নাঘরে রেহানা যখন ভাবছেন কী রান্না করবেন, তখন শুনতে পেলেন সোহেল বোনকে জাগিয়ে তুলেছে। ‘ভাইয়া!’ মায়াবী চিৎকার তাঁর কানে এলো। এই ক’ মাসের মধ্যে এটাই মায়ার সবচেয়ে আনন্দময় উচ্চারণ। ‘আমাকে সব বলো’, রেহানা ওকে বলতে শুনলেন। ‘তোমার কি যুদ্ধক্ষেত্রে গেছিলে?’

ডিমের তরকারি, কয়েকটা বেগুন ভাজা, বাসি ডাল নিমেষে টেবিলে চলে এলো। সোহেল ব্যগ্রভাবে শার্টের হাতা গুটাল, মুখে খাবার নেয়ার ফাঁকে ফাঁকে মুক্তিযোদ্ধাদের কথা বলতে শুরু করল।

‘জয় ওর গাড়িতে করে আমাদের নদী পর্যন্ত নিয়ে যায়। তারপর আমরা ফেরিতে উঠি। রিফিউজিতে ভর্তি ছিল ফেরি। সেই রাতের ভয়ঙ্কর সব গল্প আমরা শুনলাম। বিশেষ করে হিন্দুদের।’

‘সেনগুপ্তরা ফিরে আসেনি,’ মায়া বলল।

সোহেল মাথা নাড়ল, আরেক লোকমা মুখে তোলার আগে একটু থেমে মায়ের দিকে কৃতজ্ঞ চোখে তাকাল। তারপর সে দরজায় চোখ রাখল, রেহানা ঠিক জানেন ছেলেটি এখন কী ভাবছে।

‘ও ভালো আছে। কিন্তু আমাদের আর খুব-একটা দেখা হয় না।’

সোহেল আবার মাথা নেড়ে গল্পটা বলে চলে। ‘আমরা জানতাম না কোথায় যাব, শুধু শুনেছিলাম বেঙ্গল রেজিমেন্ট সীমান্ত পার হয়েছে, সেখানে তারা ঘাঁটি করছে। রাজুর চাচা মিলিটারিতে ছিল। আমরা ভাবলাম, ওর খোঁজ করব। তিন দিন পর আমরা ছাউনি খুঁজে পেলাম। পূর্ব পাকিস্তানে বেঙ্গল রেজিমেন্টের যেসব বাঙালি সেনা ছিল সবাই বিদ্রোহ করেছিল। আমরা যখন ওদের খুঁজে পেলাম তখন ওরা আবার সংগঠিত হচ্ছে। প্রথমে ছিল একটা অস্থায়ী বন্দোবস্ত, পরে আমরা আগরতলা চলে গেলাম, সীমান্ত থেকে প্রায় ১৫ মাইল ভেতরে। এখন জায়গাটাকে একটা ছোট শহর বলে মনে হয়, সেখানে একটা হাসপাতালও হয়েছে, অফিসারদের থাকার জন্য ছাউনি আছে। এ রকম অন্য জায়গায়ও গড়ে উঠেছে—চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, সব মিলিয়ে সাতটা সেক্টর।’

‘আমরা প্রতিদিন রেডিও শনি,’ মায়া বলল।

‘তোমরা ঘুমাও কোথায়?’ রেহানা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বুঝতে পারছেন যে সোহেল এর চেয়ে জরুরি বিষয় নিয়ে কথা বলতে চায়, কিন্তু তিনি এই কথাটা না-বলে পারলেন না।

‘তাঁবুতে আশু। খুব একটা আরাম না। ফিরে যাওয়ার সময় আমাকে কিছু কাঁথা আর একটা প্লেট দিতে হবে। আমি এত দিন ধরে কলাপাতায় শুয়েছি।’

তার মানে সোহেল ফিরে যাচ্ছে। রেহানার হতাশ বোধ হয়, কিন্তু তিনি চেষ্টা করলেন সেটা চেপে রাখতে। ছেলেটা কী অদ্ভুত জীবনযাপন করছে। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল ও এলভিস প্রিসলির গান খুব ভালোবাসত। রেহানা টেবিলের ওপর ঝুঁকে সোহেলের পাতে আর একটু ভাত দিলেন।

‘সবাই যোগ দিয়েছে। সবাই।’ ওর চোখ জ্বলে উঠল। ‘সব তরুণ-যুবক পাশাপাশি যুদ্ধ করছে। কেউ তোয়াক্কা করে না কার কী পরিচয়। সবাই যোগ দিয়েছে, কৃষক আর সৈনিক পাশাপাশি, ঠিক যে রকম আমরা স্বপ্ন দেখেছিলাম।’ তারপর ওর মুখটা বদলে গেল। ‘কিন্তু সময়টা খুব খারাপ যাচ্ছে।’

‘তাহলে তুমি কী করবে?’ মায়া জিজ্ঞেস করল।

বড় করে নিশ্বাস নিল সোহেল। ‘আমি প্রশিক্ষণ নিচ্ছি। গেরিলা যোদ্ধার।’

‘গেরিলা?’ দুহৃতকারীর একটা আবছা ছবি ভেসে ওঠে তাঁর কল্পনায়। ‘এটা কি বিপজ্জনক?’

‘অবশ্যই বিপজ্জনক, আম্মু!’ মায়া বলে ওঠে। ‘কী ভাবছ তুমি? যুদ্ধ বলে কথা!’

‘মায়া, আমি জানি যুদ্ধ কী।’

‘কিন্তু ব্যাপারটা কি তোমাকে একটুও নাড়া দেয় না? গোটা জাতি এক হচ্ছে।’

‘নাড়া? না, আমি নাড়া খাচ্ছি না, আমি ক্লান্ত। দুশ্চিন্তা করতে করতে অসুস্থ হয়ে পড়েছি। এটা যে আমার সন্তান।’ রেহানা টেবিল থেকে উঠে রান্নাঘরের দিকে এগোলেন, কোন মিষ্টি দেয়া যায় তা নিয়ে বিড়বিড় করতে করতে। শুনতে পেলেন মেয়ের দীর্ঘশ্বাস ফেলা, আর কানে গেল সোহেলের ফিসফিস করে বলা কথা, মিটমাটের জন্য চেষ্টা।

রেহানার মনে হতে লাগল, সৈনিক হওয়ার প্রশ্নে সোহেলের মনে আগে যে সংশয় ছিল, তার ছিটেফোঁটাও এখন আর নেই। আর সবার মতো তারও রয়েছে এক ধরনের নির্মম আনুগত্য। সে একজন গেরিলা। দেশের মুক্তির সৈনিক। যদি মরতে হয় তো মরবে। রেহানা ভাবলেন, নিজেকে তাঁর আবার তৈরি করে নেয়া উচিত কিনা, সোহেলকে ছাড়া জীবন কল্পনা করা, সে যেখানটায় ছিল সে জায়গাটা উপড়ে ফেলা, ওর অনুপস্থিতির আঘাতের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয়া। এসব চিন্তা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি উপলব্ধি করলেন, তাঁর আর কোনো উপায় নেই। তিনি ছেলেকে সঁপে দিতে পারেন না ভাগ্য কিংবা দেশের কাছে, সে যদি যেতে মনস্থ করে তবে আর কিছু করার নেই।

খাওয়া শেষ হতে প্রায় ভোর হয়ে গেল।

‘একটু বিশ্রাম নাও সোহেল।’

চারপাশে চোখ বুলাল সোহেল, যেন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না বলবে কি বলবে না।

‘আম্মু, মায়া, তোমাদের কাছে আমার কিছু চাওয়ার আছে।’

সে হাত নেড়ে ওদের কাছে আসতে বলল। একটা চেয়ার নিজের দিকে টেনে মা-বোনের মুখোমুখি হলো, বসার আগে পর্দাটা টেনে দিল, বাতি নিভিয়ে নিল, ওর মুখে ছায়ার আঁকিবুঁকি করতে কেরোসিনের কুপির ছোট শিখাকে জ্বলতে দিল।

ও দুই হাত একত্র করে ধরল। ‘কিছু কিছু গেরিলা অভিযান চালানো হবে এখানে, ঢাকা শহরে,’ ও বলা শুরু করল। ‘তাই শহরের মধ্যে আমাদের একটা জায়গা দরকার। অস্ত্র রাখার জন্য। অপারেশন চালানোর আগে ও পরে আশ্রয়

নেয়ার মতো একটা নিরাপদ জায়গা।’ সে মায়ের দিকে চেয়ে থাকে, কোনো দ্বিধা-সংশয় নেই। ‘আমাদের লক্ষ্য হলো এই শহরের স্বাভাবিক জীবনকে বিপর্যস্ত করা। দুনিয়াকে জানানো আসলে কী ঘটছে। বাংলাদেশ যে ধ্বংস হচ্ছে সেটা মানুষ নিশ্চুপভাবে দেখা যাবে না।’ লম্বা একটা দম নিয়ে সে আবার বলে, ‘আমি এখানে এসেছি একটা আশ্রয়ের খোঁজে, আর গেরিলা বাহিনীর জন্য কিছু ছেলে জোগাড় করতে।’

সোহেলের এখানে পৌঁছবার দীর্ঘ পথ কল্লনার চোখে দেখার চেষ্টা করলেন রেহানা, শহর ঘিরে রাখা ব্যারিকেড ফাঁকি দিয়ে, নদীর ঘাটগুলোয় প্রখর অনুসন্ধান চালানো সার্চলাইট, সবুজ ট্রাকে বন্দুকধারী সৈনিক, সবকিছু এড়িয়ে ছেলেটা এতটা পথ এসেছে। রেহানার মনে হলো, সেখানে নিশ্চয়ই কেউ আছে, আর্মির কোনো একজন, যে সোহেলের দিকে এক নজর তাকিয়েই বুকের ফেলেছে ঢাকা পাঠানোর জন্য এ ছেলেটিই হবে সবচেয়ে উপযুক্ত। রেহানা চাইছিলেন রাগ বেশি করতে, গর্ব কম করতে, কিন্তু তিনি দেখতে পেলেন যে সোহেলের প্রস্তাবে তাঁর মন হ্যাঁ বলতে চাইছে, শুধু এজন্য নয় যে এতে তাঁর প্রতি সোহেলের আস্থা বাড়বে, বরং নিজেকেই তিনি দায়ী করলেন ছেলেটিকে এমন পরিশীলিত আর যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য, দায়িত্ব নিচ্ছে যে সদা উদগ্রীব। তিনি তো সবসময় চেয়েছেন ছেলেটা তাঁর এমন মানুষই হোক, যদিও তিনি দূরতম কল্পনায়ও ভাবেননি যে তাঁর ছেলে বা এই পৃথিবী এহেন অবস্থার এসে পৌঁছবে। রেহানা জানেন, সোহেল তাঁর কাছে কী চাইছে।

‘তুমি সোনা ব্যবহার করতে চাও।’

‘হ্যাঁ।’

সূর্যের দিকে পেছন-ফেরা সোনা। সোনা, যার জন্য তিনি সন্তানদের ফিরে পেয়েছেন। অনেক স্বপ্নের সোনা; ফাঁকা ও গর্বিত।

‘এ বাড়ি তোমার, সোহেল। এখানে তোমার জন্মগত অধিকার।’



ঢাকায় গেরিলা অভিযানের কেন্দ্র হিসেবে সোনাকে ঠিকঠাক করে নিতে সোহেলের বেশি দিন লাগল না। তার আসার কয়েক দিন পর রেহানা দেখতে পেলেন, সোহেল ও অন্য ছেলেরা গোলাপ ঝাড়ের পেছনের রুক্ষ ঘাস উপড়ে একটা গর্ত খুঁড়ে সেখানে তাদের অস্ত্রশস্ত্র পুঁতে রাখল। তারা কাজ করে রাতের বেলা, ছোট ছোট টর্চের আলোয় আঁধার চিরে। একবার রেহানাকে কৌতূহল পেয়ে বসল, তিনি একটা গর্তের ভেতর উঁকি দিলেন, তবে দেখতে পেলেন

কেবল কতগুলো অমসৃণ কাঠের বাব্ব আর ভেতরে চকচকে কিছু জিনিস, চোখ ঠারছে সূর্যকে, যা টেলে দিচ্ছে মে মাসের খটখটে শুষ্ক উত্তাপ। সোনায় পেছন দিকের ঘরগুলো সোহেল ও তার বন্ধুরা তৈরি করল নবাগত গেরিলাদের জন্য। রেহানার মনে হয় ছেলেগুলো সব নিতান্তই বালক, বয়স এতো কম—কোনো কিছু দরকার হলে তারা বাংলাতে এসে নম্রভাবে চায়। একটা হাতুড়ি। এক গ্লাস পানি। সাবান। ওরা কখনো বেশিক্ষণ দাঁড়ায় না।

সোনায় এত ব্যস্ততার কারণে মায়া আজকাল বাসায়ই বেশি থাকছে। ছেলেদের প্রেস রিলিজ লিখতে সাহায্য করার কাজে সে দীর্ঘ সময় পার করে দেয়। ওরা একটা পুরোনো টাইপরাইটার এনে দিয়েছে, মায়াকে সেটার ওপর ব্যগ্রভাবে ঝুঁকে থাকতে দেখা যায়, সে চিঠিগুলোর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আর দুই আঙুল দিয়ে টাইপরাইটারের অক্ষরগুলোয় খটখট শব্দ তোলে। মেশিনগানের শব্দের মতো মনে হয়, সোহেল বলে। রাতের বেলা রেহানা যখন মায়াকে বাসায় তার সঙ্গে খাওয়ার জন্য বলেন, তখন মেয়েটি ওই টাউস টাইপরাইটারটা সঙ্গে বয়ে নিয়ে আসে, সাদা পৃষ্ঠাগুলো গ্রীষ্মের পাখিদের ডানার মতো পতপত করে।

ছেলেরা গাদাগাদি করে সোনায় ঢোকে, বেরিয়ে যায়—রেহানা অপলক চোখে চেয়ে দেখেন। মনে মনে কল্পনা করেন, কী নিয়ে ওরা কথাবার্তা বলে, কী পরিকল্পনা করে, কী গোপন সলা করে। বাংলা গুছিয়ে ফিটফাট রেখে তিনি পাশের বাড়ির কর্মমুখরতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। সেনগুপ্তরা যে টাকা রেখে গিয়েছিল তা তিনি খুব হিসাব করে খরচ করেন আর কাপড় ধোয়া, ঘর মোছা, বাজার করা, রান্না করা—এই কাজগুলো খুব নিয়মমাফিকভাবে সারেন। ওষুধের জোগান জমা রাখার কাজ তো ছিলই। নিজেকে ব্যস্ত রাখতে তার বেগ পেতে হয় না। শারমিনের উধাও হয়ে যাওয়া বা মায়ার ক্ষোভ বা পাশের বাড়িতে মিসেস চৌধুরী আর সিলভির শীতল হয়ে-ওঠা নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ তাঁর খুব কমই হয়।

একমাত্র সমস্যা হলো কাঁথা সেলাই নিয়ে। শাড়ির নতুন জোপান নিয়ে মিসেস আকরাম আর মিসেস রহমানের বাংলাতে আসার কথা কিন্তু তাদের সোনা সম্পর্কে কিছু বলা যাবে না। বন্ধুদের কাছ থেকে গোপন করতে হবে জেনে রেহানার খারাপ লাগল, কিন্তু সোহেল বলেছে এটা তাদের নিরাপত্তার জন্য দরকার; তোমাকে অবশ্যই ভান করতে হবে যে আমরা এখানে নাই, সোহেল বলে। এখানে নাই? এছাড়া আর তিনি কিছুই ভাবতে পারেন না। কিন্তু রেহানাকে একটা বুদ্ধি বের করতে হবে, যা কাজে লাগিয়ে বাব্ববীদের দূরে রাখা যাবে।

একটা কাজই করা যায়, রেহানা ভাবেন: আচার বানানো। গাছের আমগুলো

আচার বানানোর জন্য প্রায় তৈরি; গাঢ়-সবুজ আর জিভে জল আসার মতো টক। তিনি গাছ থেকে আম পেড়ে দিতে বললেন ছেলেদের। যখন সোহেল আর মায়া ছোট ছিল, তখন এটা ওদের কাজ ছিল। গাছে উঠতে মায়া সোহেলের চেয়ে পারদর্শী; ডালে শক্তভাবে পা আটকে মায়া হাত বাড়িয়ে আম ছিঁড়ে আনত, একটা একটা করে আম পেড়ে নিচে রেহানার দিকে ছুঁড়ে দিত; আর রেহানা নিচ থেকে অবিরাম চৈঁচাত, 'সাবধানে পাড়ো! সাবধানে!'

রেহানা আমগুলো টুকরো টুকরো করে কেটে শুকনো লাল মরিচ আর সরিষা দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে জ্বাল দিতেন। তারপর বয়ামে ভরে ছাদে নিয়ে রোদে দিতেন। মাসিকের সময় আচার না ধরার একটা নিয়ম আছে। এই নিয়মটা তাকে কে বলেছিল স্মরণ করতে পারেন না।...তাঁর মা?...না, মা মনে হয় তাঁর স্বপ্নের মতো সংক্ষিপ্ত জীবনে কোনো দিন আম কাটেননি। নিশ্চয়ই তাঁর বোনদের মধ্যে কেউ। মার্জিয়া, সে-ই ছিল সবচেয়ে ভালো রাঁধুনি, আর সে-ই সব ধরনের নিয়ম জারি করত। কিন্তু রেহানা অনেক আগেই স্থির করেছিলেন যে এটা একটা ফালতু নিয়ম। আচার তৈরির সঠিক সময় নির্ধারণ করাটাই অনেক কষ্টের, ফল আর আবহাওয়া দুয়েরই যোগ হতে হয়, হতে হয় শুষ্ক আর তাতানো।

আচার বানানোর রেসিপি মনে আওড়াতে আওড়াতে রেহানা ভাবতে থাকেন, এই অবস্থায় তাঁর বোনেরা তাঁকে কী মনে করত। সোনায়ে গেরিলা যোদ্ধার দল। ছাদে কাঁথা সেলাই। রাইফেল প্রশিক্ষণে তাঁর মেয়ে। বোনেদের বিস্ফারিত চেহারা কল্পনা করে রেহানার হেসে উঠতে ইচ্ছে করে। তিনি কল্পনা করলেন একটা চিঠি লিখলে কী লিখতেন তাতে। 'প্রিয় বোনেরা,' তিনি লিখতেন। 'তোমাদের দেশ আর আমাদের দেশের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেছে। আমরা এখন ভিন্ন পক্ষে। আমি যুদ্ধের কাজে আচার বানাচ্ছি। বুঝতেই পারছ, আমি এদের পক্ষে, তোমাদের পক্ষে নই।'

ছেলেরা গাছ ঝেড়ে আম পাড়ে; তিনটা বুড়ি ভর্তি করে আম এনে রেখে যায় রেহানার কাছে। বাড়িতে যতগুলো কাচের বয়াম ছিল রেহানা ততগুলো করে খুঁজে বের করলেন, যখন সব বয়াম ভরে গেল, তখন ঠিক করলেন দই বসানোর মাটির ভাঁড় ব্যবহার করবেন, আগে প্রতিদিন বাজারে ভাঁড়-ভরা টাটকা দই পাওয়া যেত।

আচারের বয়ামগুলো ছাদের প্রায় অর্ধেকটা নিয়ে নিল। বাকি অর্ধেকটা ভরে গেল নাক সিঁটকানো তিতকুটে গন্ধে। পরদিন যখন মিসেস রহমান ও মিসেস আকরাম এলেন, আচার শুকানোর গন্ধ তাঁরা গেট থেকেই পেলেন, তাই আর ছাদে গিয়ে সেলাই করতে রাজি হলেন না।

পরের দিন আচার ঠিকমতো বসেছে কিনা দেখার জন্য রেহানা যখন ছাদে গেলেন, গেটের কাছে একটা জটলার আওয়াজ পেলেন। ‘নিশ্চয়ই মিসেস আকরাম,’ আঁচলে হাত মুছতে মুছতে রেহানা ভাবলেন। ‘উনি সবসময় আগে আসেন।’ ছাদের রেলিংয়ে ভর দিয়ে যেই রেহানা হাত নাড়তে যাবেন দেখতে পেলেন, রিকশা থেকে যিনি নামছেন তিনি তাঁর বান্ধবী নন, অন্য কেউ। একজন মহিলা গাড়ি থেকে নামলেন। হয়তো ভুল ঠিকানায় এসেছেন। রেহানা দেখার জন্য আরেকটু ঝুঁকলেন; তিনি মহিলাকে প্রায় ডাকতে গেলেন, পথ হারিয়ে ফেলেছেন কিনা জিজ্ঞেস করতে, তখন দেখলেন, মহিলা হাত উঁচু করে গেটের হড়কো খুলছেন।

‘রেহানা?’ মহিলা ডাকলেন।

পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে এই কণ্ঠস্বর রেহানা চিনতে পারতেন। তিনি একসঙ্গে দুটি করে সিঁড়ি ডিঙিয়ে নামতে লাগলেন, তাঁর পাজরের ভেতরে হৃৎপিণ্ড সশব্দে আছাড় খাচ্ছে।

মহিলা দরজায় কড়া নাড়লেন, রেহানা বাগানের দিক থেকে এগিয়ে এলেন। ‘পারভিন ভাবি।’

‘রেহানা! হাজার শুকুর!’ পারভিন তাঁর হাত মুঠোর মধ্যে নিয়ে ব্যগ্র দৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকালেন। ‘আমরা বড়ই চিন্তায় ছিলাম!’

‘আসুন,’ রেহানা বললেন, ‘ভেতরে আসুন।’ শান্ত থাকো, নিজেকে বললেন। এবার সে তোমার বাচ্চাদের নিতে আসেনি। রেহানা পারভিনকে দেখলেন স্বচ্ছন্দে ঘরে ঢুকে একটা হাই তুলে সোফায় গিয়ে বসতে। তারপর মাথাটা কুশনে ঠেস দিয়ে চোখ ঘুরিয়ে চারপাশটা দেখে নিলেন।

রেহানার মনে পড়ল, দশ বছর পার হয়ে গেছে। ওই মুখটির দিকে চেয়ে তিনি টের পেলেন এক ফুৎকারে যেন চলে গেছে একটা দশক। তাঁর মনে পড়ল সেই সময়ের কথা যখন তিনি ছিলেন দুর্বল, নির্বোধ এক বিধবা, যে নিজের সন্তানদের অধিকার ছেড়ে দিয়েছিল। তাঁর মুখের ভেতরটা তিক্ততায় ভরে উঠল। ‘ঢাকায় এলেন কী মনে করে?’ বললেন তিনি, এমনভাবে যেন তাঁর গলা শীতল শোনায অথচ মনে না হয় তিনি রেগে কথা বলছেন।

‘আর কেন, যুদ্ধের জন্য, তুমি কী ভেবেছ?’ পারভিন বললেন। ‘তোমার ভাসুরকে খুব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে পাঠানো হয়েছে, খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বোঝাই তো আমরা আসতে চাইনি, কিন্তু ফয়েজকে তো চেন, মা দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন! দেশের জন্য কাজ করতে সবসময় রাজি।’

রেহানা ধন্দে পড়ে গেলেন। কোন দেশ, কিসের দায়িত্ব?

‘আমরা সবে গত সপ্তাহে এলাম। জিনিসপত্র এখনো আসেনি, বাসা এখনো অগোছালো, কিন্তু আমি ভাবলাম, বোনকে আমার দেখতে যেতেই হবে। যদি কারও কাছে শোনে, সে কী ভাববে, তাই না?’

রেহানা যে কী বলবেন ভেবে পেলেন না। ‘হ্যাঁ, আসলে অনেক দিন তো হয়ে গেল।’

‘অনেক দিন তো বটেই।’

নীরবতা নেমে এলো। ছেলেমেয়েদের প্রসঙ্গ তুলতে চান না রেহানা, পারভিনের যদি ওদের সম্পর্কে কিছু জানার ইচ্ছা হয়, তাহলে জিজ্ঞেস করুক। সোহেল আর মায়া যখন ফিরে আসে, তখন রেহানা তাদের পেছনে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা তুলতেন না। কিছু জানতে চাইতেন না। তিনি শুধু জিজ্ঞেস করতেন ওরা ঠিকমতো খেতে দিত কিনা, মারধর করত কিনা, কোনো ভয়ঙ্কর কিছু তাদের সঙ্গে ঘটেছে কিনা। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিলেন ওদের শরীরে কোনো আঘাতের দাগ আছে কিনা। তার এক অংশ মনে মনে চেয়েছিল যেন দুর্ব্যবহারের শারীরিক কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়, যে চিহ্ন তাকে বলে দেবে যে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ বিচ্ছেদের স্মারক ওরাও বহন করছে। তাঁর অবর্তমানে ওদের জীবনে যে সামান্য স্নেহমমতা এসেছিল সেসম্পর্কেও রেহানা কিছু জানতে চাইতেন না। বিশেষ করে জানতে চাইতেন না যে ওদের মা হিসেবে পারভিন আদৌ ভালো ছিলেন কিনা।

‘তো,’ হাঁটুতে মৃদু চাপড় মেরে পারভিন বললেন। ‘বাচ্চারা আল্লাহর রহমতে ভালো আছে তো?’

‘হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ, ওরা ভালো আছে।’ রেহানা পারভিনকে প্রায় বলতে যাবেন যে ওরা বাসায় নেই, এসে খুব মন খারাপ করবে যে দেখা হলো না, কিন্তু পারভিন সে সুযোগ তাঁকে দিলেন না।

‘তাহলে তুমি এখনো এখানেই থাক? পেছনের বাড়িটা ভাড়া দিয়েছ?’

‘হ্যাঁ।’

‘ভাড়াটে আছে?’

‘হ্যাঁ, সেনগুপ্ত বাবুরা।’

‘হিন্দু?’ পারভিন নাক সিঁটকালেন। ‘তুমি হিন্দুদের বাড়ি ভাড়া দিয়েছ?’

‘ওরা আমার অনেক দিনের ভাড়াটে,’ রেহানা বললেন, ‘ওরা এখন আত্মীয়ের মতো হয়ে গেছে।’

‘তোমার বাড়ি তুমি কাকে ভাড়া দেবে সেটা তোমার ব্যাপার। কিন্তু আমি এসব মানুষের কাছে বাড়ি দিয়ে নিশ্চিত থাকতে পারছি না..’ পারভিন এমন মুখভঙ্গি করলেন যেন পচা দুধে চুমুক দিয়েছেন।

শেষের কথাটা রেহানা গ্রাহ্য করলেন না; তিনি ব্যস্ত পারভিনের আসার আসল উদ্দেশ্যটা বের করার চেষ্টায়। পারভিনের অস্বস্তি আত্মবিশ্বাস আর ঠমক দেখে মনে হলো, তাদের মধ্যকার মলিন ইতিহাসের শেষ কণা পর্যন্ত তিনি ভুলে গেছেন। কিন্তু রেহানার এতে সত্যি করে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। পরিবারের মধ্যে প্রায়শ এমনটাই ঘটে; একে-অপরকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চায়,

আবার পরক্ষণে এমন ভান করে যেন কিছুই হয়নি; আবার পুরোনো অভ্যাসে ফিরে যায়, অনায়াসে পরস্পরকে হেয় করে কথা বলে, এখন রেহানার জীর্ণ আসবাবের দিকে আঙুল তুলে যেমনটি করছেন পারভিন।

‘...যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওদের উচ্ছেদ করতে হবে।’

রেহানা আবার আলোচনায় ফিরে এলেন। ‘উচ্ছেদ, কাদের?’

‘তুমি কি আমার কথা শুনছ না, রেহানা? আমি আমাদের মহান জাতির মধ্যকার ডার্ট এলিমেন্টগুলোর কথা বলছি। হিন্দু, কমিউনিস্ট, বিচ্ছিন্নতাবাদী! সেজন্যই তোমার ভাসুর আর আমি এখানে—এটা একটা মহান দায়িত্ব, এরকম দায়িত্ব পালনের সুযোগ পাওয়াও ভাগ্যের ব্যাপার।’

এই তাহলে আসার কারণ! রেহানার চোখ জানালা দিয়ে ছুটে গেল সোনার দিকে। গেরিলা ঘাঁটি থেকে পারভিন মাত্র কয়েক গজ দূরে। রেহানা নিশ্চিত হলেন যে পাশের বাড়িটাতে স্পষ্টত কারো কোনো নড়াচড়ার আভাস পাওয়া যাচ্ছে না, তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। হঠাৎ করেই এই শঠতায় তিনি মজা পেলেন। পারভিন এত আয়েশ করে বসে গালগল্প মারছেন আর ওদিকে পাশের বাড়ির ছেলেরা বাগানে অস্ত্র পুঁতে রাখছে। রেহানা যখন তাঁকে নাশতা দেয়ার কথা বলতে যাবেন, তখনই গেটের হুড়কো ওঠানোর শব্দ হলো, আর গেটটা দোলা খেয়ে খুলে গেল।

‘এই যে আমরা! আজকে দেরি হয়ে গেছে।’ মিসেস আকরাম আর মিসেস রহমান। গাড়িবারান্দা পার হয়ে তিনি ওদের আসতে শুনলেন, ‘কিসের গন্ধ, ছাদে আচারের কারখানা খুলেছেন নাকি?’

রেহানা দ্রুত দরজার কাছে গিয়ে ওদের ভেতরে নিয়ে এলেন। ‘আসেন আসেন। আমার ভাবির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।’ স্বাভাবিক গলায় বলতে চেষ্টা করলেন তিনি। ‘ভাবি, এরা আমার বান্ধবী মিসেস আকরাম আর মিসেস রহমান।’

মিসেস রহমান পারভিনের দিকে এমন অকপট চোখে তাকালেন যে নিজের অস্তিত্ব জানিয়ে দিচ্ছেন ওকে। তারপর স্কুলের হেডমিস্ট্রেসের চণ্ডে বললেন, ‘আসসালামু আলাইকুম।’

‘সালাম আলাইকুম,’ মিসেস আকরাম প্রতিধ্বনি তুললেন।

‘আমরা আপনার কথা অনেক শুনেছি,’ মিসেস রহমান বললেন। ‘ঢাকায় ফিরে এলেন যে? আমি জানতাম আপনি লাহোরে থাকেন।’

‘আমরা এখানে সব ঠিক করতে এসেছি,’ একটা হাসি দিয়ে পারভিন বললেন।

‘ওরা আর্মির হয়ে কাজ করতে এসেছেন,’ রেহানা বললেন। আর মনে মনে দোয়া করলেন, মিসেস রহমান যেন নিজের চিন্তা নিজের মনেই রাখেন, কিছু বলে

না ফেলেন।

‘ও আচ্ছা, তাই!’ বললেন মিসেস আকরাম। ওরা দরজা ঘিরে অপ্রস্তুতভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন, বসবেন কিনা বুঝতে পারছেন না।

‘আচারের কী হবে?’ মিসেস রহমান বললেন। ‘যা গন্ধ!’

‘ও, গন্ধটা তাহলে আচারের!’ পারভিন বললেন।

‘সরি। দেখা যাচ্ছে এখন এজন্য অন্য কোনো জায়গা খুঁজে পেতে হবে।’ রেহানা বললেন।

‘কিসে পেয়ে বসল আপনাকে বলেন তো?’ মিসেস রহমান জিজ্ঞেস করলেন। ‘সারা রাত জেগে ছিলেন মনে হয়?’

‘আসলে আমি ভাবলাম, যতটা বানানো সম্ভব বানাই...কে বলতে পারে আমার গাছটাই আর থাকে কিনা।’

এ কথায় মিসেস আকরাম সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়লেন। ‘তা সত্যি,’ তিনি বললেন। ‘ভবিষ্যতের কোনো ঠিক-ঠিকানা নাই।’

‘কিন্তু এতগুলো আচার কে খাবে?’ মিসেস রহমান জানতে চাইলেন। ‘ভাবতেই আমার পেট গুলাচ্ছে।’

‘বিক্রি করতে পারবেন,’ মিসেস আকরাম বললেন।

‘আরে, ভালো বুদ্ধি তো, আচার বিক্রির টাকা দিয়ে তো আরো সুতো কেনা যাবে।’

‘দেখা যাক,’ রেহানা বললেন। ওদের তাড়াতাড়ি বিদায় করতে পারলে বাঁচেন। ভাগ্য ভালো যে ওদের দিকে পারভিনের তেমন খেয়াল নেই। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে খাবার টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলেন, যেখানে রেহানা নাশতার বেচে যাওয়া পরোটা রেখেছিল; মায়া ওরটা ছুঁয়েও দেখেনি। ‘তাহলে পছন্দমতো কোনো জায়গা না পাওয়া পর্যন্ত দু-একদিনের জন্য কি কাজ বন্ধ রাখব?’

রেহানার পিঠে আলতো চাপড় মেরে জিন-রামি খেলার মহিলারা চলে গেলেন। যাওয়ার সময় ফিসফিস করে বললেন, কাল আমাদের সব খুলে বলবেন, কেমন! তার মিনিট কয়েক পরে রেহানাকে ছেলেমেয়েদের নিয়ে তাঁর নতুন বাড়িতে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে পারভিনও চলে গেলেন। সবকিছু এত দ্রুত ঘটে গেল যে রেহানার মনে হলো যেন এটা একটা স্বপ্ন ছিল। যদি পারভিনের সুগন্ধির বুদ্ধবুদ্ধ ঘরের দেয়াল আঁকড়ে না থাকত, অথবা তাঁর উচ্চারণ শব্দগুলো যদি নিজে থেকেই তাঁর কানে ঠেস না মারত, অথবা যদি তাঁর চকচকে বাঁকা চুল, তাঁর জমকালো শাড়ির রূপ অদৃশ্য হয়ে যেত, নিদেনপক্ষে হালকা হয়ে যেত, তাহলেও হয়তো সম্ভব ছিল একে স্বপ্ন ভাবা। কিন্তু বাস্তবতা অবশ্যই তা ছিল না, মধ্যাহ্নকে মোকাবেলা করতে রেহানা রয়ে গেলেন; দৃশ্যটা আবার ফিরে চালু করলেন আর ভাবলেন, এত কিছুর পর পারভিন কেন এখানে আসতে মনস্থির করলেন!



আগেরবারের মতো প্রায় একই রকমভাবে আরেকটা সপ্তাহ কেটে গেল; সোহেল ও তার বন্ধুদের সোনায়ে আনাগোনা চলছে; ছাদে আচার জমে উঠল; মে মাসের সূর্য প্রতিদিন সকালে জানালা দিয়ে হামলে পড়ে সবাইকে শ্বাসরুদ্ধ করার হুমকি নিয়ে।

সোহেল বাংলাতে হাজির হয়ে বলল, ‘আম্মু, আমরা তৈরি।’

‘তৈরি? কিসের জন্য?’

‘অপারেশনের জন্য। একটা দল গঠন করেছি আমি, আর আমরা কাজে নামার নির্দেশ পেয়েছি।’

বাগান খুঁড়ে অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখা এবং বাড়িটা ওদের ঘাঁটি হিসেবে তৈরি করার পর ওরা আর কী করবে সে বিষয়ে রেহানা খুব একটা মাথা ঘামাননি। সবকিছু জোগাড় করে গোছাতেই মনে হচ্ছিল, অনেক কাজ হলো। কিন্তু আসলে ওরা মাত্র তৈরি হচ্ছিল এর জন্য।

‘তোমরা কী করবে?’

‘ইন্টারকন হোটেলে একটা বোমা পাতা হবে। এর মধ্য দিয়ে আমরা একটা ঘোষণা জারি করতে চাচ্ছি।’ সোহেল হাত দিয়ে চোয়াল ঘষতে লাগল।

‘ঘোষণা? কী ধরনের ঘোষণা? মানুষ মারা যাবে?’

‘না। আমরা আশা করছি, কোনো ক্যাজুয়ালটি ঘটবে না।’

ক্যাজুয়ালটি বলতে সে মৃত মানুষ বোঝাতে চায়।

‘বিপজ্জনক হবে?’

‘তুমি চাও আমি মিথ্যা বলি, তাই না?’

হ্যাঁ, তাই। ‘...না, অবশ্যই না।’

‘না, বিপজ্জনক হবে না। আমার কাজ শুধু লক্ষ্য রাখা, তাকে তাকে থাকা।’ সোহেল মায়ের হাত ধরল। ‘থ্যাংক ইউ, আম্মু। অনেকবার তোমাকে এটা বলতে চেয়েছি।’

‘তুমি যে আমার কাছে আছ এতেই আমি খুশি।’ রেহানা শুকে দিয়ে শপথ করাতে চাইলেন যে ওর কিছু হবে না। ওরা নিরাপদ থাকবে। ও নিহত হবে না বা পঙ্গু হবে না বা স্বার্থপরের মতো এমন আর কিছুও হবে না। ‘কখন যাবে?’

‘কাল, খুব ভোরে—সূর্য ওঠার আগে।’

‘আমি তখন নামাজে থাকব,’ এইটুকু ছাড়া মা বলার মতো আর কিছু খুঁজে পেলেন না।

সোহেলের হাতটা আবার চোয়ালে উঠে গেল, মনে হলো ও যেন কিছু বিবেচনা করে দেখছে। ‘আমরা রওনা হওয়ার আগে তুমি আসবে? সবার সঙ্গে

তোমার পরিচয় হবে।’

‘তোমার বন্ধুরা কিছু মনে করবে না তো?’

‘তোমার দোয়া পেলে ওরা বরং খুশি হবে। ওদের কেউ কেউ মাকে বহুদিন দেখেনি।’

রেহানা বুঝলেন। সোহেলের এই অনুরোধে তিনি নিজের ভেতরে গর্বের এক লালিমা অনুভব করলেন।

সোহেল আবার ওর গালে হাত রাখল।

‘তোমার কি দাঁতে ব্যথা করছে?’

সোহেল দাঁত হাতি দিয়ে একটু কঁকড়ে গেল। ‘অল্প একটু। চিন্তার কিছু নাই।’

দাঁত ব্যথার মতো বিষয় নিয়ে আমি আগে চিন্তা করতাম। এখন আমার চিন্তা হয় তোমার পা, তোমার বুক, তোমার জীবন নিয়ে।

পরদিন ভোর হওয়ার আগে রেহানা বাগান পার হলেন, লোহার ছোট গেট পেরিয়ে হেঁটে গেলেন, যে গেট করেছিলেন দুটি বাড়িকে আলাদা করার জন্য। পুরি বানিয়েছেন তিনি, কতক ডাল আর কতক আলু দিয়ে, সঙ্গে হালুয়া। রান্নার জন্য অহঙ্কার করতে আজকাল কেমন বোকার মতো লাগে, কিন্তু পুরিগুলো দারুণভাবে ফুলে ওঠায় আর হালুয়ার নিখুঁত হালকা মিষ্টি স্বাদ হয়েছে বলে তিনি খুশি না হয়ে পারলেন না। গেরিলা প্রশিক্ষণ শুরু হওয়ার পর এই প্রথম তিনি সোনায় পা রাখছেন। বাইরে থেকে কোনো কিছুই অন্য রকম লাগছে না; তিনি জানেন কতক চারাগাছ উপড়ানো হয়েছিল, পরে আবার সেগুলো পুঁতে দেয়া হয়েছে, তবে দেখতে কিছুটা রক্ষ আর অপরিপাটি লাগছে। কালকে গাছগুলোতে পানি দেয়ার কথা মনে রাখতে হবে, তিনি ভাবলেন।

ভেতরে ঢোকান পর রেহানা প্রথম লক্ষ্য করলেন জমাট অন্ধকার। পর্দাগুলো সব টানা যাতে জ্যোৎস্নার ক্ষীণ আলো আর রাস্তার বাতির ক্ষীণতর আলোও ঘরে ঢোকান পথ না পায়; এ যেন চোখ বুজে থাকা ঘুমিয়ে। অন্ধকারে সন্ধ্যা সন্ধ্যা আসতে রেহানা ঘরের মেঝেতে উবু হয়ে বসে থাকা অবয়বগুলো দেখতে পেলেন। সেখানে ওঠানামা করছে আলোর বিন্দু; সিগারেট, গন্ধে বুঝলেন।

‘কেমন আছ?’ অন্ধকারে বলে উঠলেন তিনি।

‘পার্থ, আলো জ্বালো’, কেউ একজন বলল। ফস ফস করে কিছু ঘষার শব্দ পেলেন রেহানা, তারপর ম্যাচের কাঠিতে আগুনের শিখা জ্বলে উঠতে দেখলেন। হারিকেন বাতি জ্বালানো হলো।

জ্বলন্ত হারিকেনটি সবার মুখের ওপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এক এক করে প্রতিটি মুখ কমলা আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, যেন একসারি অভিনেতা নিজেদের পরিচয় দিচ্ছে। ওরা মাথা নাড়ল অথবা তাঁর দিকে চেয়ে হাসল; একজন একটা

হাত কপালের কাছে তুলে সালাম দিল। রেহানার মনে হলো, ওদের সবাইকে খুব প্রসন্ন লাগছে। একটুও ভীত নয়। ওরা যেন মৃত্যু বা তারও চেয়ে ভয়ঙ্কর কিছু মুখোমুখি হতে যাচ্ছে না। বরং মনে হচ্ছে ওরা যেন সবাই মিষ্টি বিকেলে ক্রিকেট খেলতে যাচ্ছে। সহজ। পরোয়াহীন।

রেহানা চেষ্টা করেও ওদের আলাদা করে দেখতে পেলেন না। সিগারেটের ধোঁয়ার আড়ালে ওদের ছায়াগুলো ঝাপসা, একই সঙ্গে বয়স্ক, আবার অল্পবয়সী। যখন বাতিটা ঘুরে জয়ের কাছে এলো, সে উঠে দাঁড়িয়ে রেহানার দিকে এগিয়ে গেল। বাতিটা মুখের ওপর ধরে রইল, আর রেহানা দেখলেন ওর ঠোঁটে দুটো হাসি। ‘আন্টি, দেখেন আমরা সবক’টা বদমাশ মিলে আপনার বাড়ির কী দশা করেছে!’

‘কী যে বলো, বেটা। আমার বাড়ি তো তোমাদেরই। তোমার ভাইকে তো দেখছি না।’

‘আরেফ আগরতলায়,’ জয় বলল। ‘ওকে আরেকটা মিশনে পাঠানো হয়েছে।’

মায়া সেখানেই ছিল, সে পুরির প্লেট একে একে সবার সামনে মেলে ধরল। ওরা শেষ যেবার এই ঘরে জড়ো হয়, সেই দিনটার কথা রেহানার মনে পড়ে গেল, মায়া গান গাইছিল আর শারমিন বাজিয়ে ছিল হারমোনিয়াম। মায়াকে জড়িয়ে আদর করতে ইচ্ছা করল রেহানার। বলতে চাইলেন, তাঁর সব মনে আছে।

জয় পার্থর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ‘বাক্সগুলো নেয়ার জন্য কেউ একজন আসবে,’ সে বলল। ‘আমরা এর মধ্যে আরও সাহায্য এনে জড়ো করব।’

‘আপনার সেলাই-দলের কথা আমরা শুনেছি।’ পার্থ বলল। ‘মুক্তিযোদ্ধারা সেগুলো খুব পছন্দ করবে...আপনি যদি আমাদের ছাউনি দেখতেন, আন্টি...বিছানা-বালিশের কোনো বালাই নেই।’

ছায়ার আড়াল থেকে অন্য ছেলেরা হেসে উঠল।

‘উফ,’ পুরি ভর্তি মুখে একজন বলল, ‘আর যা খাবার, রুটিগুলো লাঠির মতো শক্ত আর ফুটোয় ভরা।’

সোহেল রেহানার হাত ধরে টান দিল। ‘আম্মু,’ সে বলল, ‘ইনি আমাদের কমান্ডিং অফিসার।’ সে রেহানাকে ঘরের কোণে নিয়ে গেল। ফিসফিস করে বলল, ‘পাকবাহিনীতে উনি মেজর ছিলেন।’

‘হ্যালো,’ লোকটা বলল। তিনি বাতির ঠিক সামনে দাঁড়িয়েছিলেন বলে রেহানা তাঁর চেহারা ভালোভাবে দেখতে পেলেন না, কেবল তার চওড়া কাঁধ ছাড়া। রেহানা কীভাবে তাঁকে অভিবাদন জানাবেন বুঝতে না পেরে একটা হাত বাড়াতে লোকটা শক্ত করে সেই হাত ধরল। রেহানা মৃদুভাবে সেই সম্ভাষণের উত্তর দিলেন।

‘হ্যালো।’

‘মিসেস হক, আপনি খুব উদার, বাড়িটা আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন।’ মেজর বললেন।

‘জি, জি, সেটুকু তো করতেই হয়।’

‘গোটা জাতি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।’

তিনি হয়তো ভাবছেন রেহানা এটা করেছেন কোনো দায়িত্ববোধ থেকে। মেজরের দিকে তাকিয়ে, তাঁর শক্ত মুঠির মধ্যে নিজের আঙুলগুলোর ঝনঝনানি অনুভব করতে করতে রেহানা কামনা করেন, তাই যেন সত্য হয়। এমন নয় যে ছেলের প্রতি ভালোবাসা থেকে করেছেন বলে কাজটার মাহাত্ম্য কোনো অংশে কম; এরপরও এই ঘরে, এই দীর্ঘকায় মানুষটির উপস্থিতিতে এটা যেন কেমন করে আরও বড় হয়ে গেছে, আরও ছাড়িয়ে গেছে, শুধু নিজের সন্তানদের কাজে না এসে দেশের জন্য কিছু করতে পারায়। হয়তো তিনি আসলে দেশের জন্যই এটা করেছেন।

দূর থেকে ভেসে আসা মুয়াজ্জিনের আজানধ্বনি রেহানার মগ্নতা ভেঙে দিলে তাঁর মনে পড়ে কাজের কথা। ‘আমাকে ক্ষমা করবেন,’ ঘরভর্তি যুবকদের বললেন তিনি, ‘ফজরের আজান পড়েছে। আমাকে নামাজে দাঁড়াতে হবে। হালুয়া খাওয়া তো এখনো বাকি।’

সোহেল বলল, ‘তুমি নামাজ শেষ করে এসো, তারপর আমরা খাব।’

‘ঠিক আছে,’ অস্বস্তিকর একটা বিরতি পড়ে। ‘তোমাদের মধ্যে কেউ কি আমার সঙ্গে নামাজ পড়তে চাও?’ রেহানা চারপাশে তাকালেন; কেউ কেউ মাথা নিচু করে মাটির দিকে দৃষ্টি নামাল, রেহানা নিশ্চিত যে অপারেশনে যাওয়ার আগে ওদের মন শান্ত হওয়া দরকার, আশ্বস্ত হওয়া দরকার।

‘মা,’ সোহেল শেষে বলল, ‘পার্থ হিন্দু।’

‘তাতে কিছু যায় আসে না,’ রেহানা শুনলেন ঘরের পেছন থেকে কেউ বলে উঠেছে। তারপরও কেউ নড়ল না।

রেহানা যেইমাত্র সুপ্রিয়ার শোবার ঘরের দিকে পা বাড়ানোর, তখন মেজর বললেন, ‘কেন চাইব না? মিসেস হক, আপনি সামনে দাঁড়ান।’

‘সত্যি? তোমরা কিছু মনে করবে না?’ রেহানা প্রশ্ন হলেন, যদিও তিনি জানেন তাঁর এটা করা উচিত নয়; নামাজে মেয়েদের ইমামতি করার কথা নয়। কিন্তু তিনি পর্দা-ফেলা পশ্চিমমুখী জানালার দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন আর ছেলেরা সারি করে দাঁড়াল তাঁর পেছনে। এমনকি মায়াও যোগ দিল, জয় আর সোহেলের মাঝখানে দাঁড়াল সে। রেহানা ঘোমটা টেনে শাড়ির আঁচলটা কানের পেছনে গুঁজে দিলেন।

হে আল্লাহ!

আমি তোমার প্রশংসা এবং পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

তোমার নাম একান্ত বরকতময়, তোমার মহত্ত্ব অতি উচ্চে

এবং তুমি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই।

রেহানা আর ঘুমাতে পারেন না। ভোর হওয়ার অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি সোহেল ও তার বন্ধুদের বিদায় জানান, তারপর ভাবতে বসেন, বারেবারে ভাবেন ওদের সামনে কি কি বিপদ হতে পারে। ওদের বয়স নিতান্তই কম। ওরা অল্পতেই উত্তেজিত হয়ে যায়; বিপদের শিহরণ ওদের আকর্ষণ করে, কিন্তু আসলে ওরা কতটুকু জানে! রেহানা দিনের প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাজ আদায় করেন—জোহর, আছর, মাগরিব।

সন্ধ্যার সময়, যখন স্বাধীন বাংলা বেতারের ঘোষক জানান দিল যে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে, মায়া বিজয়ের আনন্দে চিৎকার করে উঠল আর লাল-সবুজ পতাকা উড়িয়ে সারা বাড়ি দৌড়ে বেরোল।

‘আম্মু! শোনো!’ বলে সে রেডিওটা রেহানার কানের কাছে ধরে রইল।

দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ব্যাপ্তি প্রকাশ করে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বোমা বিস্ফোরণের পর বিদেশি সাংবাদিকরা পাকিস্তান সরকারের কাছে গৃহবিবাদে রণক্ষেত্র পরিদর্শনের অনুমতি প্রার্থনা করেছেন। পাকিস্তান সরকার গণহত্যা সংক্রান্ত সকল খবর অস্বীকার করেছে এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া শেখ মুজিব এবং কলকাতায় তাঁর দোসরদের পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণার জন্য অভিযুক্ত করেছে।

অপারেশন তাহলে সফল হলো। তবুও এর মানে এই নয় যে ওরা সবাই পালাতে পেরেছে। রেহানা চোখ বন্ধ করে আয়াতুল কুরসি পাঠ করলেন, মনে হলো হাজারবারের বেশি পাঠ করা হয়েছে। তিনি ঘুমাতে পারলেন না। তাঁর মনে হলো পাশের ঘরে মায়া যেন কথা বলছে। মায়া বলছে, মা! আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম! আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। রেহানা খাট থেকে লাফিয়ে উঠে মায়ার ঘরে ছুটে গেলেন, দেখতে পেলেন টাইপরাইটারের ওপর মায়ার উদ্যত আঙুল। রেহানার বুকের ভেতরটা যন্ত্রণায় মোচড় দিতে থাকে।

‘এখানে কী করছ?’ মাথা কাত করে মায়া জিজ্ঞেস করল। ‘ভূত দেখেছ নাকি?’

রেহানা যখন শুনতে পেলেন গাড়িবারান্দা থেকে আওয়াজ আসছে, তখনই তাঁর মন বলে উঠল নিশ্চয় খারাপ কিছু একটা ঘটেছে। তিনি এতই নিশ্চিত যে তিনি যখন দেখতে পেলেন সত্যিই বিপাক ঘটেছে, তখন যেন স্বস্তি পেলেন তাঁর ধারণা ঠিক হওয়াতে। রাতের খাবারের এক ঘণ্টা আগের ঘটনা, তিনি মাত্র চুলোয় ভাত বসিয়েছেন। শব্দ শুনে রান্নাঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে দেখতে পেলেন সোহেল ও জয় একটা সবুজ গাড়ি ঠেলে নিয়ে আসছে বাড়ির দিকে। গাড়িটির ইঞ্জিন বন্ধ। গাড়ির ভেতরে আরো কয়েকজন, তিনি তাদের চিনতে পারলেন না। উদ্বিগ্ন

রেহানা ছুটে বাগান পেরিয়ে গেট দিয়ে বের হয়ে গেলেন, কাছে গিয়ে দেখতে পেলেন, গাড়ি থেকে নামানো হচ্ছে সেই মেজরকে। সোহেল ও জয়ের সারা গা রক্তে ভেজা, তাদের সঙ্গে অপরিচিত একজন, সাদা কোটপরা হালকা-পাতলা একটা লোক, আতঙ্কে নীল। তাদের মাঝখানে মেজর, স্থির ও পাঁশুটে।

‘হায় আল্লাহ, ও মারা গেছে।’

সোহেল মেজরের কাঁধ ধরে তাঁকে টেনে বের করল। তাঁর মাথা একদিকে ঝুলছে। ‘পা ধর,’ সোহেল ফিসফিস করে বলল। সোহেলের মুখের ঘাম চুইয়ে পড়ছে গাল বেয়ে। জয় মেজরের পা দুটো শক্ত করে ধরল; তারপর ওরা টেনে তাঁকে সামনের দরজা দিয়ে ঢোকাল।

‘ধুশ্ শালা!’ জয় বলে যাচ্ছে। ‘ধুশ্ শালা!’

সুপ্রিয়ার গোলাপ-খচিত গালিচার ওপর ওরা তাঁকে শুইয়ে দিল। কেউ একজন তাঁর পায়ে পট্টি বেঁধে দিল। মেজর জেগে আছেন, কাতরাচ্ছেন, আর মাথা এপাশ-ওপাশ করছেন; যখন তিনি মুখটা ঘুরালেন, রেহানা দেখলেন তাঁর গালে কাঠের ত্রিকোণ একটা ছোট টুকরো বিঁধে আছে। জয় যখন ডাক্তারের দিকে বন্দুক তাক করল, আর সোহেল মেজরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

‘চিকিৎসা করেন।’

‘আমি পারব না। আমার ডাক্তারি সরঞ্জাম দরকার—ওষুধ, এনেসথেটিক।’

‘আপনার ব্যাগে যা আছে তা-ই দিয়ে কাজ সারতে হবে।’

ডাক্তারের বয়স ওদের চেয়ে খুব বেশি নয়, হয়তো সবে পাস করে বেরিয়েছে, তেলতেলে চুলের হালকা-পাতলা নরম ছেলে।

‘ওনাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে,’ সে বলল।

‘পাগল নাকি! আপনি জানেন, কত মানুষ আমাদের খুঁজছে?’

ডাক্তার হাত নাড়ল। ‘আমি পারব না। আমি কিছু করতে পারব না।’

রেহানা মেজরের পাশে হাঁটু গেড়ে বসলেন, তরুণ ডাক্তারের কোমরের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘শোনেন, এটা বিপদের সময়। যতটুকু পারেন তা-ই করেন।’ রেহানা ডাক্তারের দিকে অপলকভাবে চেয়ে রইলেন যতক্ষণ না ডাক্তার ধীরে মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

‘ওর পা থেকে কাচের টুকরোগুলো বের করতে হবে,’ ডাক্তার বলল রেহানার ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে। ‘আরও কিছু ছোটখাটো আঘাত আছে, কিন্তু পায়েই আসল সমস্যা। আর মুখ। আমি জানি না মুখটা কীভাবে কি করব।’

‘ব্যান্ডেজ বেঁধে দিন,’ জয় বলল। ‘সকালে আমরা ওকে ফিল্ড হাসপাতালে নিয়ে যাব।’

‘উনি বেশি দূর যেতে পারবেন না।’

‘যা করার করেন! আজ রাতেই আমাদের সরে পড়তে হবে।’ জয় ডাক্তারের কপালে বন্দুকটা চেপে ধরল।

‘জয় বেটা, উনি সাহায্য করার চেষ্টা করছেন,’ রেহানা বললেন।

‘প্লিজ, বন্দুকটা সরান। আপনাদের পক্ষেই আছি আমি।’

‘কথা নয়, কাজ করেন।’

‘বন্দুক! বন্দুকটা আগে সরান!’ ডাক্তার চোখের পলক বারবার ফেলে অশ্রু রোধ করল।

জয় বন্দুক নামাল বটে কিন্তু তার আঙুল ট্রিগার ছুঁয়ে রইল।

ডাক্তার ব্যাগ থেকে সিরিঞ্জ বের করল, আর ছোট একটা বোতল উল্টে ভেতর থেকে তরল পদার্থ সুই দিয়ে টেনে নিয়ে মন দিল মেজরের পায়ের দিকে। রেহানা তাঁর পাশেই বসে রইলেন। কী অদ্ভুত—মেজরের খুবলে যাওয়া পা দেখেও তাঁর মনে কোনো প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না। বেরিয়ে আসা দগদগে মাংস, আধো অন্ধকার ঘরের মধ্যে ধবধবে সাদা হাড় ঝিলিক দিয়ে উঠল। ডাক্তার রেহানাকে মেজরের প্যান্ট টেনে খুলে ছোট ছোট ক্ষতের জায়গাগুলো মুছে দিতে বললে রেহানার একটুও দ্বিধা-সংকোচ বোধ হলো না। ডাক্তার রেহানার হাতে একটা চিমটা ধরিয়ে দিয়ে বলল কাচের টুকরোগুলো সাবধানে তুলতে। রেহানা মেজরের পায়ের ওপর ঝুঁকে তাঁর খরখর কাঁপুনি উপেক্ষা করে নিঃশব্দে কাজ করতে লাগলেন।

রেহানার চিমটার কাজ শেষ হলে ডাক্তার সেলাই শুরু করল। ‘অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।’ বলার ধরনে রেহানা বুঝলেন যে সে শুধু তাঁকে ক্ষত পরিষ্কার করতে সাহায্য করার জন্যই ধন্যবাদ জানায়নি।

মেজরের গালে তখনো কাঠের টুকরোটা গেঁথে আছে।

সোহেল জয়কে অক্ষুটে কিছু বলায় সে বন্দুকটা নামিয়ে রাখল, তারপর উবু হয়ে বসে কেরোসিনের বাতিটা ডাক্তারের হাতের কাছে ধরে রাখল। ‘আন্টি’, জয় বলল, ‘আপনি যান, একটু বিশ্রাম নিন।’

রেহানা সেনগুপ্তদের রান্নাঘরে গিয়ে এক গ্লাস পানি নিলেন। কক্ষটক করে পানি খেতেই তাঁর দীর্ঘশ্বাস পড়ল গ্লাসে। সোহেল কাছে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরল শক্ত করে। তিনি টের পেলেন, সে তাঁর কাঁধে মুখ ডুবিয়ে অব্যবহারে কাঁদছে।

‘আম্মু,’ সে ফিসফিস করে বলল, ‘আমার দোষেই এটা হলো।’

‘কীভাবে হলো?’

‘আমার জন্য। বিস্ফোরকের টাইমারটা ফিক্স করার কথা ছিল আমার। কিন্তু জায়গামতো গিয়ে আমি একেবারে বরফের মতো জমে গেলাম। একটুও নড়তে পারছিলাম না। মেজর ধাক্কা দিয়ে আমাকে সরিয়ে নিজেই কাজটা করল, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে; বিস্ফোরণের দমক ওর গায়ে লাগল। দোষটা আমার; এটা আমার হওয়া উচিত ছিল; আমিই গড়বড় করেছি।’

রেহানা কী বলবেন ভেবে পেলেন না। বুকের ওপর রাখা ছেলের মাথাটায় ধীরে হাত বুলিয়ে দিলেন।

‘আমি জানি না, আমি জানি না আমি এই কাজের উপযুক্ত কিনা—আমি যোগ্য নই। গুলি করা, প্রশিক্ষণ নেয়া—আমার যাওয়া উচিত হয় নাই।’

‘এটা তোমার দোষ না। যা-ই ঘটুক না কেন, সেটা তোমার দোষ হতে পারে না।’

‘মেজর আমার জীবন বাঁচিয়েছেন,’ সোহেল বলল। ‘উনি না থাকলে আজকে আমি মারা যেতাম।’

ডাক্তার তার কাজ শেষ করল।

‘ক্ষতগুলো আমি সেলাই করে দিয়েছি, কিন্তু ইনফেকশন হবে না এমন কথা আমি বলতে পারছি না। ওর ওষুধ দরকার। আর তারপরও ওর পা হারাতে হতে পারে।’

‘ওকে কি আমরা সরিয়ে নিতে পারি?’ জয় জানতে চাইল।

‘হয়তো কিছুটা পথ যেতে পারবেন, কিন্তু বেশিদূর নয়।’

‘আগরতলায় একটা ফিল্ড হাসপাতাল আছে, আমাদের ক্যাম্পের কাছে।’

‘সীমান্তের ওপারে? প্রশ্নই ওঠে না।’

‘আম্মু’, সোহেল বলল, ‘ওকে এখানেই থাকতে দিতে হবে।’

রেহানা ক্লান্ত; চারপাশে শুধু রক্ত; সুপ্রিয়ার কার্পেটের দফারফা। লোকটির জন্য দুঃখিত বোধ করার চেষ্টা করেও পারলেন না। কার্পেটে পড়ে আছে লোকটি, মুখ হাঁ হয়েছে তাঁর; কুৎসিত দৃশ্য। তিনি তাঁর ছেলের প্রাণ বাঁচিয়েছেন।

মায়া বলল, ‘না। উনি এখানে থাকতে পারবেন না।’ ছেলেরা ফিরে আসার পর থেকে সে একেবারে নিশ্চুপ হয়েছিল, আশপাশে ঘুরঘুর করছিল। এখন সে মেজরের কাছে দাঁড়িয়ে তার হাতের তালু ঘষছে।

‘মায়া, শোনো,’ সোহেল বলল, ‘এছাড়া আর কোনো উপায় নাই।’

‘তাহলে তুমি থাকো। তুমি থেকে ওর দেখাশোনা করো। আমাদের বাধ্য করো না করতে।’

‘আমরা এখানে থাকতে পারি না। আমাদের খোঁজা হচ্ছে।’

‘সব দোষ তোমার।’

‘হ্যাঁ, আমার, সব দোষ আমার!’ সোহেলের চোখ বিস্ফারিত, লাল, হিংস্র। ‘মা, ওর দায়িত্ব তোমাকে নিতে হবে। প্লিজ, মায়াকে বলো তুমি তাকে দেখবে।’

রেহানার বিপন্ন বোধ হলো। ‘ওর কি যাওয়ার আর কোনো জায়গা নেই?’

‘মা,’ মায়া রুদ্ধস্বরে বলল, ‘তুমি কি চাও আরেকটা লোক তোমার বাড়িতে মারা যাক?’

আরেকটা লোক? ও কি ওর বাবার কথা বোঝাতে চাইছে?

‘ওকে এখন সরানো যাবে না,’ ডাক্তার বলল। ডাক্তার মায়ার দিকে তাকিয়ে

আছে, মায়া মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে, যেন অনেকটা পথ দৌড়ে এসেছে। ডাক্তার বলল, ‘আমি থাকব। আমি থেকে ওকে বাঁচাব।’

রেহানা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। ‘আপনার নাম কী?’ তিনি ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেন।

‘রাজেশ।’

‘মায়া। মায়া প্লিজ, আমার দিকে তাকাও। আমার দিকে তাকাও। ডাক্তার রাজেশ এখানে থেকে মেজরের দেখাশোনা করবেন। কেউ মারা যাবে না। ঠিক আছে? কেউ মরছে না। তুমি কিছু করতে চেয়েছিলে, মনে আছে? তুমি কিছু করতে চাও? এই তো করা হচ্ছে। আমরা ওর দেখাশোনা করব। ও তোমার ভাইকে বাঁচিয়েছে। হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে। কেঁদো না, আর কেঁদো না।’ রেহানা মেয়ের মাথায় হাত বোলাতে থাকেন।



রেহানা চোখ মেললেন, বুঝতে পারলেন না তিনি কোথায়। শুধু তাঁর মনে হলো, কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেছে; তারপরই সব মনে পড়ে গেল, চমকে জেগে উঠলেন, কপালের ওপর থেকে চুলগুলো সরালেন, খসে পড়া বেগি বাঁধলেন, ফের খুলে ফেললেন এবং অভ্যাসবশত আবার বেঁধে নিলেন। সোফায় তিনি শুয়ে ছিলেন বিদঘুটেভাবে। ঘরের চারপাশে চোখ ঘুরিয়ে তিনি আগের রাতের লগুভও অবস্থা দেখতে পেলেন—রক্তমাখা ব্যান্ডেজ, প্লাস্টার ও কাঠের গুঁড়ো—আর তাঁর সারা শরীরে ক্লান্তির রেশ।

মেজরকে মিঠুনের শোবার ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রেহানা যখন তাঁর কাছে গেলেন, দেখলেন লেসের পর্দা টানা রয়েছে, ভোরের আলোয় পর্দার ফুলের নকশা ছায়া ফেলেছে মেজরের মুখের ওপর। সেখানে, ওর কপালে তারার মতো একটা ফুল। আর গোটা উরু বরাবর এক সারি কাটা দাগ। নিঃশব্দে ঘুমিয়েছেন তিনি, নিথর কিন্তু তাঁর প্রতিটা অঙ্গভীর নিশ্বাসের সঙ্গে লেসের ছায়াগুলো মৃদু কাঁপছে।

ঘুমন্ত মেজরকে বিশালদেহী মনে হচ্ছে। তাঁর হাত পা খাটের বাইরে উপচে পড়ছে, বাহু দুটো মাকড়সার জালের মতো ছড়ানো। অঙ্গুলি আলের রেখা ফুটতেই ডাক্তার চলে গেলেন, বলে গেলেন মেজরের অবস্থা এখন অনেকটাই আশঙ্কামুক্ত। ডাক্তার কথা দিয়ে গেছেন যে পরদিন ওষুধ-ব্যান্ডেজ সঙ্গে নিয়ে আসবেন। ‘প্রথম রাতটাই যা ভয়ের,’ ডাক্তার বলেছিলেন, ‘আপনাকে এখানেই থাকতে হবে।’

তাই রেহানা এখনো এখানে।

রাতের মধ্যে ওর চেহারা যখন কোনো উন্নতি হয়নি। মুখে কাটা দাগ রক্ষ ও ফ্রুন্দ

ভাঁজ হয়ে আছে। বাম চোখের ভুরুর প্রান্ত থেকে শুরু হয়ে সেটি ঐক্যবৈক্যে এসে ঠেকেছে ওপরের ঠোঁটের খাঁজে। মুখের অন্য পাশে একটা নীলচে ক্ষত। ব্যান্ডেজবাঁধা পা ছাড়া ওর শরীরের বাকি অংশ অদ্ভুতভাবে অক্ষত, স্বাস্থ্যবান। ভোরের নিশ্প্রভ আলোয় তাঁর গলা ও বাহুর ত্বক উজ্জ্বল।

মানুষটির দিকে তাকিয়ে রেহানা তাঁর বলিষ্ঠ অস্তিত্বে এক ধরনের গর্ব বোধ করেন; মনে হয় তিনি এক পতিত দেবদূত, অসুন্দর ও ক্লিষ্ট তবে এখনো খানিক আশীর্বাদধন্য।

হঠাৎ রেহানার খিদে বোধ হয়; তাঁর মনে নেই কখন শেষবারের মতো কিছু খেয়েছেন। লিচু খেতে মন চাইল, চীন থেকে আসা শুকনো লিচু নয়, বরং এখানকার রসে টাইটমুর লিচু, মুখে দিতেই যা গলে যায়। লিচুর ভাবনায় তাঁর অন্য খাবারের তাগিদও জেগে উঠল; কিছু মাংস কেনা যায়, অল্প পরিমাণ ভালো চাল। তিনি নিউমার্কেট যাবেন। বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল, বাড়ির বাইরে, আগের রাতের তোলপাড় এড়িয়ে বাইরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল তাঁর ভেতর।

মেঘমুক্ত উজ্জ্বল দিন, এমন দিন যখন আকাশ শ্বাস বন্ধ করে থাকে আর চরাচরের সমস্ত কিছু স্থির, নিপাট ঝকঝকে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে বাজারের যা হাল, এখনও ঠিক তাই : প্রতি সপ্তাহে একটি বা দুটি দোকান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সবজিগুলো ধুলোয় ভরা ও তোবড়ানো, নিশ্প্রভ চোখের ছোট ছোট মাছ। কিন্তু রেহানা বিক্রেতার সঙ্গে দরকষাকষি আর হঠাৎ পাওয়া রত্নের সম্ভাবনায় চঞ্চল বোধ করেন; একটা টগবগে মোরগ অথবা শেষ-মৌসুমের পেঁপে।

বাজারে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আনন্দ উবে গেল। দোকানপাট আর ফেরিওয়ালাদের মধ্যে যত্রতত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে আর্মির উর্দি। ওরা বাজারে পায়চারি করছে রাইফেলগুলো অবহেলায় কাঁধে ঝুলিয়ে। মিষ্টির দোকানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রেহানা দেখলেন ওদের একটা দল প্লাস্টিকের টেবিল ঘিরে বসে আছে, মুখ এত বড় হাঁ করে হাসছে যে রেহানা দূর থেকেও ওদের দাঁতের ফাঁকের কণা পর্যন্ত দেখে ফেললেন। ওদের মধ্যে একজন শব্দ করে থুতু ফেলল নর্দমায়।

মাথা নিচু করে হাঁটতে থাকলেন রেহানা, চেষ্টা করলেন কারও চোখে না পড়তে। নিজের ভীতিতে নিজের ওপর বিরক্ত হলেন, বিশেষ করে এখানে, যে স্থান তাঁর দশ বছরের সংগ্রামের সাক্ষী। এখান থেকেই তার বাচ্চাদের স্কুল-পোশাকের কাপড় কেনা হতো; এখানে তিনি সপ্তাহের বরাদ্দ হিসাব করে কবে কী রান্না হবে মনে মনে তা স্থির করতেন। এখান থেকেই ইকবাল তাঁর বিয়ের শাড়ি কিনতেন—মাত্র বাইশ রূপিতে, তিনি স্বীকার করেছিলেন; ঈদের বাজার

করার জন্য, বিয়ের উপহার কেনার জন্য, বাচ্চাদের জন্মদিনের কাপড় কিনতে তিনি এখানেই আসতেন। রেহানার কাছে নিউমার্কেট শহরের প্রাণকেন্দ্র, এর গন্ধ আর অলিগলি তাঁর নিজের জায়গা ধানমণ্ডির মতোই চেনা। এখন অকস্মাৎ জায়গাটা অচেনা লাগল, অমঙ্গলের আভাসে বাতাস ভারি।

‘কসাইদের সঙ্গে সাবধানে কথা বলো;’ সোহেল বলেছিল, ‘ওরা উর্দুভাষী।’

‘কেন? আমিও তো উর্দুভাষী। তাতে কি?’

‘এসব লোক আর্মিদের কাছে খবর পাচার করে।’

এসব বলতে সোহেল উর্দুভাষী বিহারিদের কথা বোঝায়; গুজব আছে যে ওরা আর্মির পক্ষে কাজ করছে। সমব্যথী আর খবর পাচারকারী—শহরের এই দুই ভাগের মানুষ নিয়ে রেহানা অস্বস্তি বোধ করেন। কিন্তু সোহেল বলে, কে কি তা বুঝতে হবে, যেন জানা যায় কাকে তুমি সন্দেহ করবে আর কাকে বিশ্বাস করবে। নিজের সত্তাকেও আর বিশ্বাস করা যায় না। অথবা বন্ধুদের।

রেহানা একটা সরু গলি ধরে কসাইদের এলাকায় গেলেন। চালাগুলো এদিক-সেদিক ছড়ানো, প্রতিটায় ভেজা রক্তের মতো কাটা মাংস ঝুলিয়ে রাখা। দেখে শুনে মাংস কিনতে রেহানার সবসময় ভালো লাগে; সময় নিয়ে তিনি দেখেন সাদা মুক্তোর মতো হাড়, রুবি রঙের রক্ত, গাঢ় গারনেট শিরা-উপশিরা।

তিনি সবসময় যে কসাইয়ের কাছ থেকে মাংস কেনেন, তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ‘ভালো আছেন? কী আছে আজকে?’ জানতে চাইলেন রেহানা, চেয়ে রইলেন মাটির দিকে যাতে কসাইটা তাঁকে চিনতে না পারে।

‘মেমসাহেব, আজকে খুব ভালো চাপের গোশত আছে। খাসির গোশতও ভালো।’

মেজরের কথা মনে পড়ে গেল রেহানার, তাঁর সেলাই-করা ফুলে-ওঠা গাল। ‘হাড্ডি দাও, স্যুপ বানাব।’

‘স্যুপ খাবেন? ঠিক আছে।’

অসম্ভব গরম। রেহানা দেখলেন, কাটা মাংসের খণ্ডগুলো ঘিরে উড়ছে মাছির ঝাঁক; ভনভন শব্দ বাজারের নিচু ছাদের কারণে আরও জোরে শোনা যাচ্ছে। তিনি দেখলেন, কসাই হাত বাড়িয়ে বিশাল এক টুকরো মাংস পেড়ে আনল তাঁর মন গলানোর আশায়। টুকরোটা একটা ছোট গরুর পুরো এক পাশ, হাড়গুলো দাঁতের মতো সারি বেঁধে বেঁকে বেরিয়ে আছে, মাংস পরিপাটি করে চিরে কাটা যাতে ভেতরের জমাট বেগুনি রক্ত আলোতে প্রতিফলিত হয়। রক্তের ধাতব গন্ধ রেহানার ওপর চড়াও হলো। তিনি কেঁপে উঠে ফিরে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে কসাই তাঁকে চিনে ফেলল।

রেহানার মনে পড়ল কেন তিনি এই লোকের কাছ থেকে সবসময় মাংস কেনেন। লোকটার পরনের কাপড় পরিপাটি থাকে; ওর জামায় বা হাতে কখনো রক্ত লেগে থাকে না। সে ধবধবে সাদা কোর্তা আর একটা টুপি পরে, এমন ভাব

যেন সে মসজিদে যাওয়ার জন্য তৈরি ।

‘কেমন আছেন, বহেনজি?’ উর্দুতে জিজ্ঞেস করল আর রেহানার থতমত ভাব তার চোখে পড়ল ।

‘হ্যাঁ, ভালো,’ রেহানা শান্তভাবে উত্তর দিলেন । আর তারপর কিছু না ভেবেই বললেন, ‘যুদ্ধ চলছে ।’

‘জানি ।’

রেহানা চুপ করে রইলেন; আর তাতে মনে হলো তিনি যেন তাকে কোনো কিছু নিয়ে অভিযুক্ত করছেন, যার জন্য তাকে বলতে হলো, ‘বহেনজি, আমি কোনো দিকে না ।’ কিন্তু তার কথাগুলো ফাঁকা শোনাল, আর রেহানা উপলব্ধি করলেন এই ভাষা হঠাৎ করে কত অদ্ভুত শোনাচ্ছে; আগ্রাসী, উস্কানিমূলক । মনে হলো, এই ভাষা এখন তাঁর শত্রুর ভাষা; তাঁর আর সোহেলের আর মেজরের । রেহানা অন্য কিছু অনুভব করার চেষ্টা করলেন, প্রিয় কবিদের জন্য কোমল অনুভূতি, এই লোকটার জন্য কিছু সমবেদনা—হাজার হোক বেচারী তো নিছক এক মাংস-বিক্রেতা ।

‘এইটা নেন,’ সে মাংসের চর্বি ছাড়াতে ছাড়াতে বলল । রেহানা দেখতে পেলেন লোকটা তাঁকে ভয় পাচ্ছে, তিনি খুশি হলেন, আর পরক্ষণেই খুশি হওয়ার জন্য লজ্জিত বোধ করলেন । তিনি দ্রুত পাঁচ রুপি বের করে দিয়ে ফিরে চললেন, মাথার ওপর আকস্মিকভাবে জড়ো হওয়া মাছিগুলো হাত দিয়ে তাড়াতে তাড়াতে ।

রেহানা বাড়ি ফিরে দেখলেন, মেজর ঘুম থেকে উঠেছেন । একনজর দেখেই বুঝতে পারলেন, মেজর ভালো বোধ করছেন না । রেহানা যখন ঢুকলেন তিনি মাথা ফেরালেন না, কেবল চোখের পাতা কয়েকবার ফেলে মুখ খোলার চেষ্টা করলেন; তাঁর চোখ দুটো কালো মুক্তোর মতো । রেহানা পাখা ছাড়লেন, মেজরের কপালের ওপর জমে থাকা বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছে দিলেন । ওর পানি দরকার । তিনি বাইরে গিয়ে মায়ার খোঁজ করলেন, দেখলেন মায়া ভুরু কুঁচকে বইয়ের মার্জিনে পড়া-যায়-না এমন ছোট ছোট অক্ষরে কী সব লিখছে ।

‘কী করছ তুমি?’

‘চে গুয়েভারা স্পিকস পড়ছি,’ বইয়ের মলাটটা দেখিয়ে সে বলল ।

‘তোমাকে তো আমি মেজরের দেখভাল করতে বলে গেলাম ।’

‘তিনি ঘুমাচ্ছেন ।’

‘না, তিনি জেগে আছেন ।’

‘ভালো, তাহলে তুমি এখন দেখে রাখো ।’ সে আবার তার বইয়ে ফিরে গেল ।

‘তুমি ওকে পছন্দ কর না?’

‘কেন করব না?’ না তাকিয়ে আধো উচ্চারণে বলল মায়া। ‘উনি আমাদের জন্য যুদ্ধ করছেন।’

রেহানা আরো নিবিড়ভাবে তাকালেন মেয়ের দিকে, এমন একটা কিছু খোঁজার চেষ্টা করলেন মেয়ের চোখেমুখে যা হয়তো তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে—কতবার এটা করতে হবে তাঁকে? আগের রাতের শঙ্কা বা ত্রাসের লেশমাত্র নেই ওর চেহারায়ে।

বৃষ্টি শুরু হলো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রেহানা মেজরের জন্য এক গ্লাস পানি নিলেন, প্লাস্টিকের টুকরো দিয়ে মাথা ঢেকে বাগান পার হয়ে সোনায় গেলেন। মেজর যখন পানি খেলেন, রেহানা লক্ষ্য করলেন, তাঁর ঠোঁটজোড়া শরীরের বাকি অংশের মতো বেহাল নয়। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মেজর তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন। আর রেহানা ওকে দেখলেন, মনে হলো মেজর যেন রেহানার দিকে অকপটে তাকাতে পারছেন না।

সন্ধ্যার পর জয় এলো। বুকো হাত ঘষে বলল, ‘আপনার সঙ্গে একটু কথা বলা দরকার আন্টি। ব্যাপার হলো, পাক আর্মির ধারণা মেজর মারা গেছে। ভবনটা ওরা মেজরের ওপরেই ভেঙে পড়তে দেখেছে; তাই ওর বেঁচে থাকার কোনো সম্ভাবনাই নাই।’ সে ঘরের চারপাশে তাকাল, রেহানার সঙ্গে চোখাচোখি এড়াল। ‘ওদের এই ধারণাকে আমরা কাজে লাগাতে চাই।’

‘কী করবে তোমরা?’

‘আপনার আপত্তি না থাকলে সুস্থ হয়ে ওঠা পর্যন্ত মেজর এখানেই থাকুন।’

মেজরের পায়ের যা অবস্থা তাতে সম্পূর্ণ সুস্থ হতে কয়েক সপ্তাহ এমনকি কয়েক মাসও লাগতে পারে। ‘আমি তো ভেবেছিলাম, ব্যবস্থাটা মাত্র কয়েক দিনের জন্য হবে।’

‘আমরা ওকে সরিয়ে নিতে পারি,’ জয় বলল। ‘কিন্তু যেহেতু তিনি এখানে লুকিয়ে আছেন, বাকি সময়টাও এখানে থাকলে ভালো হয়।’

এ আবার কিসের মধ্যে পড়লেন রেহানা। ‘কত দিন?’ তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

‘হয়তো এক মাস। এখান থেকেই উনি আমাদের নির্দেশ পাঠাতে পারবেন—আমার মাধ্যমে। আমি আসা-যাওয়ার মধ্যে থাকব।’

‘আর সোহেল কী করবে?’

জয় আবারও বুক ঘষতে লাগল। ওর আঙুলের নখে ময়লা জমে কালো হয়ে আছে। ‘এটাই হলো ব্যাপার। আসলে, ওর পক্ষে এখানে ঘন ঘন আসা খুব বিপজ্জনক। ওর জন্য অন্য কোনো জায়গা খুঁজতে হবে।’

‘তোমার সঙ্গে ও এখানে থাকতে পারে না?’

‘সেটা করলে সবার জন্যই বিপদ। আপনি, মেজর, মায়া। আর ওকে এমনিতেই বেশির ভাগ সময় আগরতলাতেই থাকতে হবে।’

রেহানা হাল ছেড়ে দিলেন। ‘যা করার করো, বেটা।’

ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যে, সোহেলের দেখা পাওয়ার জন্য রেহানাকে বেশি দিন অপেক্ষা করতে হলো না। কিছুদিন বাদে ঠিক দুপুরের খাবারের পরে তিনি একটা টেলিগ্রাম পেলেন, আর বাকি দিনটা অপেক্ষায় কাটিয়ে দিলেন সোফার হাতায় মাথা রেখে। তিনি জানেন সোহেল আসবে; তাকে এসব কিছুর মধ্যে একা ছেড়ে দেবেন না তিনি। সারা দুপুর তিনি মায়ার টাইপরাইটারের খটখট শব্দ শুনলেন; মেয়েটির কাজ আরও দ্রুত আরও বেগবান হয়েছে।

সন্ধ্যার মধ্যেই ওকে দরজায় দেখা গেল। ওর গায়ে বাজারের কসাই লোকটার মতো একটা সাদা কোর্তা, অবশ্য টুপিটা সবুজ রঙের আর সামনে ধাতব লাল তারা আঠা দিয়ে সাঁটা।

মায়া ড্রয়িং রুমে এসে দেখল ওর ভাই বাগানের দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

‘ভাইয়া, এখানে কোথা থেকে? কী করছ?’

সোহেল মায়ার দিকে এগিয়ে গেল, দু’হাতে কাছে টেনে নিল ওকে। তারপর বলল, ‘শারমিন ঢাকায়।’

‘কী? তুমি কীভাবে জান?’

‘আমি জানি।’ একটু থেমে আবার বলল, ‘ও ক্যান্টনমেন্টে, মায়া। হাসপাতালে।’

‘চলো তাহলে।’

কেউ নড়ল না।

‘ওখানে বসে আছ কেন? চলো!’ মায়া বলল। ‘শারমিন নিশ্চয়ই অসুস্থ। ওখানে ও কীভাবে গেল? আচ্ছা, আচ্ছা, সবকিছু তুমি আমাকে পরে বলতে পারবে।’ দাঁত বেরিয়ে এলো—একটু নীলচে ভাব, মেঘের প্রান্তের মতো। মায়া যদি ভাইয়ের নতমাথা লক্ষ্যও করে থাকে, পাত্তা দিল না, চুল্লীর সিঁথি ঠিক করে ঘরের স্যান্ডেল বদলে চট করে বাইরেরটা পরে নিল।

‘গো গো—চলো চলো,’ ও বলল। যখন কিছু নিয়ে ঘাটতে যায় বা তাড়াহুড়োয় থাকে তখন এ রকম বাংলা-ইংরেজি খিচুড়ি করে ফেলল।

‘ও মারা গেছে,’ সোহেল অবশেষে বলল। মুষ ও গাঢ় হয়ে ওঠা ওর দাড়ি এখন কালো বাতির মতোন দেখাচ্ছে, যেন প্রতিফলিত করছে ওর দ্রুত গাঢ়তা ও ত্বকের মলিন আভা।

মায়া এক দৌড়ে বেরিয়ে গেল বাগানে এবং জানালা দিয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলা শুরু করল।

‘ও যদি মারাই যায় তাহলে ও হাসপাতালে থাকবে কেন?’ নিজেকেই শোনানোর জন্য ওর চিৎকার করতে হয়।

‘ও ওখানেই ছিল, মায়া। ওখানেই ছিল বরাবর।’

‘কী? আর সেটা তুমি জানতে?’

‘হ্যাঁ। কিন্তু তোমাকে বলার কোনো মানে ছিল না। আমরা কিছুই করতে পারতাম না।’

‘কেন? কেন আমাকে বল নাই? আমি ওখান থেকে ওকে নিজে গিয়ে বের করে আনতাম।’ তারপর, যেন হঠাৎ করেই একটা ধাক্কা লাগল, উপলব্ধি করল ও যা কল্পনা করেছে বাস্তব তার চেয়ে আরও অনেক কদর্য। খোলা জানালার ভেতর দিয়ে মেয়েটাকে দেখে রেহানা বোঝেন, মায়া সারা জীবন মনে রাখবে ওর ভাই খবরটা কোথায় ওকে দিয়েছিল; আমগাছের ছায়ার নিচে, বাতাসে এক ধরনের অধীরতা, বৃষ্টির ঠিক পরে যে রকম হয়, আকাশ ঘন কালো যেন রাত নেমেছে, রাতই হতে পারত, কিন্তু রাত নয়, আর বেলি ফুল ও বোগেনভেলিয়ার ফ্যাকাশে আভা, গন্ধে বিভোর; মেজর ঘুমাচ্ছেন অথবা মারা গেছেন, সোনার কোনো এক কোনায়।

তারপর সোহেল মায়াকে সব বলল।

‘শারমিন হাসপাতালে মারা যায়।’ সোহেল বাইরে গিয়ে ওকে সান্ত্বনা দিতে পারতো, কিন্তু মায়া জানালার খিল শক্তভাবে ধরে ভয়ঙ্কর চোখে তাকিয়ে ভাইকে এক জায়গায় আটকে রাখল।

‘ও অন্তঃসত্ত্বা ছিল।’

‘অন্তঃসত্ত্বা?’

মায়া মুখ ফিরিয়ে গাছের গুঁড়িতে লাথি দিল। ‘ও ছেলেদের সহ্য করতে পারত না। ওদের ঘৃণা করত। সবাই কোনো না কোনোভাবে মিলিত হয়েছে। সে কখনো নয়। তাহলে কীভাবে, কীভাবে সম্ভব?’ রেহানা ভাবলেন মায়াকে থামতে বলবেন, কিন্তু স্রেফ তাকিয়ে রইলেন, মেয়ের গাল বেয়ে এক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়তে দিলেন।

‘আমি ওদের নাম জানতে চাই।’

‘কাদের?’

‘যারা ওকে ধর্ষণ করেছে, হত্যা করেছে। আমি জানতে চাই।’

‘ওরা সৈনিক, মায়া। টিক্কা খানের সৈনিক।’

‘টিক্কা খান!’ মায়া চিৎকার করে উঠল, যেন ঘোষণা করেছে, ‘বাংলার কসাই!’ তারপর ও আবারও গাছটাতে লাথি মারল, উচ্চ হয়ে পেঁচানো একটা ডাল জড়িয়ে ধরল, মনে হলো ও বোধ হয় সেই ডালে দোল খাবে, কিন্তু তা না করে হাত দুটো উঁচু করে মুখটা বাকলের সঙ্গে চেপে ধরে নিথর হয়ে রইল।

সে রাতে রেহানা ইকবালকে স্বপ্নে দেখলেন। দেখলেন, ইকবাল দরজায় টোকা দিচ্ছেন। যখন বেঁচে ছিলেন তখন কখনো দরজায় টোকা দেননি।

প্রতিদিন ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে ঠিক সন্ধ্যা ছয়টায় বাসায় ফিরতেন ইকবাল। রেহানা, চোখ দেয়ালঘড়িতে রেখে, ইকবালের সান্ধ্যকালীন পানীয় নিয়ে তৈরি থাকতেন: এক গ্লাস হুইস্কি, গোড়ার দিকে পানি দিয়ে, তারপর সোডা আর শেষমেশ, কয়েক বছর পার করে, দু'টুকরো বরফ দিয়ে।

রেহানা সারা দিন ইকবালের জন্য অপেক্ষা করতেন এবং যদিও ভালো করেই জানতেন ওঁর দেরি হবে না, তবুও জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকা বা গেটের হুড়কো খুলে দেয়া বা বারান্দায় অপেক্ষা করা যাতে ও বাসায় পা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে গেটের ভেতর দিয়ে ওকে দেখতে পায়—এসব কিছুই না করে তিনি দরজার দিকে পিঠ দিয়ে চুপচাপ বসে থাকতেন আর তার হাত দুটো কোলের ওপর ভাঁজ হয়ে পড়ে থাকত। তিনি চোখ বুজে গন্ধ পেতেন—জুঁই ফুল লতা-পাতায় বেয়ে উঠছে, আর গাছের সবুজ লেবুগুলো প্রতিঘণ্টা অতিবাহনের সঙ্গে পেকে উঠছে, রসে টইটমুর হয়ে উছলে পড়ছে।

রেহানা বসে অপেক্ষা করতেন, অপেক্ষা করতেন তখনো যখন ইকবালের হাতের টানে গেটটা দুলে উঠে খুলে যেত; তাঁর পদক্ষেপ যখন কাছে এগিয়ে আসত তখনো অপেক্ষা করতেন—রেহানা জানতেন ঠিক কখন—যেই মাত্র ও হাতটা পকেট থেকে বের করে আঙুল বাঁকিয়ে টোকা দিতে যাবে, নিমেষে তিনি হুস করে ঘর ডিঙিয়ে, ছিটকিনি খুলে, দরজা হাঁ করে খুলে দিতেন—এসবই করতেন এক অনায়াস চলনে।

প্রতি সন্ধ্যায় একইরকমভাবে আর প্রতি সন্ধ্যায় রুদ্ধশ্বাস নতুন শিহরণ।

যখন রেহানা জেগে উঠতেন, তাঁর রাগ হতো। ইকবাল তাঁর কাছে ঋণী, তিনি ঋণী, কেননা রেহানা থেকে গেছেন সব ঋামেলা সামলাতে; অন্তত সবকিছু চুকাতে—অবশ্য এই চুকানো কখনো শেষ হয় না, তবে অন্তত লড়াই তো তিনি করে চলেছেন।

তিনি সারা বাড়ি ঘুরে বেড়ালেন, স্মৃতি রোমন্থনে গাল দুটো উষ্ণ হয়ে উঠলো। মায়ার বিছানা খালি। সন্ধ্যাটা রেহানা ওর সঙ্গে কাটিয়েছেন, ওকে জাউভাত খাইয়েছেন আর কপালে হাত বুলিয়ে দিয়েছেন। দু'একবার মেজাজকে গিয়ে দেখে এসেছেন। এ ছাড়া দু'বাসাই ছিল শান্ত, কেবল পাতার মর্মর আর হঠাৎ আসা বৃষ্টির চকিত আলোড়ন। সোহেল বলে, মায়াকে নিয়ে কী করা যায় সেটা ঠিক করার আগ পর্যন্ত সোনায় ব্যস্ততা একদম কমিয়ে দেবে। ওকে বাসায় রাখা আর নিরাপদ নয়; বিশেষ করে এখন শারমিনের ব্যাপারটা যেহেতু ও জানে, ও কি করে বসতে পারে কিছুই বলা যায় না।

তারপর ওরা ঘুমাতে গেল, প্রত্যাশার চেয়ে গভীর ঘুম হলো রেহানার, আর

এখন মায়ার বিছানা খালি ।

তিনি পা টিপে টিপে সারা বাড়ি খুঁজলেন, বাথরুমের দরজায় কান পাতলেন, রান্নাঘরের বেসিন খুঁটিয়ে দেখলেন । উঁকি দিয়ে বাগানে তাকালেন, দেখতে পেলেন মৃদু একটা আলো আসছে সোনা থেকে । আলোটা তাকে টানল; অন্ধকারে বিক্ষিপ্ত পায়ে তিনি বাগান পার হলেন, ঘুরঘুর করলেন জানালার কাছে, ভেতরে কেরোসিন বাতির মিটমিটি আলোয় ক্ষীণ ছায়ার আভাস দেখা গেল ।

মায়াকে দেখা গেল মেজরের ঘরে ।

মায়া মেজরের চারপাশে বৃত্তাকারে ঘুরছে । হঠাৎ সে খাটের এক কোনায় বসে চাদরটা উল্টে দিয়ে তাঁর কালো পায়ের পাতা অনাবৃত করল । রেহানা নিঃশব্দে দেখলেন; ওকে বাধা দিতে মন চাইল না । মায়া খাটের নিচে ঝুঁকল আর ওর হাত এক বালতি পানিতে তলিয়ে গেল, একটা ভেজা কাপড় উঠে এলো এবং সেটা সে আলতো করে নিঙড়াল, পানি ঝরে পড়ল বালতিতে—ঠাণ্ডা পাকা মেঝেতে খালি পায়ে হাঁটলে যে রকম শব্দ হয় সে রকম শব্দে । সে মেজরের পায়ের পাতায় কাপড়টা চেপে ধরল, প্রথমে বায়ে, পরে ডানে, এরপর দু'পা একসঙ্গে, রেহানার মনে হলো তিনি মেজরের শ্বাস টানার স্বর শুনলেন, যদিও মানুষটা নিঃসাদভাবে শুয়েছিলেন এবং তখন মায়া হঠাৎ অবিন্যস্তভাবে মাথা ঝুঁকিয়ে মেজরের পায়ের কাছে নিয়ে এলো, রেহানা দেখলেন মায়া কাঁদছে, তার চোখের জল ভিজিয়ে দিচ্ছে মেজরের গোটানো ট্রাউজার ।

মায়া যখন চোখ তুলে তাকাল, মাকে জানালায় দেখেই ও উঠে চলে গেল । বালতিটা যেখানে ছিল সেখানে পড়ে রইল, পানি ঢেউ তুলছে আর দ্যুতি ছড়াচ্ছে, উজ্জ্বল, মিটমিটে চোখে ।

রেহানার প্রথম চিন্তা হলো ওকে কোথাও পাঠিয়ে দিতে হবে । এ রকম চিন্তার জন্য অপরাধ বোধ হলো; তিনি বিশ্বাস করতে চাইলেন মেয়ের কাছাকাছি তার থাকা উচিত । অথবা মায়ের সঙ্গে যাওয়া উচিত, সে যেখানেই হোক । কিন্তু সোহেলকে ফেলে তিনি কোথাও যেতে পারবেন না, সোনাকে ফেলে যাবেন না, মেজরকে, জয়কে ফেলে যাবেন না । এটা এমন না যে তিনি এটাই করতে চান; যদিও পুরো ব্যাপারটা মাঝে মধ্যে একটা দুর্ঘটনার মতো মনে হয়, তিনি আসলে আটকে গেছেন; তিনি এখন কোথাও যেতে পারবেন না । তবে মায়াকে যেতেই হবে । মায়াকে খালাদের কাছে করাচিতে পাঠানোর কথা প্রথমে ভেবে দেখলেন রেহানা, তারপর ঝেড়ে ফেললেন সেই ভাবনা; এটা ওকে আরও ধিকিধিকি করে পোড়াবে, আর এমনিতেও ঝেঁপেরা এই যুদ্ধকে কীভাবে নিয়েছে সে সম্পর্কে রেহানার কোনো ধারণা নেই । যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ওরা তাকে আর কোনো চিঠি লেখেনি, আর যখন তিনি ডাকপিয়নের ওপর এর দোষ চাপাতে চেয়েছেন, তখন তিনি ঠিকই বুঝতে পারেন, গোপনে ওরা তাঁকে অবজ্ঞা করছে,

মনে মনে ওর নাম দিয়েছে গাদ্দার, বিশ্বাসঘাতক।

অবশেষে মায়াই ব্যাপারটা সহজ করে দিল। পরদিন দুপুরবেলা ও মায়ের কাছে গেল, চোখ দুটো কচলে টকটকে লাল করে।

‘আমি কলকাতা যাচ্ছি। আমি ভাইয়ার সঙ্গে সব ঠিক করেছি।’

রেহানা ভেবে পেলেন না কী বলবেন; কত কিছু তিনি মায়ার জন্য জমা করে রেখেছেন—ভালোবাসার কথা, সমবেদনার কথা, ওকে যতটা ভালোবাসা উচিত ততটা ভালোবাসতে পারেননি সেটা জানার কষ্ট, অনুতাপ—এসব ভাবনা তার মনোযোগ পাওয়ার জন্য ছেকে ধরল।

রেহানার নিস্তব্ধতাকে মায়া ভুল বুঝল। ‘প্লিজ, রাগ কোরো না,’ ও বলল। ‘আমি চাই না তুমি রাগ কর।’

‘না মা, আমি রাগ করিনি, আমার মন খারাপ লাগছে।’

‘আমি তোমাকে একা ফেলে রেখে যেতে চাই না।’

‘ঠিক আছে।’ মেয়ের দিকে তাকিয়ে হাসলেন রেহানা। ‘আমাকে নিয়ে তুমি চিন্তা কোরো না।’

‘শারমিনকে আমি কী যে ভালোবাসতাম!’ মায়া বলল। চেষ্টা করল কান্না রোধ করতে। ওর থুতনি কাঁপছে আর ও থেকে থেকে ঢোক গিলছে, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরছে। ‘আমাকে কিছু একটা করতেই হবে। এ তো বড় অন্যায় মা, এ তো বড় অন্যায়।’

রেহানা মাথা নাড়লেন।

মায়া দূরে তাকিয়ে রইল, অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না। ‘খবরের কাগজে কাজ করার লোক দরকার ওদের,’ শেষে বলল। ওর গলা থেকে যন্ত্রণা চলে গেছে। ‘ভাইয়া সদর দপ্তরে একজনকে চেনে। এমনকি আমি হয়তো মুক্তাঞ্চলেও যেতে পারব।’

‘সাবধানে থেকো। তোমাকে নিয়ে আমি দুশ্চিন্তায় ভুগব। তোমাকে নিয়ে আমার সবসময় চিন্তা হয়।’

‘তোমাকে নিয়ে আমার সবসময় চিন্তা হয়!’

রেহানা কথাগুলো শুনে আশ্চর্য হলেন, কিন্তু উপলব্ধি করলেন এগুলো নিশ্চয়ই সত্য, আর এই তো দেখা মিলল সেই বস্তুর, যা এত দিন ধরে খুঁজেছেন, মেয়ের অপরূপ হৃদয়ে একটা ছোট্ট কপাট। এমন নয় যে ও একরোখা, ও আসলে বেদনার ভারে ক্লিষ্ট। প্রিয়জনের জন্য, যে হারিয়ে গেছে তার জন্য, আর নিজের বিধবা মায়ের জন্য। রেহানা মায়াকে জড়িয়ে ধরলেন: এখনো কত হালকা আর ভঙ্গুর মেয়েটি! মেয়েকে সাবধানে থাকতে বলার বদলে রেহানা নিজেকে বলতে শুনলেন, ‘কিছু ভালো কাহিনী লিখো।’

জুন



আই লাভস ইউ, পরগি



জুন মাস জুড়ে, টিক্কা খানের সৈন্যরা এগিয়ে যেতে থাকল বাংলাদেশের রৌদ্রতপ্ত সমভূমির ওপর দিয়ে। যাওয়ার পথে তারা ভিটেবাড়ি, বসতবাড়ি লুট করল, জ্বালিয়ে দিল ঘরের চালা। তারা ধর্ষণ করল। হত্যা করল। মানুষদের লাইন ধরে দাঁড় করিয়ে গুলি করে ফেলে দিতে লাগল পুকুরে। অত্যাচারের নতুন নতুন কায়দা বের করতে থাকল তারা, হয়ে উঠলো নিষ্ঠুরতার পথিকৃৎ, প্রতিদিন নিজেদের নৃশংসতার মাত্রা নিজেরাই ছাপিয়ে যাচ্ছে, প্রতিদিন নিজেদের অনুভব করছে বেহেশতের আরো কাছে এগিয়ে যাওয়া, কারণ তাদের বলা হয়েছে তারা পাকিস্তানকে রক্ষা করছে, ইসলামকে রক্ষা করছে, এমনকি হয়তো-বা স্বয়ং পরম করুণাময়কেই, বাঙালিদের অনাচারের হাত থেকে; মঙ্গলময় এই ধর্মযাত্রায় তাদের সংকল্প কোনো বাধা মানছে না।

বাঙালিদের প্রতিরোধ সেই তুলনায় দুর্বল আর বিক্ষিপ্ত। স্বৈজর জিয়া নির্ভর করছিলেন তাঁর সৈন্যদের তারুণ্যদীপ্ত চেতনার ওপর, এখানে-সেখানে ছোটখাটো বিজয় যারা অর্জন করে চলেছে। এখানে একটা সেতু উড়িয়ে দিচ্ছে, তো ওখানে একটা আর্মির বহরে চালাচ্ছে অতর্কিত হামলা কোথাও দখল করছে রেলওয়ে স্টেশন। আর এসব ছোট ছোট বিজয়ে রেডিওতে ধ্বনিত হচ্ছে উল্লাস, তাই নিয়েই ঘরে ঘরে শ্রোতাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে আনন্দ, ট্রানজিস্টার রেডিও

আঁকড়ে ধরে গরমের দীর্ঘ বিকেলগুলো পার করছে শহরবাসীরা ।

মেজরের থাকতে শুরু করা আর মায়ার কলকাতা চলে যাওয়ার পর থেকে রেহানার পৃথিবী ক্রমশ ছোট হয়ে এলো । তাকে বলা হয়েছে, বাসা থেকে খুব একটা বের-টের না হতে, কিছু দরকার পড়লে এনে দেয়া হচ্ছে । বাজারে গেলে মিসেস চৌধুরীর গাড়ি নিয়ে যেতে হবে, শুধু নিজের জন্য যতটুকু লাগে ততটুকুই খাবার কিনতে হবে । মাঝে মাঝে তাকে যেতে হবে পড়শিদের সঙ্গে দেখা করতে; সেখানে গিয়ে একটা উদ্ভিগ্ন ভাব দেখাতে হবে, যুদ্ধের প্রসঙ্গ উঠলে কথা বলতে হবে খুব গা বাঁচিয়ে । সবাই বলে দিল, কেউ তাকে সোহেল আর মায়ার কথা জিজ্ঞেস করলে তাকে বলতে হবে যে, তাদেরকে করাচিতে তাঁর বোনের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে ।

সোনায় সাড়াশব্দ খুব একটা নেই । মেজরকে দেখাশোনার জন্য জয় কখনো-সখনো আসে, আর ডাক্তার আসা-যাওয়ার মধ্যে আছে, এছাড়া সোনায় জনমনিষ্যির আনাগোনা নেই বললেই চলে । এখন তারা মাত্র তিনজন : রেহানা, আর অন্য বাসাটায় দু'জন মানুষ । কেরোসিনের আলো জ্বালিয়ে রেখে তিনি রাতগুলো পার করে দেন । প্রতিটা শব্দ তার বুকের মধ্যে হাতুড়ির তীব্র ঘা দেয় । মনে হয় যেন পায়ের শব্দ শুনলেন, দরজায় হালকা টোকা; মনে হয় কেউ যেন ঘুমের মধ্যে তার পা ধরে টানছে । মেজর আছেন পাশের বাসায়, কিন্তু তাতে মন আশ্বস্ত হয় না, সেই উপস্থিতি বরং রেহানার মধ্যে অরক্ষিত বোধ সঞ্চার করে ।

কোনো কোনো দিন যখন উদ্বেগ তাঁকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়, রেহানা তখন চেষ্টা করেন অতীতের কম দুশ্চিন্তাময় দিনগুলোর কথা স্মরণ করতে, যখন মনে রাখার মতো কিছুই ঘটত না, মৌসুম বদলানো, ঈদের চাঁদ দেখার উত্তেজনা, গাছে গাছে আম পাকার গন্ধ—এসবই ছিল বছরের সাড়াজাগানো ঘটনা । তাদের দু'জনার জীবন অবশ্য কখনোই সাজানো-গোছানো ছিল না—অন্তত রেহানা এখন স্মৃতি হাতড়ে যে রকমটা খোঁজার চেষ্টা করছেন সে রকমটা তো নয়ই, সবসময় কিছু না কিছু হচ্ছেই, কোনো হইচই, শহরে বা শহরের বাইরে, ইসলামাবাদে, যেখানে একটার পর একটা শাস্তিমূলক আইন পাস হচ্ছে, এমনকি আরও দূরে—চে গুয়েভারার মৃত্যু, যার জন্য সোহেল এমন শোক করল যেন ও ওর ভাইকে হারিয়েছে । রাজনৈতিক অঙ্গনের প্রতিটা তরঙ্গ তাঁদের দরজা পর্যন্ত এসে পৌঁছাত, আর যখন তার ছেলে একটু বড় হলো, ঘরের দরজা পেরিয়ে সেগুলো ঢুকে পড়ল তাদের বাড়িটায়, আঁকা হয়ে গেল ছেলের গম্ভীর মুখে, ঘরের চৌকাঠ আর খাবার টেবিলের ওপর সোহেলের যে ছায়া পড়ে তাতেও; তারপর সেগুলো মায়ার ভেতরও ঢুকল, সে আরও ক্রুদ্ধ আরও সরব । না, অন্য রকম সময় বলে কিছু কখনো ছিল না; তাদের জীবন লেনিন আর কাস্তো আর মুজিব আর

আনোয়ার সাদাত দিয়ে ঠাসাঠাসি, গাদাগাদি; শুধু এ রকম সময়, এ রকম জীবন, এ রকম বিপদসঙ্কুল আর ভিড়ে চিড়েচ্যাপটা সময়, যেখানে তারা কিছুই না জেনে-বুঝে উপায়হীন বন্দি, শুধু তাদের আবেগ, তাদের ভালোবাসা, তাদের এগিয়ে নিতে আর বাঁচিয়ে রাখতে ব্যতিব্যস্ত।

এ ব্যাপারে অন্য যে কোনো ব্যাপারের মতোই রেহানা আশকারা আর তিরস্কারের দোটানায় পড়ে যেতেন। তার এক অংশ বাচ্চাদের যা খুশি করার অনুমতি দিতে চাইত—যে কোনো খামখেয়ালিপনা, যে কোনো আগ্রহ, যে কোনো আতিশয্য। আর অন্য অংশ বাচ্চাদের এসবের কিছুই করতে দিতে চাইত না, ওদের নিরাপদে রাখার জন্য, বাসায় রাখার জন্য: এই দুই অংশই সোহেল আর মায়াকে এমনভাবে লালন করেছে যেন ওরা দু'জন এখানে তার কাছে আছে কোনো পুরোনো ঋণের শোধ তুলতে, কোনো পুরোনো প্রতিজ্ঞা, যা কোনো দিন পূরণ হওয়ার নয়, অন্তত এই জীবদ্দশায় না; এক আলস্যভরা, চক্রাকার, অফুরন্ত দায়। এই দায় ওদের, নাকি তার, তিনি জানেন না।

বহু বছর পর প্রথমবারের মতো নিজেকে এই বাড়িতে একা আবিষ্কার করে রেহানা লক্ষ্য করলেন, সেলাইয়ের দলকে আবার ডেকে আনার কোনো ইচ্ছা তার হচ্ছে না। তিনি তাঁর বান্ধবীদের সঙ্গে আর অর্থহীন হাসি হাসতে চান না; ফাঁকা বাড়িতে বিষণ্ণতা ঘাঁটতেই মন চায় তাঁর, গভীর দুঃখবোধ, যা এক ধরনের শাস্ত, নিখরভাব, সেটা ছেড়ে দিতে মন চায় না।

অনেক বছর আগে যখন বাচ্চারা লাহোর চলে গেছে, তখন একাকী থাকার যেসব রীতি তিনি নিজের ভেতর গড়ে নিয়েছিলেন, এবার সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করতে তাঁর একপ্রকার ভালোই লাগছে। বাড়িটা ঘষেমেজে হাসপাতালের মতো ঝকঝকে করে ফেলেন তিনি, আচারের বয়ামের কাছ থেকে কাকগুলোকে তাড়ান, গামলার পানিতে অযথা দীর্ঘ গোসল সারেন, বাগানের বেশ বড় একটা অংশের মাটি খুঁড়ে সেখানে মিষ্টিকুমড়া, লাউ, হিবিসকাস, জুঁই ফুলের চারা লাগান।

প্রতিদিন কলে পানি আসে বেলা দশটা থেকে বারোটোর মধ্যে। প্রতি সকালে তিনি বিরিয়ানি রান্নার হাঁড়ি আর তিনটা বালতিতে পানি ভরেন এবং কাপড় ভেজান, সবজি ধোয়াধুয়ি করেন, মাছ জিয়ল রাখেন।

কবরস্থানে গিয়ে ইকবালকে বলেন মেজরের কক্ষ। ওখানে গিয়ে তার ক্ষমা চাইতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু সেটা কিসের জন্য তিনি নিশ্চিত নন। আসলে কিসের জন্য, সেটা বোঝা পানির মতো সহজ ছিল।

তোমার এটা ভালো লাগবে না।

ইকবালের সমাধিফলক চিরে চলেছে পিঁপড়ার একটা সারি।

আমাকে মাফ করে দাও; প্রায় এক মাস আমি আসিনি। তোমার কবরের

ফুলগুলো গরমে কুঁকড়ে গেছে; ওই বদমাশ দারোয়ান কথা দিয়েছিল গাছে পানি দেবে, বোঝাই যাচ্ছে সে দেয়নি, যদিও আমি গতবার এসে বাড়তি পাঁচ আনা পয়সা ওকে দিয়েছি।

আমি এমন এক লোককে বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছি, যাকে আমি চিনি না আর যাঁর জন্য আমরা সবাই ভীষণ বিপদে পড়তে পারি। না, তুমি এটা পছন্দ করবে না।

তুমি যদি অনুযোগ করতে চাও, তাহলে তোমার ছেলের কাছে তা করা উচিত, সে ওই লোকটাকে বাড়িতে এনেছে আর আমাকে অনুরোধ করেছে আমি যেন তাঁকে আশ্রয় দিই। আমি কি না বলতে পারতাম? না, আমি না বলতে পারিনি।

মেজরের দুর্ঘটনার প্রায় দুই সপ্তাহ পর, বাংলা বাড়িটার দরজায় এসে দাঁড়াল জয়। তাকে দেখে মনে হলো দৌড়ে এসেছে সে; শার্টের ঘাড়ের দিকে আর বগলের অংশে তালির মতো ভেজা টুকরো চুপসে উঠেছে। চিকচিক করছে গাল দুটো আর কপাল বেয়ে অশ্রুর মতো গড়িয়ে পড়ছে পানি।

‘আন্টি,’ কোমলভাবে বলল সে, ‘আমি কি আসতে পারি?’

‘অবশ্যই।’

একটু ইতস্তত করল জয়। ‘আমি কি ডিস্টার্ব করছি?’

রেহানা আশ্চর্য হয়ে মাথা নাড়েন। জয় মোটেও নম্র, বিনয়ী স্বভাবের ছিল না। সে সোফার কোনায় উসখুস করছে, আঙুলগুলো মুড়ে গাঁটগুলো একসঙ্গে করে ঘষছে।

দুপুরের রান্না রেহানার মাত্র শেষ হয়েছে। ‘তোমার ক্ষুধা লেগেছে?’

জয় মাথা নাড়ে। রেহানা দেখে ওর কাঁধের জায়গাটায় শার্ট টাইট হয়ে আছে। লাল আর নীল চেকের শার্ট। কলারগুলো লম্বা আর সুচালো, সোজা জুতোর দিকে তাক করা।

এই শার্ট তিনি চেনেন। এটা ও কোথায় পেল, তিনি জানতে চান। নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনো ছেলেমানুষি কারণ আছে। হয়তো ওদের দু’জনের একই রকম শার্ট। সহজ সমাধান। কিন্তু জয় ঘামছেই, বলছে না কিছু। রেহানার ভয় লাগা শুরু হয়। ‘কিছু হয়েছে?’

‘হ্যাঁ, আমি...আমাকে যেতে হবে।’

‘কোথায় যাবে?’

জয় মাথা নিচু করে, হাতের কাছাকাছি; মুখ ঘামে ভিজছে, তবু মোছার জন্য নড়ল না। ‘আমাকে আগরতলা যেতে হবে, জয় বলে, ‘কয়েক দিনের জন্য। আবার ফিরে আসব।’

‘কিছু কি ঘটেছে? সোহেলের কিছু?’

‘সোহেল?’ ও বলল। ‘না, না আন্টি, ও আগরতলায়; ভালো আছে; গতরাতে

খবর পেয়েছি।’

‘তুমি খবর পেয়েছ? বলোনি কেন?’ শার্টের কথা, খবরের কথা, ওকে কেন যেতে হবে—এই সব কথা জিজ্ঞেস করার জন্য রেহানার ভেতরটা হাঁপিয়ে ওঠে। ‘কী হয়েছে বেটা, আমাকে বলছ না কেন? নাও, এক গ্লাস পানি নাও।’ তিনি জোর করেই কোমলতা আনেন গলায়। ‘এখানে বসো তো, বসে আমাকে বলো।’

‘আমার ভাই মারা গেছে।’ ওর গলা দিগন্তজোড়া মাঠের মতো উদাসী শোনায। রেহানার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না। ‘আরেফ?’ পরক্ষণেই একটা স্বস্তির ভাব তার ভেতর দিয়ে অপরাধীর মতো বয়ে যায়। ‘তুমি কি ঠিক জানো?’

‘একটা অপারেশন ছিল,’ একইভাবে সে বলে, ‘ওদের ঘেরাও করে ফেলে। ওর বুকে গুলি করে, সঙ্গে সঙ্গেই মারা যায়।’

রেহানা এই ছেলেটার সঙ্গে তার নিজের ছেলের তুলনা করেন। ওর মুখে কিছু একটা গড়বড় আছে, ওপরের ঠোঁট পুরু, এখন ঘামে চিকচিক করছে, কঠিন, রাগী চোখগুলো। শৈশবের কোনো চিহ্ন আর ওর মুখে নেই।

লাল আর নীল চেক শার্টের হাতা দিয়ে জয় কপাল ঘষে, চুলগুলো আঙুল দিয়ে টেনে পেছনে নিয়ে যায়, ভেজা চুলগুলো কিনারে লেপ্টে রইল। ‘যুদ্ধে এ রকম হয়,’ ও বলে। ‘জানেন, আমাদের সেক্টর কমান্ডার আমাদের কী বলেন? সোহেল বলেছে আপনাকে? উনি বলেন, জীবিত গেরিলা কেউ চায় না, একজনও না।’

জীবিত গেরিলা কথাটা দিয়ে কী বোঝাতে চায় ও? জয় রেহানার দেয়া পানি খায়।

‘শুধু আরেফ না, আমরা সবাই মারা গেছি!’ গলা উঁচিয়ে বলে সে। ‘এটাই আমি বলতে চাইছি।’ ছেলেটার ভেজা মুখ কাছে বুঁকে আসে; তিনি প্রশ্নটাকে থামাতে পারেন না। ‘তুমি সোহেলের শার্ট পরে আছ কেন?’

জয় চোখ নামিয়ে নিচের দিকে তাকায়। তিনি দেখেন, ওর ঠোঁটগুলো কাঁপছে। ‘আমরা শার্ট অদলবদল করে পরি। ও পরেছে আরেফেরটা। আমি নিয়েছি ওরটা। আরেফের কাছে আমারটা।’

রেহানা খুন্তি আর দস্তানা হাতে তুলে নেন। কিছু একটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছা করছে তার।

বাগানটা দেখতে সুন্দর না, গোছালো তো নয়ই। সারিগুলো আগাছায় ভরা, রঙেরও কোনো শৃঙ্খলা নাই, বাগান জুড়ে কটকটে সাদা আর লালের আধিক্য, এটা অবশ্য রেহানার দোষ নয়। বদ্বীপের আবহাওয়াই এরকম; হালকা রং টিকতে পারে না, শুধু কটকটে রঙগুলোই থাকে, ধবধবে সাদা, টকটকে লাল, গোলাপি আর বেগুনি। আর তাই রেহানা বাধ্য হয়ে বেশি করে বেলি, রজনীগন্ধা ও লিলির চারা লাগিয়েছেন। ডালিয়া আর চন্দ্রমুখীগুলোও বেশিরভাগ সাদা, কারনেশন

আর ফুলগুলো যেন লাল সূর্যাস্তের উগ্র রূপ। সেজন্যই হলুদ গোলাপ তিনি এত ভালোবাসেন। বাগানের সব তীব্র রঙের মধ্যে এরা হচ্ছে সবচেয়ে মিষ্টি ও কোমল।

তিনি দেখেন পূর্ব দিকের দেয়ালের কিনারে আগাছার ঝাড় বেড়ে উঠছে, এই দেয়ালটাই বাংলা আর সোনাকে আলাদা করেছে। আগাছাগুলো বেগুনি ফুলে ছাওয়া, সুচালো আর যতিচিহ্নের মতো, যেন ওরা জানে ওদের সময় ধার করা। রেহানা সেগুলো দুই হাত ধরে টান দেন। ওরা নড়ে না। তিনি একটা পা দেয়ালের ওপর রেখে ঝুঁকে পড়েন আর তাঁর শরীরের সমস্ত ওজন ব্যবহার করেন। ওদের শক্ত মুঠোয় বদ্ধ করে রীতিমতো ধস্তাধস্তি লাগিয়ে দেন তিনি, টানেন, কবজি ঘুরিয়ে মোচড় দেন, অবশেষে মাটি থেকে ওপরে উঠে আসে ওগুলো। কুণ্ডলী পাকানো শিকড়গুলো বহু দূর পর্যন্ত ওদের নিশানা ছড়িয়ে রেখেছে।

আরেকটা ছেলে মারা গেল। প্রতিদিন যেমন ডাকেন তেমন করে রেহানা আবার আল্লাহকে ডাকেন, সোহেলকে রক্ষা করার জন্য। পরম করুণাময় কেন একজনকে ছেড়ে আরেকজনকে নিয়ে যান? তিনি এসব জানেন না। আগরতলায় সোহেলকে আর কলকাতায় মায়াকে তুমি ভালো রেখ। মায়্যা একবার ফোন করেছিল, ওর চলে যাওয়ার কিছুদিন পরই। বলেনি ও কোথা থেকে ফোন করেছে অথবা কোথায় আছে। ও শুধু বলেছে, ভালো আছে। চিন্তা করো না, আমি খুশি আছি।

মেজরের জন্য একটা বাঁধাধরা রুটিন বানিয়ে নিয়েছেন রেহানা: ডাক্তার আসে একদিন পরপর দুপুরের দিকে, সেলাই শুকাচ্ছে কিনা দেখে আর ওষুধ ঠিক করে দেয়। রেহানা ট্রেতে করে মেজরের জন্য খাবার রেখে চলে যান, মেজর একা খায়। তারপর তিনি তাঁকে অর্ধেকটা সাবান দেন এবং হাত ধোয়ার জন্য ডান হাতের ওপর পানি ঢালেন। দুপুরের খাওয়া শেষে মেজর একটা ছোটখাটো ঘুম দেয়। যখন জেগে ওঠে, রেহানা তাঁকে চা দেন আর দেন সন্ধ্যার ওষুধ। মেজর কথা খুব একটা বলতে পারেন না, আর থাকেনও চুপচাপ। সব সময় তিনি মাথা নেড়ে ধন্যবাদ জানান। সন্ধ্যার সময় রেহানা যখন তাঁকে বিদায় জানায়, তখন তিনি হাসেন না বা হাতও নাড়েন না। রেহানার রান্না তাঁর পছন্দ। চেটেপুটে রাখা থাকে প্লেট, অবশ্য যেদিন রেহানা মাছ দেন সেদিনটা ছাড়া। মাছ দিলে ভাতের নিচে সেটা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন তিনি ঝুঁকি খাওয়া আচারের ছিবড়ার সঙ্গে মিশিয়ে রাখেন প্লেটের এক ধারে। এ কৌশল ধারা বাঙালি, মাছ পছন্দ করে না? রেহানা আচারের পরিমাণ বাড়িয়ে দেন আর মাছের বদলে দেন ডিমের তরকারি, বাজারে যদি মুরগি পাওয়া যায় তাহলে হয়তো চেষ্টা করবেন মেজরের জন্য নিয়ে আসতে।

রেহানা ভেবেছিলেন মেজরের প্রথম কথা হয়তো হবে ‘ধন্যবাদ’ বা ‘আমি আপনার কাছে খুব কৃতজ্ঞ’ কিন্তু তার পরিবর্তে তিনি শুরু করলেন, ‘আর বেশি দিন লাগবে না’—এই বলে। রেহানা বুঝে নিলেন, ও বোঝাতে চাইছে সুস্থ হওয়ার আগেই সোনা ছেড়ে যাবে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে চলে যাবে, নিশ্চয়ই এটা বোঝাতে চায়নি। যা-ই হোক, মানুষটা আশাবাদী, রেহানা ভাবলেন। মেজরের পা এখনো ভয়ঙ্কর রকম মোচড়ানো।

ওকে শোনার জন্য রেহানার ঝুঁকে আসতে হয় আর এক হাত দিয়ে নিজের চুল পেছনে ধরে রাখতে হয় যাতে ওর মুখের ওপর চুল না পড়ে। তিনি পরে চুল বেগি করে রাখতে শুরু করেন। ওর নিশ্বাস রেহানার নাকে লাগে, গন্ধটা তরমুজের মতো। তিনি ভেবে পান না, কীভাবে একটা মানুষের নিশ্বাসের গন্ধ তরমুজের মতো হতে পারে। নিজেকে বলেন, লোকটার ধূমপান নিশ্চয়ই এর কারণ।

পরদিন মেজর ফস করে বললেন, ‘আপনি সবসময় সাদা রং পরেন কেন?’ রেহানার কাছে এটা মনে হলো অভদ্র আচরণ, কিন্তু তারপর নিজের উত্তর শুনে তিনি নিজেই অবাক হলেন। তিনি বললেন, ‘যাতে আপনি বিশ্বাস করেন আমি আসলে একজন নার্স, কোনো দুঃখী বিধবা নই।’ এই কথায় তিনি হাসেন আর রেহানা বিরক্ত হন, আসলে তিনি অসাবধানতাবশত মানুষটার সঙ্গে এক ধরনের ঠাট্টা করেছেন। কিন্তু তাঁর চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। এরপর এক সপ্তাহ তিনি প্রায় একটা কথাও বললেন না, রেহানা দুপুর আর রাতের খাবার নিয়ে এলে শুধু সংক্ষিপ্ত হাসি দিয়ে সারেন।

তারপর একদিন মেজর বললেন, ‘আপনার স্বামীর জন্য আমি দুঃখিত,’ আর রেহানা উত্তর দিলেন, ‘অনেক বছর হয়ে গেল,’ আর তারপর বললেন, ‘আপনি বিয়ে করেছেন?’

‘হ্যাঁ,’ তিনি বললেন, ‘করেছিলাম।’ এটা আবার কী ধরনের উত্তর? একটা চকিত চাহনি, কোনো কিছুর আভাস, মেজরের মুখের ওপর দিয়ে বিয়ে যায়। দেখে মনে হলো ক্রোধ। রেহানা ভাবেন, লোকটার ঘনিষ্ঠ কেউ হয়ে তাঁকে রাগিয়ে দিতে না জানি কেমন লাগতো।

তার পরদিন মেজর জিজ্ঞেস করেন, ‘আপনার স্বামীর কী হয়েছিল?’ তাঁর মনে হলো এটা ওর জানার বিষয় নয়, তবু উত্তর দেয়ার প্রবল জাগ্রদ তিনি অনুভব করেন।

‘হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল।’

‘হঠাৎ করে?’

‘হ্যাঁ, হঠাৎই একদিন।’

‘আপনি আর বিয়ে করলেন না কেন?’

এটাও ওর জানার বিষয় নয়, কিন্তু একবার যখন তিনি শুরু করেছেন, তখন

অভদ্র ভাব না দেখিয়ে থেমে যাওয়াও কঠিন। ‘আমার সন্তানরা ছিল,’ রেহানা বললেন, ‘আবার বিয়ে না করার এটাই যুক্তি।’

‘আমি ভাবি বিয়ে করার জন্যই বরং এটা একটা ভালো যুক্তি হতে পারে।’

‘না,’ তিনি বলেন। ‘না, দ্বিতীয়বার বিয়ে করার জন্য বাচ্চারা হলো সবচেয়ে দুর্বল যুক্তি।’

‘আপনি চাননি ওদের কেউ দেখাশোনা করুক?’

‘আপনি জানেন না, ওদের শুধু ধরে রাখতে আমাকে কত কষ্ট করতে হয়েছে।’ রেহানা তাঁকে আদালতের মামলাটা সম্পর্কে বলেন। ‘বাচ্চাদের আমায় ফিরিয়ে আনতেই হতো। আমার টাকার দরকার পড়ল। অনেক টাকার। জজ সাহেবকে ঘুষ দেয়ার জন্য টাকার দরকার। লাহোরে যেতে প্লেনের টিকিটের জন্য টাকার দরকার। মিসেস চৌধুরী বললেন, ‘বাংলার পেছনের জায়গায় একটা বাড়ি বানান।’ আমার স্বামীরও সে রকমই ইচ্ছা ছিল। সুতরাং আমি সিদ্ধান্ত নিলাম তা-ই করব। কিন্তু আমার...’

‘টাকার দরকার।’

‘হ্যাঁ, টাকার দরকার। আমার কিছু ছিল না। বাবা মারা গিয়েছিলেন। বোনেরা সবাই করাচিতে। ওরা বলল, ওরা আসতে চেয়েছিল, পারেনি। ওদের সঙ্গতিও তেমন ছিল না, সবসময় টানাটানি। আমিই বরং সবসময় ওদের এটা-সেটা দিয়ে সাহায্য করতাম।’ ব্যাংকের টাকা পাঠানোর রসিদগুলোর কথা মনে পড়ে তাঁর।

সেনগুপ্তদের শোয়ার ঘরটায় চোখ বোলান মেজরের পুরু দেয়াল লক্ষ্য করে, নিখুঁত সাদা পলেন্তারা, দরজার ভারি কপাট, খুললেই প্রশস্ত বারান্দা চোখ জুড়িয়ে দেয়। চাহনি দিয়েই তিনি যেন জিজ্ঞেস করেন, কীভাবে করলেন এত সব?

রেহানা ভাবেন, টাকা চুরির ব্যাপারটা তাঁকে বলা যায় কিনা। নিজেকে বলেন, বলার ভাবনাটা বাস্তবসম্মত; কাউকে না কাউকে তাঁর বলতেই হবে, তাঁর জীবনের এই কঠিন সত্য আজীবন ভেতরে পাথরচাপা দিয়ে রাখতে তিনি পারবেন না। এরকম একটা ব্যাপার যে কোনো মানুষকে শেষ পর্যন্ত কলুষিত আর ধ্বংস করে দিতে পারে। তাছাড়া এই লোকটা আর সব লোকের মতোই, বরং তাদের চেয়ে ভালো, কারণ একবার এই বাসা ছেড়ে চলে গেলে এর সঙ্গে হয়তো আর কখনো দেখা হবে না। মারাও যেতে পারে। তওবা, আসতাগ ফিরুল্লাহ। রেহানা আয়াতুল কুরসি পড়েন, যদি ও মারা যায়। তিনি আবার সূরা পড়েন, ওর মৃত্যুচিন্তা করার জন্য দুঃখিত হন।

রেহানা তাঁকে কথাটা বলবেন বলে ঠিক করেন, অনেক দিন পর তাঁর প্রথম স্বার্থপর কাজ। এমন কিছু করা যা শুধু তার নিজের জন্য। এমন একটা কাজ যা

কারো উপকারে আসবে না, কিছুই করবে না, ক্ষুধার্তকে খাবার দেবে না, বাচ্চা লালন করবে না। রেহানা স্টিলের আলমারির কপাটের ভেতরের দিককার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এই একান্ত গোপন কথাটা বলার চর্চা করেন। কল্পনা করেন এই ভীষণ গোপন কথা তাঁর জীবন থেকে উবে গেছে। শুধু স্বপ্নে এর রেশ ধরে রইলেন, এই জেনে যে, অচিরেই সেখান থেকেও এটা উধাও হয়ে যাবে। তিনি ভাবেন, গোপন আর গোপন থাকবে না, এর জন্য পরে কি তাঁর দুঃখবোধ হবে?

কিন্তু প্রতিদিনই রেহানা কথাটা বলা এড়িয়ে যান। মেজরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তিনি অন্য কিছু নিয়ে কথা বলেন। তিনি ধৈর্য ধরে শোনে, মাথা নাড়েন, খুব একটা বেশি মাথা নাড়েন না, তাতে মনে হয় তিনি যেন কাহিল। তিনি সব সময় রেহানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন, চোখের দিকে নয়। রেহানা এটা পছন্দ করেন। কেউ তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলে তাঁর ভালো লাগে না।

যখনই তিনি মেজরকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চান, লক্ষ্য করেন প্রশ্ন না করে উল্টো তিনি নিজের কথা বলে যাচ্ছেন। যেমন—একদিন তিনি নিজেকে বলতে শুনলেন, ‘স্বামী মারা যাওয়ার পর আমি আমার কথা হারিয়ে ফেলেছি।’

মেজর মাথা কাত করলেন। ‘কেন?’

‘কারণ আমার দুঃখগুলো বলার কেউ নেই।’

আর তিনি মাথা নাড়েন।

কথাটা মনে হচ্ছে এখানেই ফুরিয়ে গেল। রেহানার মনে হলো সমাপ্তি টানার জন্য বলা প্রয়োজন, ‘ইকবাল আমার উদ্ধারকর্তা ছিল।’

‘মেয়েরা সবসময় এ রকম বলে,’ বললেন তিনি ঠোঁট দুটো দাঁতে চেপে, তাই শব্দগুলোর বের হতে বেগ পেতে হলো।

এখন ওকে খুলে বলতেই হয়। ‘না, আসলেই তাই। আমাদের কলকাতা ছেড়ে চলে আসতে হলো। আমরা—আমার বাবা—সবকিছু বিক্রি করে দিতে বাধ্য হলেন। আমার দুই বোন করাচি চলে গেল, কিন্তু আমি যেতে চাইনি। থেকে যাওয়ার জন্য আমি যে-কাউকে বিয়ে করতাম।’

‘উনি মারা যাওয়ায় আপনার রাগ হয় না?’

‘হ্যাঁ, মাঝে মধ্যে হয়। এমন হঠাৎ করে ও চলে গেল।’ রেহানা ভাবলেন, মেজরকে কবরস্থানে যাওয়ার কথা বলবেন: বলবেন ইকবালের সঙ্গে বোঝাপড়ার কথা, অনুরোধ আর অনুযোগ করার কথা, তাঁর গো-ধরা, ছেলেমানুষি বিশ্বাস যে ইকবাল আবার ফিরে আসতে পারে, আবার সবকিছু আগের দিনগুলোয় ফিরে যাবে। কিন্তু এসব প্রকাশ করার সময় হয়তো এখনও হয়নি, অথবা বেশি দেরি হয়ে গেছে। আর এমনিতেই এই লোককে দেখে মনে হয় না এ ধরনের ভাবানুভূতি

তাঁর ভালো লাগবে ।

‘আমার স্ত্রী মারা গেছে,’ তিনি হুট করে বলেন ।

‘ও, আমি দুঃখিত ।’

‘আমরা আসলে বিয়ে করিনি । ও হিন্দু ছিল । কিন্তু আমরা একে অপরকে ভালোবাসতাম । এতে কি কিছু যায় আসে?’

‘হ্যাঁ, অবশ্যই যায় আসে,’ রেহানা বলেন । তাঁর সিলভির কথা মনে পড়ে ।

‘আমার বাবা অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন ।’

‘আমার না ।’

‘না?’

বাবার বয়সী অবয়ব চোখের সামনে ভেসে ওঠে রেহানার: সুদর্শন, চৌকস, পা দুটো মেজাজের সঙ্গে তাল রেখে আড়াআড়িভাবে সামনে রাখা । ‘আমি আসলে তাঁকে খুব বেশি দেখিনি । অনেক ছোট ছিলাম । কিন্তু উনি কী পছন্দ করতেন তা আমার মনে আছে । তামাকের পাইপ । থ্যাকারি । উইলিয়াম মেকপিস থ্যাকারি—উনি আমাকে দিয়ে বলাতেন । বাবা পিয়ানো বাজাতেন—আমাদের একটা বিশাল পিয়ানো ছিল । আমাদের বাসার সবচেয়ে চকচকে জিনিস ছিল সেটা । প্রতিবার মৌসুম বদলের সঙ্গে সঙ্গে একজন এসে টিউন করে দিয়ে যেত ।’

‘পিয়ানো-টিউনার ছিল আপনাদের?’

‘একজন পিয়ানো-টিউনার । টেবিল লাগানোর জন্য একজন । একজন সহিস । তিনজন কবি ।’ তিনি নামতা পড়ার মতো করে স্মৃতি থেকে ফর্দটা বলে যান । ‘আটজন রাঁধুনি, দু’জন খানসামা, বারোটা গাড়ি ।’ রেহানা যদিও এর কিছুই দেখেননি । যখন তাঁর এসব পার্থক্য বোঝার মতো যথেষ্ট বয়স হয়েছে, ততদিনে তাঁরা গরিব ।

‘আপনার মা?’

‘মা মারা গেলেন যখন টাকা শেষ হয়ে গেল । ১৯৩৬ সালে । আমার বয়স তখন তিন ।’

নিউ মার্কেটে রেহানা একটা মুরগি পেলেন । খেতে দেয়ার পর মেজরের চাহনি দেখে মনে হলো, মুরগিওয়ালাকে তিনি বাস্তবিক গয়না দিয়ে দিতে পারেন । তিনি আঙুল চুষলেন, প্লেটের ধার পর্যন্ত চাটলেন । যখন শেষ করলেন, হাতের মুঠোর ভেতর আঙুল করে একটা টেকুর তুললেন । আর তারপর তিনি আবার রেহানাকে ইকবালের কথা জিজ্ঞেস করলেন, আর তিনি ওঁকে ১৯৫৭ সালে ভক্সল গাড়ির ফরমাশ করার সময় ইকবালের লন্ডন ভ্রমণের গল্প বলা শুরু করলেন ।

‘লন্ডন থেকে আমার স্বামী আমার জন্য অনেক জিনিস নিয়ে এলেন: হ্যারডস থেকে উলের কালো একটা কোট, সোনার রোলেব্র লেডিস হাতঘড়ি, একটা গোল বাস্কেটবল কোয়ালিটি স্ট্রিট চকোলেট। কোটটা আমি ন্যাপথলিন দিয়ে একটা বাস্কে তুলে রাখলাম। চকোলেট দুই ভাগ করলাম। মায়া ওর ভাগ একদিনে খেয়ে শেষ করে ফেলল, আর পরদিন কাটালো পেট চেপে ধরে কঁকিয়ে, কাঁতরে। তৃতীয় দিনে সোহেলের কাছে ধরনা দিল ওর ভাগেরটা নেয়ার জন্য। সোহেল দিয়ে দিল—ও কখনো মায়াকে না করতে পারে না। ও অবশ্য একটা আলাদা করে রাখল, গোল ক্যারামেলটা—আপনি জানেন কোনটা? বেগুনি তবকে মোড়া যেটা।’

মেজর চিনতে পারলেন কিনা বোঝা গেল না।

‘ও সেটা এত দিন তুলে রাখল যে ওতে পোকা ধরল। আমার মনে হয় না ওর চকোলেট ভালো লাগে। আর সোনার রোলেব্র ঘড়িটা শেষ পর্যন্ত আমি বিক্রি করে দিই। কিন্তু ওটা অপূর্ব ছিল, ভীষণ সুন্দর উপহার। এই হচ্ছে ১৯৫৭ সালে আমার স্বামীর লন্ডন ঘুরতে যাওয়ার গল্প।’ রেহানা খাবারের প্লেটগুলো জড়ো করে সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

‘প্রিয় কেউ ছিল না? আপনার স্বামীর মৃত্যুর পর?’ হয়তো ভাবলেন তিনি বুঝি প্রসঙ্গ বদলাচ্ছেন, কিন্তু আসলে এই প্রশ্নটা করে সোনা সম্পর্কে অপ্রিয় সত্যের খুব কাছে তিনি চলে এসেছেন। মেজরের ফাটা ঠোঁটের ওপর রেহানা তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। তিনি হাত বাড়িয়ে দেন, যেন ছুঁতে যাচ্ছেন, কিন্তু হাতটা বিছানায় গিয়ে ঠেকে। চাদর টেনে তোশকের নিচে গুঁজে দিয়ে রেহানা ভাবেন, চাদর বদলানোর সময় হয়েছে।

পরদিন দরজায় তিনটা জোর টোকা পড়ে। রেহানা বসার ঘরে দৌড়ে যান, তাঁর বুক রীতিমতো কাঁপছিল, এখন যে কোনো কিছুই হতে পারে : সোহেল, সোহেলের খবর, মায়ার চিঠি, একটা টেলিগ্রাম যেখানে লেখা ওরা দুজনেই মারা গেছে, অথবা বন্দি, অথবা আহত কোনোখানে। অথবা পাকিস্তান হতে পারে, অথবা ফেউ, অথবা কেউ ফেউ হওয়ার ভান করতে পারে, অথবা কেউ ফেউ না হওয়ার ভান করতে পারে। যে কেউ হতে পারে।

একটা রূপালি ট্রে হাতে একজন দাঁড়িয়ে। ট্রের ওপর একটা বাটি, একটা নীল রঙের চীনা কাচের বাটি সাদা কাপড়ে ঢাকা। কাপড়ের কিনারজুড়ে সুতোয় কাজ করা সোনালি টিউলিপ। গরম আর সুবাসিত কিছু সেটার ভেতরে: দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে ভদ্রমহিলা সালাম দিলে তাঁর গা থেকে কিশমিশের গন্ধ রেহানার নাকে এসে লাগে।

‘আমি জয়ের মা,’ একটু দ্বিধা নিয়ে মহিলা বলেন। ‘জয় আর আরেফ।’ তাঁর

গোলগাল টোল পড়া চেহারা ।

‘আপনি মিসেস বশির, হ্যাঁ, তাই তো । ভেতরে আসুন ।’ উনি কি আরেফ সম্পর্কে কিছু জানতে এসেছেন? রেহানা তাঁকে সোফায় বসতে দেন । চেষ্টা করেন মহিলার চোখের দিকে না তাকাতে । যত কঠিন চোখেই আপনি দেখুন না কেন, তিনি নিজেকে বলেন, কখনোই জানতে পারবেন না আসলে আমি সত্যি বলছি কিনা ।

‘আপনাকে একটু চা দিই?’

‘না, লাগবে না, আমি শুধু এটা দিতে এসেছি ।’ কোলের ওপর রাখা রূপালি ট্রেটা দেখান তিনি । কিশমিশের গন্ধে ঘর ম-ম করছে । মিসেস বশির একটুক্ষণ থামেন, তারপর হাতের তালু রাখেন সাদা টিউলিপ ঢাকনার ওপর । তাঁর হাতগুলো বড় আর নখগুলো ভাঙা, অসমান ।

‘আপনি কি এটা জয়কে দিতে পারবেন?’ কথাগুলো খুব দ্রুত বেরিয়ে এলো, যেন ভদ্রমহিলা ভয় পাচ্ছেন, তাঁর কথা বলার সাহস মাঝপথে তাঁকে ছেড়ে চলে যাবে ।

তিনি কি জানেন আরেফ মারা গেছে? যদি না জানেন, তার কী মানে—তিনি সত্যি বলছেন, না মিথ্যা বলছেন?

‘আমি খুব দুঃখিত, আমার পক্ষে সম্ভব নয় ।’

‘এমন কিছু না । একটু মোরগ-পোলাও ।’

‘আমি জানি না আপনার ছেলে কোথায় ।’ আপনার ছেলে মারা গেছে । আরেক ছেলে, যে আমার ছেলের শার্ট পরেছিল, সে গেছে তাকে কবর দিতে ।

‘জি, জি, তা তো বটেই, আপনি জানেন না ।’ একটু থেমে মহিলা আবার বলেন, ‘সোহেল হয়তো পারবে এটা ওকে দিতে ।’ মিসেস বশির দরজার দিকে তাকান, আর রেহানা তখন দেখতে পান মহিলার মধ্যে উৎকণ্ঠা, সাবধানী কৌতূহল আর একটু যেন-বা ঈর্ষাও, আরেক মহিলার প্রতি, আরেক যোদ্ধা-মায়ের প্রতি, যে হয়তো এমন কিছু জানে, তিনি জানেন না ।

‘সোহেল করাচিতে,’ রেহানা সাবধানে বলেন, ‘ওর খালাদের কাছে,’ সোহেল পরেছে আরেফের শার্ট, আরেফ পরেছে জয়ের শার্ট, জয় পরেছে সোহেলের শার্ট ।

‘হয়তো আপনি এমন কাউকে চেনেন যে এটা নিয়ে যেতে পারবে । মোরগ-পোলাও ওর খুব প্রিয় ।’

‘আমি কাউকে চিনি না,’ রেহানা এমনভাবে কথাটা বলেন যেন এর আগে হাজারবার বলেছেন ।

‘দয়া করেন মিসেস হক, আপনিও তো মা’

তুমি একজন মা । এই এক শব্দবন্ধ কতবার তিনি বলেছেন নিজেকে । সবার ওপরে, একজন মা । বিধবা না, স্ত্রী তো না-ই । চোর না । একজন মা । কিন্তু এখন তিনি অন্য কিছু—একজন মা, হ্যাঁ, কিন্তু শুধু বাচ্চাদের নয় । অন্য রকম মা । এই

মা জানে, বাচ্চাদের জন্য অপেক্ষার প্রহর গোনা কী জিনিস। আর এও তিনি বুঝতে পারেন, এ রকম প্রহর গোনা কতটা বিপজ্জনক।

‘আমি খুব দুঃখিত। আমি জানি ছেলেদের জন্য আপনার মন খারাপ হয়।’

‘আপনি কি ওদের দেখেছেন? কেমন আছে ওরা? জয় কেমন আছে, আর আমার আরেফ?’

মহিলা তাহলে জানেন না তাঁর ছেলে মারা গেছে। কোথাও কোনো এক কবরে আরেফ শুয়ে আছে, অস্থির আর অবহেলায়—এই ভাবনায় রেহানা চমকে ওঠেন। মহিলার রুক্ষ হাত ছুঁতে ইচ্ছা হয় তাঁর। তাঁকে ভান করতেই হবে যে তিনি কিছুই জানেন না। নিজেকে বাজিয়ে দেখার জন্য রেহানা সোজা মিসেস বশিরের দিকে তাকিয়ে বলেন, ‘আমি জানি না। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ওদের আমি আর দেখিনি।’ আর এটা বলার সময় তাঁর মনে পড়ে, যেদিন জয় আগরতলা চলে গেল সেদিন সকালে তিনি জয়ের কপালে দোয়া পড়ে ফুঁ দিয়েছিলেন আর ফিসফিস করে দোয়া পড়ার সময় জয়ের চোখে ছিল কাতর দৃষ্টি, কোমলভাবে সে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে পা ছুঁয়ে সালাম করেছিল। ‘মিসেস বশির, আপনার মোরগ-পোলাও আপনি নিয়ে যান।’

রেহানা অনুশোচনাহীন ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ান আর মিসেস বশিরের জন্য সামনের দরজা খুলে দেন।

‘আপনিই রাখুন না এগুলো,’ তিনি রূপালি ট্রেটা রেহানার দিকে ঠেলে দিয়ে বলেন, ‘দয়া করে আপনি রাখুন। মনে করুন যে আমি আপনার জন্যই রঁধেছি।’

‘আমি দুঃখিত মিসেস বশির, আপনি প্লিজ যান।’

‘আমি জানি সে এখানে আছে। আমি জানি। আপনি মিথ্যুক।’ তিনি নরম গলায় বলেন। কাজলমাখা অশ্রু গড়িয়ে নেমে আসে তাঁর গাল বেয়ে। তিনি এগিয়ে যান দরজার দিকে। রেহানার একবার মনে হয়, তিনি বুঝি গরম পোলাও তাঁর দিকে ছুঁড়ে দেবেন, কিন্তু তিনি দেন না। টিউলিপ আঁকা ঢাকনা গুঁজে দিয়ে তিনি বেরিয়ে চলে যান, পেছনে চৌকাঠে দাঁড়িয়ে রেহানা মোরগ-পোলাওয়ের রেসিপি মনে করতে থাকেন, ভাবতে থাকেন, জয় ফিরে এসে তাকে মোরগ-পোলাও রঁধে দেয়ার মতো যথেষ্ট মুরগি তাঁর কাছে আছে কিনা।

জয়ের মায়ের আগমন রেহানার ভেতরটা ওলট-পালট করে দেয়। মাগরিবের নামাজ শেষ করে তিনি মেজরকে দেখতে যান। তাঁর হাতে কোনো খাবারের ট্রে না থাকায় নিজেকে আশ্চর্য রকম প্রকট, নিরাভরণ লাগে রেহানার, বদলানোর জন্য বিছানার চাদর বা ডাক্তার রাজেশের কাছ থেকে আনা এক শিশি ওষুধ অন্তত যদি থাকত। ‘জয়ের মা এসেছিল,’ তিনি বলেন, ‘আমি বিদায় করে দিয়েছি।’

মেজর একটা ছোট আয়নায় নিজেকে দেখছিলেন, কাটা দাগটা খুঁটিয়ে দেখলেন। ‘আপনি ঠিকই করেছেন,’ আয়নাটা বালিশের নিচে গুঁজে তিনি বলেন।

‘ওনার ছেলে কিন্তু মারা গেছে।’

কনুইয়ে ভর দিয়ে নিজেকে তুলতে একটু বেগ পেতে হয় মেজরকে, ভাঙা পাটা টেনে আনেন, তারপর সোজা হয়ে বসে রেহানার মুখোমুখি হয়। ‘এসব আপনাকে মাঝে মাঝে করতে হবে...কঠিন কাজ।’

‘আমি বাঙালি চেতনায় বিশ্বাসী কিনা জানি না,’ তিনি বলেন। বইয়ের তাকে তিনি তাঁর অতি প্রিয় উর্দু কবিতার সঙ্কলনগুলোর কথা ভাবেন, যেগুলো ঠিক কোরআন শরিফের পাশে রাখা।

‘তাহলে আপনি এখনো এই ঢাকায় আছেন কেন?’

‘আপনাকে দেখে রাখার জন্য, আর কেন?’ তাঁর এটা বলা উচিত হয়নি। তিনি একটু ক্ষণের জন্য থামেন, নিজেকে সামাল দেন। ‘এখানে আমার ভালো লাগে,’ তিনি বলেন। ‘এটা আমার বাড়ি, আর আমার সন্তানদের বাড়ি। কোনো কিছুই বিনিময়েই এটা আমি ত্যাগ করব না। বিশ্বাস করুন, আমার পরীক্ষা হয়ে গেছে।’

‘সেজন্যই তো আপনি সত্যিকারের বাঙালি জাতীয়তাবাদী।’

‘ভদ্রতা করে বললেন, ভালো লাগল। আর আপনি?’

‘এটাই আমার এযাবৎকালের সবচেয়ে ভালো কাজ। যদি শুধু এই বিছানা ছেড়ে উঠতে পারি!’

মেজরের যাওয়ার কথায় রেহানা একটু যেন দমে যান।

‘এর আগে আমার জীবন ছিল অপচয় মাত্র।’

‘আপনি তো সেনাবাহিনীতে ছিলেন?’

‘সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছি অনেক বছর হলো, কিন্তু আমি সরে যেতে চেয়েছিলাম, আমার গ্রাম থেকে, সবকিছু থেকে। ওখানে খুব বেশি স্মৃতি।’

তারপর তিনি রেহানার দিকে এমন করে তাকান যেন তিনি রেহানাকে জিজ্ঞেস করতে চান সে বুঝল কিনা তিনি কী বলতে চেয়েছেন। রেহানা বলেন, ‘আর ঠিক সেই কারণেই আমি এখানে থেকে গেছি।’



জুন মাসের শেষে তিনটা ঘটনা ঘটল: জয় আগরতলা থেকে ফিরে এলো, খারাপ খবর নিয়ে এলো ডাক্তার আর রেহানা মেজরকে তাঁর গ্রামোফোনটা দিলেন। গ্রামোফোনের বুদ্ধিটা রেহানার। ডাক্তার এসে মেজরের পা পরীক্ষা করে বলেছিল,

কমপক্ষে আরও তিন সপ্তাহ বিশ্রামে থাকতে হবে, শুনে মেজরের খুব মনমরা অবস্থা হয়। রেহানা তখন গ্রামোফোনের ধুলো ঝাড়লেন, আর দু'হাতে আঁকড়ে বাগান পার করে সোনায় নিয়ে গেলেন সেটা। সোহেলের ঘর হাতড়ে কয়েকটা পুরনো রেকর্ড পেলেন তিনি। একটার নাম হেল্ল! আরেকটার ওপর এলভিস প্রিসলির সাদা-কালো ছবি, মাইক্রোফোনকে সোহাগ করছে যেন ঠোঁট দুটো। ধুলোর স্তর জমেছে গ্রামোফোনের পিনটায়; রেহানা আঙুলে থুতু দিয়ে জমাট বাঁধা ধুলো ঘষে তোলেন। মাঝে মধ্যে কনুইয়ে মাখার জন্য যে অলিভ অয়েল ছিল ঘরে তাতে একটা ন্যাকড়া চুবিয়ে সেটা দিয়ে গ্রামোফোনের কাঠ পালিশ করে দেন।

এক মাসের মুরগির তরকারি একসাথে দিলে যে অবস্থা হবে গ্রামোফোন পেয়ে মেজরের মুখের ভাব দাঁড়ায় সেরকম। তিনি এত বড় করে হাসলেন যে কাটা দাগটা কান পর্যন্ত টান খেল। চোখ বুজে, মাথাটা ছাদের দিকে কাত করে অশ্রুতে তিনি বললেন, ‘ধন্যবাদ। আপনি কীভাবে জানলেন?’

প্রথম সপ্তাহে তিনি রেহানার দেয়া দুটো রেকর্ড ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অনেকবার করে বাজালেন। আর তারপর একদিন রেহানার কানে এলো নতুন গান। নিশ্চয়ই জয় নতুন রেকর্ড নিয়ে এসেছে, অথবা অন্য কেউ; এমনকি কোনো মহিলাও হতে পারে। হাজার হোক অন্ধকার নামার পর সোনায় কী ঘটে সেটা তো আর তিনি জানেন না। না, এটা তিনি করবেন না। কোনো মহিলাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে আসবেন না।

প্রথম দিকের রেকর্ডগুলো রেহানার চেনা: কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীত, কিছু লোকগীতি যেগুলোর কথা বদলে দিয়ে জাতীয়তাবাদী স্লোগান বানানো হয়েছে। আর তারপর একদিন মেজরের ঘর থেকে তিনি অদ্ভুত এক সঙ্গীত ভেসে আসতে শোনেন। রেহানা তাঁর নাশতা নিয়ে আসেন: একটা ডিম ভাজা, চারটা তিনকোনা পাউরুটি টোস্ট করা, এক গ্লাস দুধ। তিনি দাঁড়িয়ে পড়েন দরজায়, মনে হলো মুহূর্তকাল শুনলেন, কিন্তু হয়তো শুনছিলেন অনেকটা সময় ধরে, কারণ যখন সম্বিত ফিরলো, দেখেন ডিম ভাজা শক্ত হয়ে কমলাটে হয়ে গেছে। এটা কী ধরনের গান? তিনি এরকম আগে কখনও শোনেননি। দৌড়ে ফিরে পেরেন তিনি বাংলায়, নতুন করে ডিম ভাজলেন, এই অপচয়ের জন্য নিজেকে শাসন করলেন, আর নিজের পায়ের ছাপ ধরে ফিরে এলেন সোনায়। কিন্তু দরজার চৌকাঠে আবার তাঁর শিকড় গজিয়ে গেল।

এক নারীর কণ্ঠ। তার প্রতিটি মাত্রার ফাঁকে রেহানা শুনতে পাচ্ছেন আলতো করে নিশ্বাস নেয়ার আওয়াজ, জিভ দিয়ে মুখের তালু স্পর্শ করা আর পেছনে বাজছে ধীর কোমল পিয়ানো, আর গান যতো এগুচ্ছে ততই যেন মায়ামরা এক বিষাদ অনুভব করছেন রেহানা, পাকস্থলী থেকে উঠে আসা একটা হালকা কাতরতা, স্বরবর্ণগুলো টেনে বলা। সেই নারীর কণ্ঠে হাজার বছরের আর্তি। রেহানা ইংরেজি শব্দগুলো বুঝতে চেষ্টা করলেন। আই লাভস ইউ, পরগি।

কে এই পরগি? গানটা কেমন আবহাওয়ার মতো একই সঙ্গে সবখান জুড়ে আছে আবার কোনোখানেই নেই, শব্দগুলো একটির ওপর আরেকটি ঝরে পড়ছে বৃষ্টির ফোঁটার মতো, একটা শুকনো দিন আর তারপর সজল বাতাসের দমকের মতো এর সুর উঁচু পর্দা ছুল। কখনো মনে হলো যেন গায়িকা তার নিশ্বাস ধরে রেখেছে আর তার পরক্ষণেই মুক্ত করে দিল, সে তরুণী, প্রায় বালিকাসুলভ আর তারপর তার কণ্ঠ গভীরে চলে যায়, এক গোপন পুরুষোচিত আত্মপ্রত্যয়ে। সেই আবহ ঘর ভরে দেয়; করিডোর ধরে এগিয়ে এসে রেহানার ভেতর পাপড়ি মেলে।

মেজরের ঘরে ঢোকার সাহস সঞ্চয় করতে করতে রেহানা লক্ষ্য করেন তাঁর যেন দমে ঘাটতি পড়ে গেছে। নিজেকে বলেন, এটা নিশ্চয়ই দ্রুত হাঁটার জন্য হয়েছে, হাতে ভারি ট্রে, চেষ্টা করছিলেন দুধ যেন ছলকে না পড়ে। তিনি মেজরের ওপর বিরক্তি ঝাড়তে চেষ্টা করেন। তাঁর সামনে ট্রেটা যতটা না চেয়েছিলেন, তার চেয়েও জোরে ঠকাস করে রাখেন।

‘গায়িকার নাম নীনা সিমোন,’ মেজর বলে।

নীনা। বাঙালি নামের মতো শোনায়।

রেহানার মুখের ভেতর কেমন একটা কিছু গলে যাওয়ার অনুভূতি হয়, যেন পাকা টসটসে গোলাপি পেয়ারায় কামড় দিয়েছেন।

‘এই গান আপনার ভালো লেগেছে?’ তিনি ট্রে নিতে ফিরে এলে, মেজর জিজ্ঞেস করেন।

‘এটা বাবার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে,’ রেহানা বললেন।

‘উনি জ্যাজ পছন্দ করতেন?’

‘একবার একটা ব্যান্ড দল এসেছিল। বলরুমে অনেকের নিমন্ত্রণ, নাচ হচ্ছে। আর শ্যাম্পেন। হয়তো সেটা তাঁর শেষ নিমন্ত্রণগুলোর একটা।’ রেহানা এমনভাবে বলে গেলেন যেন এই স্মৃতি তাঁর কাছে নতুন। ‘হ্যাঁ, বাটির আকারের পলকা গ্লাসে শ্যাম্পেন, আর ছোট চুলের মহিলারা। অনেক বয়স্ক। খুব জোরালো, আমুদে বাজনা। এটার মতো নয়।’

‘নীনা সিমোনের কণ্ঠ আর কারও মতো নয়,’ মেজর বলেন। তাঁর চোখ পড়ল মেজরের বিছানার পাশে ছড়িয়ে রাখা রেকর্ডগুলোর দিকে। একজন কালো লোক, ট্র্যাম্পেটের ওপর চেপে ধরা ঠোঁট আর চোখে অনুনয়ভরা দূরের দৃষ্টি।

তিনি জিজ্ঞেস করেন, ‘এই রেকর্ডগুলো কোথায় পেয়েছেন?’

‘ভালো লেগেছে?’

‘না, আমার ভালো লাগেনি,’ তিনি মিথ্যা বলেন।

‘আচ্ছা।’

আপত্তি করলেন না কেন তিনি। এই গান কে পছন্দ করবে না?

‘আপনার কী ভালো লাগে?’ তিনি জিজ্ঞেস করেন।

‘এটা আবার কী ধরনের প্রশ্ন?’

‘সোজা। আপনি যদি এই গান পছন্দ না করেন, তাহলে কী পছন্দ করেন?’

‘মানে জিজ্ঞেস করছেন, কোন্ গান পছন্দ করি?’

‘না, মানে, কী পছন্দ করেন আপনি?’

‘যে কোনো কিছু।’

‘যে কোনো কিছু?’

এর কী উত্তর দেবেন তিনি? এই প্রশ্ন তাঁকে কেউ কখনো করেনি। কেন এই প্রশ্ন তাঁকে কেউ কখনো করেনি? কারও কাছ থেকে এই প্রশ্ন কখনো না শুনেও একটা মানুষ তাঁর জীবন কীভাবে পার করে দিতে পারে, সেটা ভেবে তিনি বিস্মিত হন। মুহূর্তক্ষণ ভাবেন।

‘আমার বাগানের ফুলগুলো আমার ভালো লাগে,’ তিনি ধীরে বলেন। ‘হলুদ গোলাপ আমার প্রিয়। আর আমার ডিমের হালুয়া বানাতে ভালো লাগে। এটা বানানো খুব কঠিন, জানেন। একটু ভুল করেছেন কি ডিম ভর্তা হয়ে যাবে।’ রেহানা টের পান সেই গানের আবহ আবার তাঁর ভেতরে পাপড়ি মেলছে, চঞ্চল, ঢেউ খেলানো, পাক খাওয়া ঘূর্ণন। ‘আর সিনেমা। সিনেমা দেখতে ভালো লাগে।’ এটা আরেকটা মিথ্যা। কেননা সিনেমা তাঁর ভালোবাসা।

জয় প্রজেক্টর নিয়ে এলো। সেটা জুনের শেষ দিন, আর প্রতিদিন সন্ধ্যায় সূর্য তার সলজ্জ লাল আভা ছড়িয়ে দিগন্তের ওপারে লুকাতেই নেমে আসছে বৃষ্টি।

রেহানা প্রথমে জিনিসটা কী, ধরতে পারেননি। একটা শক্ত কালো বাস্র দেখে তিনি ভাবলেন এটা হয়তো বাগানে মাটি খুঁড়ে লুকিয়ে রাখা হবে, হয়তো কোনো অস্ত্র। কিন্তু জয় যখন বাস্রের দুটো আংটা খুলল, তিনি দেখতে পেলেন ভেতরে ফিতা আর লেন্স; তখনো তিনি ভাবছেন এটা কোনো ক্যামেরা হবে, কারণ কখনও কোনো প্রজেক্টর কাছ থেকে দেখেননি তিনি। শেষ পর্যন্ত জয়ের মুচকি হাসিতেই সব বেরিয়ে গেল; গর্ব আর দুষ্টমি ভরা হাসি, তার এই নতুন ভঙ্গি সে রপ্ত করেছে শোক লুকিয়ে রাখতে।

‘এটা কোথায় পেলেন?’

‘নাজ সিনেমা। হিন্দু মালিক ছিল। পাক আর্মির কাছে মার্চ মাসে মেরে ফেলেছে।’

আচ্ছা, তাহলে সে এগুলোই করছে। লুট আর চুরি। ‘আর তুমি প্রজেক্টরটা তুলে নিয়ে চলে এলে?’ মেজর তাকে কিছুই বললেন না, তাই রেহানার জানা হলো না প্রজেক্টর তুলে আনার বুদ্ধিটা কার। তিনি ভাবলেন এটা হয়তো জয়ের বুদ্ধি, কারণ ইদানীং সে এ রকম ছোটখাটো অপরাধ করছে শুধু এটা প্রমাণ করার

জন্য যে এখনো কিছু মজা আর ফাজলামি অবশিষ্ট আছে পৃথিবীতে। অথবা ওর ভাইয়ের মৃত মুখটা ভুলে থাকতে হয়তো এটা করেছে সে।

‘এটা ওখানে পড়ে ছিল, ধুলো জমছিল।’

‘তাই বলে তুমি কারও জিনিস স্নেহ তুলে নিয়ে আসতে পারো না।’

‘এটা হয়তো কাজও করে না,’ জয় বলল। আর বলামাত্রই রেহানা টের পেলেন যে এটা ওরা রেখে দিচ্ছে।

‘অবশ্যই এটা কাজ করে। কাজ করবে না কেন? আমি কম করে হলেও এক ডজন সিনেমা ওখানে দেখেছি।’ মাথার ভেতর নানান সিনেমার নাম খেলে যেতে থাকে তাঁর; *রোমান হলিডে*, *হাই সোসাইটি*, *শ্যারেড*, *দ্য মন্টিজ ফ্যালকন*, *দ্য বিগ স্লিপ*, *ক্যাসার্ল্যাঙ্কা*। হঠাৎ করে তিনি লোভী হয়ে ওঠেন। ‘আমরা কি এখন চেষ্টা করে দেখব চলে কিনা?’ রেহানা বাস্তবের ভেতর তাকান। *মুঘল-ই-আযম*। ‘তুমি কীভাবে জানলে?’

‘হাতের কাছে যেটা পেয়েছি তা-ই টান দিয়ে নিয়ে এসেছি।’

এটা কোনো কাকতালীয় ব্যাপার হতে পারে না। সোহেল নিশ্চয়ই ওকে বলেছে। ‘ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। আমি সত্যি ভাবতেই পারছি না।’

‘এটাকে গেরিলাদের পক্ষ থেকে একটা উপহার ধরে নেন।’ জয় হাসে, ওর মুখ হাসিতে ভরে যায়।

এমনকি সিনেমা শুরু হওয়ার আগেই তাঁর চোখ ছলছল করে ওঠে। জয় ছবির আলো ঠিক করল আর পিছু হটে দরজার কাছে গেল।

‘তুমি চলে যাচ্ছে?’

‘আমার জন্য এই ছবি না,’ জয় বলে। ‘আমাকে নরম করে দিতে পারে।’

ততক্ষণে রেহানার মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরে গেছে। আকবর পর্দায় এসেছেন, খোদার কাছে বংশের বাতি কামনা করছেন। কোনো চিহ্ন না রেখে আমাকে মৃত্যুবরণ করতে দেবেন না, তিনি বলছেন।

‘আপনি বুঝতে পারবেন না,’ রেহানা ফিসফিস করে বলেন, ‘এটা উর্দু।’

‘তাতে কী,’ মেজর পাল্টা ফিসফিস করে উত্তর দেন।

‘আপনি গল্পটা জানতে চান না?’

‘তাড়াতাড়ি বলেন,’ তিনি বলেন, ‘শুরু হওয়ার আগে।’

‘একটু জটিল।’ তাঁর চোখ পর্দা থেকে সরে না, সেখানে আকবর এখন মরুভূমি পেরিয়ে নাদির শাহর কাছে পৌঁছেছেন। ‘এটা প্রেমের গল্প—যুবরাজ সেলিম—আকবরের ছেলে—একজন দাসীকে ভালোবেসে ফেলে, আনারকলি। আর তারপর...’

আঙুল বাড়িয়ে ও রেহানার হাত ছুলেন। ‘বুঝলাম,’ ও বলে।

আনারকলি এলো, মূর্তির মতো। তার বাঁকা হাসির উদ্ভাস ছড়িয়ে পড়ল। সে কথা বলে উঠল, তার মিষ্টি গলা সারা ঘরে প্রতিধ্বনি তুলল। রেহানার ভেতরে হাড়ের কাঁপন শুরু হলো। আনারকলি কোমর দুলিয়ে নাচল। যুবরাজ সেলিম তার প্রেমে পড়ল। আকবর রাগে অন্ধ হয়ে দু'জনকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। 'রত্নতুল্য ভারত আপনি রাখুন,' যুবরাজ সেলিম বলল, 'আমার আছে আনারকলি।'

'আনারকলিকে ভান করতে হবে যে ও যুবরাজ সেলিমের সঙ্গে প্রতারণা করেছে,' রেহানা অস্ফুটে বলেন।

'শশশ,' মেজর ঠোঁটের কাছে আঙুল তোলেন। সিনেমার ছায়াগুলো ওঁর মুখের ওপর নড়াচড়া করছে।

'দেখলেন,' রেহানা বলেন, 'এটা হচ্ছে সবচেয়ে নিটোল প্রেমের গল্প।'

'ঠিক। ঠিক বলেছেন।'

'জয়ের সত্যিই প্রজেক্টরটা চুরি করা উচিত হয়নি।'

'আপনার যদি ওর মতো অর্ধেক সুযোগও থাকত, আপনি নিজে গিয়ে ওটা নিয়ে আসতেন।'

রেহানা একটা গভীর নিশ্বাস ছাড়েন। এর চেয়ে ভালো সময় আর আসবে না। ঘরটা অন্ধকার, প্রজেক্টরের পাখা এখনো ঘুরছে, একটা যান্ত্রিক ভোঁ-ভোঁ শব্দ, যা মনে হলো জানালাটাকে উজ্জ্বল করেছে আর সেই সাদাটে উজ্জ্বলতা মেজরের বিছানার ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে।

রেহানা মেজরের দিকে ঘোরেন। প্রজেক্টর বন্ধ করার জন্য তিনি নড়েন না, যেন জানতেন রেহানা এখন তাঁকে কিছু বলবে। হয়তো এসব পরিকল্পনা তাঁরই, জয়কে দিয়ে প্রজেক্টর চুরি করানো, মুঘল-ই-আযম দেখা, যার ভাষা তিনি বোঝেন না। তা-ই যদি হয়, তাহলে তিনি এই ফাঁদে পড়তে রাজি; কারণ যতটা আকুল হয়ে মেজর তাঁর কাছ থেকে সবকিছু শুনতে চান, ততটাই আকুল হয়ে তিনি মেজরকে বলতে চান।

'বাচ্চাদের নিয়ে যাওয়ার পর আমার মনে হলো আমি মারা যাব। কী করব আমার জানা ছিল না। আর সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হলো আমি আসলে বিশ্বাস করতে শুরু করলাম যে ওই মহিলার কাছেই ওরা ভালো থাকবে। ওদের দেয়ার মতো আমার আর কিছু নেই, এমনকি বিচারককে দেয়ার মতো টাকাও না। আর আমি এত ভীরা ছিলাম, বিশ্বাস করতাম যা হয়েছে সবকিছু ভালোর জন্য হয়েছে, আর তাই ফয়েজকে বাচ্চাদের আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে দিলাম। এই জন্য নিজেকে আমি কখনো ক্ষমা করব না।'

রেহানা মেজরের দিকে তাকিয়ে থেকে অপেক্ষা করেন তিনি কিছু বলবেন, কোনো কিছু যেমন 'এছাড়া আর কী-ই বা করতে পারতেন আপনি!' অথবা

‘মেয়েরা এত অসহায়।’—এ ধরনের কথা শুনে শুনে তিনি অভ্যস্ত হয়ে গেছেন, শব্দগুলো তাঁকে সবখানে তাড়িয়ে বেড়ায়। কিন্তু মেজর শুধু তাঁর বলে যাওয়ার অপেক্ষা করলেন।

‘আমি দরজা বন্ধ করে রাখতাম আর কারও সঙ্গে দেখা করতে চাইতাম না। কাজের লোকদের বিদায় করে দিলাম—ওদের রাখার মতো কোনো টাকাও অবশ্য ছিল না। মিসেস চৌধুরীর মেয়ে কখনো আসত, আর সেটা মাঝে মধ্যে আমার ভালোও লাগত, কিন্তু ও আমাকে আমার সন্তানদের কথা মনে করিয়ে দিত, আর আমি ওকে ফিরিয়ে দিতাম। নির্ভর ছিলাম, কিন্তু ও খুব মিষ্টি একটা মেয়ে, সব ভুলে গেছে।’

রেহানা একটু বিরতি নেন, ভাবেন সোহেল আর সিলভির ব্যাপারে কিছু বলা তার উচিত হবে কিনা।

‘মিসেস চৌধুরী একদিন এলেন। মধ্য দুপুরে আমি ইকবালের কোট গায়ে চাপিয়ে ঘুমিয়ে ছিলাম। তিনি বাগানের ভেতর দিয়ে এলেন—আগে আমি কখনো গেট লাগাতাম না—আর তিনি বললেন, তার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। তখন শুধু বাংলাটা ছিল, আর অনেকটুকু খালি জমি, বুনো ঘাস, যেখানে আমি বাচ্চাদের খেলতে মানা করতাম। আমার আর ইকবালের স্বপ্ন ছিল কোনো দিন সেখানে আমরা একটা বড় বাড়ি বানাব, কিন্তু ও মারা যাওয়ার পরে সে কথা কখনো আমার মাথায় আসেনি। ‘জমি বন্ধক দিন,’ মিসেস চৌধুরী বললেন, ‘ঋণ নিন, নিয়ে বাড়ি বানান।’

ধানক্ষেতের মতো লাগত জায়গাটা দেখতে, রেহানা ভাবেন, লম্বা রোমশ বুনো ঘাস, আর মাঝখানে একটা আমগাছ, যেন আকাশের দিকে আঙুল তুলে আছে। ‘কিন্তু আমি একে মেয়েমানুষ, তার ওপর আমার কোনো পুরুষ গ্যারান্টির নেই। কোনো ব্যাংক আমার দরখাস্ত মঞ্জুর করল না। আর তখন মিসেস চৌধুরী আমাকে বললেন, মি. কোরেশি নামে একজনকে তিনি চেনেন, তার ভাইয়ের পুরোনো বন্ধু আর সেই লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়েছে।’ আমি ব্যাংকে গেলাম—‘হাবিব ব্যাংক, চেনেন তো? মতিঝিলে ওদের একটা বড় অফিস আছে।’

‘সেই কোরেশি লোকটা একটা ফটকা। মিসেস চৌধুরীর বেশটা দোষ নেই—তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া আমার উচিত ছিল, কিন্তু আমি একাই গিয়েছিলাম, আর আমাকে নিশ্চয়ই খুব মরিয়া আর হতভম্ব দেখাচ্ছিল, আর লোকটা সেই সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করল।’

ওই তো লোকটা, তার গালের শক্ত দাড়ি রেহানার মুখের ওপর চেপে ধরা, আর হাত তার ব্লাউজের হাতার ওপর, রেহানা তাঁর মুখ থেকে সকালের নাশতায় খাওয়া তরকারির গন্ধ পেলেন, আর বাসি পুরোনো সাবান, আর তার জঘন্য পেশাটিক চাহিদা।

মেজর তখনও কিছুই বললেন না। তিনি দেখলেন মেজর টোঁটের ভেতর কামড় দিলেন, ডান দিকে, যে দিকটা ফেটে যায়নি।

‘তো আর কী, কোনো ঋণ পেলাম না। তখন মিসেস চৌধুরী ঠিক করলেন আমার একজন স্বামী খোঁজা উচিত। আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন, আমি তাঁর সব কথা শুনে চলি, আর এটা সত্যি, ওই সময় আমি যেন ঘুমের ঘোরে চলতাম। আর আমি মরিয়া হয়ে চাইতাম কেউ আমাকে চালিয়ে নিক। আমার সারা জীবনে মাত্র একটা সিদ্ধান্ত আমি নিজে নিয়েছি আর সেটা হলো ইকবালকে বিয়ে করা। আর সেটাও নিয়েছিলাম কারণ—মানে, কারণটা আমি আপনাকে আগেই বলেছি।’

কঠিন অংশ এখনো বাকি: বেচারী টি আলী, অন্ধ নরম-সরম মানুষ আর তাঁর ভুতুড়ে বউয়ের প্রসঙ্গটা।

‘মিসেস চৌধুরী বললেন টি আলীর কথা। উনি সবে আমাদের পাড়ায় এসেছেন। আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়—বেশ বয়স্ক একজন মানুষ,... আর তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন। তিনি চোখে দেখতেন না—আমি কি এটা আগে বলেছি? হ্যাঁ, তিনি অন্ধ ছিলেন। তবে ধনী ছিলেন তিনি; তাঁর বাবার চায়ের ব্যবসা ছিল; পৈতৃক সূত্রে তিনি বিপুল সম্পদের মালিক।’ শব্দগুলো টক্কর খেয়ে খেয়ে রেহানার মুখ থেকে বের হলো।

‘ভদ্রলোক বেশ শান্ত প্রকৃতির, আর মিসেস চৌধুরী তাঁর বাড়িতে আমাদের দাওয়াত করলেন, সেখানেই প্রথম দেখা হলো—ভদ্রলোক আমার সঙ্গে একটা কথাও বললেন না। তিনি খেলেন, মিসেস চৌধুরীকে ভদ্রভাবে বিদায় জানিয়ে চলে গেলেন। আমি নিশ্চিত তিনি তোমাকে পছন্দ করেছেন, মিসেস চৌধুরী বললেন।

‘আমি প্রায় সফল হয়ে গেছি। টি আলী আকারে-ইঙ্গিতে জানিয়েছেন, দ্বিতীয়বার বিয়ে করার ব্যাপারটা তিনি ভেবে দেখছেন, কিন্তু বসার ঘরে তাঁর স্ত্রীর ছবি রাখা আমাকে মেনে নিতে হবে। তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেন ছবিটা দেখার জন্য। আমি বুঝতে পারছিলাম না আমার যাওয়া উচিত কিনা, কিন্তু আমার কৌতূহল হলো, আর ভাবলাম, হয়তো তিনি একজন মিষ্টি স্বভাবের বয়স্ক মানুষ—একটু অদ্ভুত হতে পারেন—কিন্তু আমাদের যদি বিয়ে হয়, আমি তাঁকে সোজা জিজ্ঞেস করব, বিচারকের ঘুষের টাকা তিনি আমাকে দিতে পারবেন কিনা, আর লাহোরে যাওয়ার টিকিটের টাকা।’

টি আলীর বাড়ি বনেদি ছাঁচে বানানো, মধ্যখানে বিশাল প্রাঙ্গণ নিয়ে একতলা বাড়ি, যার প্রশস্ত বারান্দা, ঘরগুলো এর সঙ্গে লাগোয়া। রাস্তা থেকে বাড়িটাকে একটা দুর্গ মনে হয়। রেহানা ভেতরে ঢুকে দেখলেন বসার ঘর আধো আলো করা আর ভদ্রলোক চেয়ারে জড়সড় হয়ে বসে আছেন। তিনি পুরে আছেন চকোলেট-খয়েরি সুট আর গাঢ় লাল বো টাই। তাঁর হাত বুকের কাছে চেপে ধরা, আর রেহানার প্রথম দেখে মনে হলো তাঁর বোধহয় ওই মুহূর্তেই হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে, তিনি নিজের কপালকে অভিসম্পাত দিতে যাচ্ছিলেন। তখন উনি হাতটা

তুললেন, হাতে ছোট একটা ডিম্বাকৃতির ছবির ফ্রেম। তিনি এক হাতের তালুতে ছবির ফ্রেমটা ধরে অন্য হাত দিয়ে সেটা আদর করছিলেন। আমার রোজ, আমার মিষ্টি রোজ, কয়েকবার করে বললেন উনি। ঘরে—মোটাসোটা কাঠের পোক্ত সব আসবাব, পুরনো কার্পেট, মধু-রঙা দেয়াল, সবকিছুর ওপর রাজত্ব করা একটা প্রতিকৃতি—ঝুরঝুরে পলস্তারা আর সঁাতসেঁতে গন্ধ, রংগুলো একটা আরেকটার ওপর লেপ্টে আছে। রোজ এক অল্পবয়স্ক মহিলা, এত ফ্যাকাসে তাঁর চেহারা যে, দেখেই আভাস পাওয়া যায়, এ মহিলা বেশিদিন বাঁচবে না। পলকা হাত দুটো কোলের ওপর আড়াআড়িভাবে রাখা, গাউন পরে আছেন, তাঁকে দেখাচ্ছে ইংরেজ মেমসাহেবদের মতো, তাদের মতো যারা খুব গরমের সময়ও ছড়ানো, প্রশস্ত টুপি আর দস্তানা পরে। গাউনটা তাঁর গোড়ালি পর্যন্ত নেমে গেছে, উঁচু কলার ঘিরে লেস দেয়া হালকা মটরশুঁটি রঙের—আর তাতে থুতনি থেকে কোমর পর্যন্ত আঁটো হওয়া এক সারি বোতাম।

রেহানা ভাবার চেষ্টা করেন, এই মহিলার বায়বীয় উপস্থিতি আর নিচু চোখে তাকিয়ে থাকা তাঁর কেমন লাগবে। তিনি চৌকাঠ পার হয়ে ভেতরে পা রাখলেন।

‘আলী সাহেব,’ তিনি নরম করে বলেন।

‘আপনার গলার স্বর এত মায়াজারা,’ চেয়ারে হালকা চাপড় দিয়ে তিনি বলেন। ‘আসুন, বসুন। আপনাকে কি চা দিতে বলব? ফলের রস?’

‘না, ধন্যবাদ,’ রেহানা বলেন। আর তারপর, ‘আপনার স্ত্রী বেশ সুন্দরী।’

‘হ্যাঁ, ও খুব সুন্দরী ছিল। মাত্র কয়েক বছর আমরা একসঙ্গে ছিলাম।’

‘আমি দুঃখিত।’

কালো পোশাক আর চপ্পল পায়ে একটা লোক ট্রে হাতে ভেতরে ঢুকল। সে কার্পেটের কিনারে এসে চপ্পল খুলল, তারপর খালি পায়ে এগিয়ে গেল। ট্রেটা সে রেহানার সামনে রাখল। ট্রের ওপর লম্বা দুটো গ্লাসে গোলাপি রঙের পানীয় আর ওপরে পুরু ফেনা ভাসছে।

‘গোলাপজল শরবত’, টি আলী বলেন। তাঁর কণ্ঠে হালকা অহঙ্কার উঁকি দিল। ‘আমার গোলাপঝাড় আছে।’

শরবত অতিরিক্ত মিষ্টি, রেহানার চোয়াল শিরশির করতে লাগল। ‘খুব ভালো,’ তিনি বলেন। গোলাপঝাড়ের কথায় খুশি লাগছে তাঁর। টি সাহেবের বাগিচা কল্লনা করার চেষ্টা করলেন তিনি, ঝুঁকে আছেন চারাগাছগুলোর ওপর, ঘাড়ে রোদের তাপ এসে লাগছে। হয়তো এই উদ্ভিদলোককে তিনি বিয়ে করতে পারেন। বাড়ি তো অবশ্যই অনেক বড়। ছবিঝালানো থাকলেই-বা কী? হাজার হোক মহিলা তো মারা গেছেন।

‘ওকে আপনার কেমন লাগল,’ হাতের লাঠি তুলে ছবিটার দিকে দেখিয়ে বললেন টি আলী।

‘খুব সুশ্রী,’ রেহানার উত্তর।

ভদ্রলোক গলা পরিষ্কার করেন। ‘আমার যক্ষ্মা হয়েছিল, খুব অসুস্থ ছিলাম—ডাক্তার বলল আমার আর বেশি সময় বাকি নেই। আর তখন আমার স্ত্রী বলল, ‘না, আমি ওকে মরতে দেব না।’ ও আমার বিছানার পাশে বসে হাত ধরে থাকত—আমার মনে পড়ে না, পরে আমি অন্যদের কাছে শুনেছি। বলল, ‘আমাদের সন্তান হয়নি।’ ওর এই কথা আমার মনে আছে। ও খোদার কাছে প্রার্থনা করল, কোনো সন্তান হওয়ার আগে খোদা যেন ওর কাছ থেকে আমায় নিয়ে না যান। সে সব সময় দোয়া করত, প্রত্যেক দিন।’

টি আলীর চোখে পানি চলে এলো। তিনি রেহানার ওপর থেকে মুখ সরিয়ে নিলেন। পকেট থেকে রুমাল বের করলেন আর চশমা খুলে কাচ মুছলেন।

‘আমি অসুস্থ ছিলাম। খোদার অসীম করুণায় যখন সেরে উঠলাম, সেটা ১৯৪৩ সালের কথা। আর তারপর সেই বছরই ও মারা গেল। যক্ষ্মায়। আমি ওকে বাঁচাতে পারিনি।’

তাঁর স্বর হালকা হয়ে বুজে এলো। ‘ও ছিল এক অসাধারণ মহিলা।’ তিনি মাথা নাড়েন, আর তাঁর মুখ নড়তে লাগল যেন স্মৃতির জাবর কাটছেন। এতে তাঁকে আরও বৃদ্ধ দেখাল। রেহানা ভদ্রলোকের বয়স অনুমান না করতে চেষ্টা করলেন। ‘চলুন, আপনাকে দেখাই।’

তিনি উঠে দাঁড়ালেন আর লাঠি হাতে হেঁটে গেলেন মুখস্থ হওয়া ঘরের মধ্য দিয়ে। তাঁর পদক্ষেপ হালকা আর প্রত্যয়ী। রেহানা তাঁকে অনুসরণ করে স্বস্তিবোধ করলেন। ভদ্রলোক দরজা খুলে ধরে রেহানাকে এগিয়ে যেতে ইঙ্গিত করেন। ভদ্রলোকের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় রেহানার নাকে এসে লাগলো ন্যাপথলিনের ধূলিময় মিষ্টি গন্ধ। আশ্বস্ত হলেন—না, অত খারাপ গন্ধ নয়।

আলোহীন করিডোর দিয়ে নিয়ে গেলেন ভদ্রলোক; তারপর হাত বাড়িয়ে একটা দরজার হাতল ঘোরালেন। ‘জানেন’, তিনি বললেন, ‘এই ঘর যেমন ছিল আমি ঠিক সেভাবেই রেখে দিয়েছি।’

খুব স্বচ্ছন্দে পুরো ঘর ঘুরে বেড়ালেন ভদ্রলোক, দেখালেন এটা-ওটা। মনে হলো, এই বাড়িতে, বিশেষ করে এই ঘরে তিনি যেন আর অন্ধ নন। ঘরের কোনায় একটা পিয়ানো, বাঁকানো চৌকির মতো ঢাকনা এর সিঁড়ির ওপরে তুলে ধরা। পাশে একটা চেয়ার রাখা, গোলাপি একটা গাউন চেয়ারের পেছনে ঝালরের মতো পড়ে আছে। টি আলী সেই গাউন হাত দিয়ে ছুঁলেন আর বললেন, মারা যাওয়ার আগে এই গাউন তাঁর স্ত্রীর পরনে ছিল। সেখানে একটা ড্রেসিং টেবিল ছিল, সামনে ত্রিযুগল মখমলের সিঁট, সেটার ধাতব আংটা জং ধরে কালো। টেবিলের ওপর রূপালি হাতলওয়ালা চুলের ব্রাশ, একটা গয়নার বাক্স আর একটা পাউডার প্লেট, যার পাফ প্লেটের ওপর উপড় করে রাখা, রোজের

সুশ্রী মুখে বুলিয়ে দেয়ার জন্য তৈরি।

‘আপনি কি পিয়ানো বাজান?’ রেহানা জিজ্ঞেস করেন। তিনি পিয়ানোর কাছে এগিয়ে যান।

‘আমি? না,’ ভদ্রলোকের উত্তর।

‘দ্য ওয়েল টেম্পারড ক্ল্যাভিয়ার’ পিয়ানোর ওপর কালো কালিতে একটা পাতার ওপর প্যাচানো হাতে লেখা।

‘খুব সুন্দর,’ রেহানা কোনোভাবে বললেন। আর কী বলবেন ভেবে পেলেন না। ঘরটা গরম আর গুমোট। এখানে ফিসফিস করে কথা বলতে ইচ্ছা হয়। ঘরটা তাঁর মনে আকাজক্ষার বীজ বুনে দিচ্ছিল—ইচ্ছা করছিল চুল আঁচড়াতে আর ঠোঁটে লিপস্টিক বুলাতে।

তিনি আয়নার দিকে ঘুরে নিজের চেহারা ভালো করে দেখে নিলেন। গাল দুটো গরমে লালচে হয়ে আছে। নিজের চেহারার সাধারণত্ব তাঁর চোখে পড়ল, আর মাড় দেয়া ধবধবে সাদা শাড়ি। মিসেস টি আলীর শাটিনের গাউন, তাঁর ফ্যাকাসে ঠোঁট জোড়া, জর্জেট ঝালর নিয়ে রেহানার সামনে ঝলকে উঠল।

এখানে বসবাস করার দৃশ্য কল্পনা করলেন রেহানা, এই ধুলোময়, জমাটবাঁধা জগতে। নিজের বাংলোর চিন্তা মন থেকে জোর করে তাড়ালেন, তাঁর লেবুগাছ, বেলি ফুল ঘিরে ভ্রমরের গুঞ্জন। এই সিদ্ধান্ত তাঁকে নিতেই হবে। এই ভার তাঁকে বইতেই হবে। এটা ভালোবাসা নয়, সে কথা সত্যি, কিন্তু এর চেয়েও খারাপ কিছু ঘটতে পারে।

রেহানা চুলের ব্রাশ হাতে নেন, ড্রেসিং টেবিলের ধুলোর ওপর সেখানটায় জেগে ওঠে পালিশ করা কাঠের ঝিলিক। ব্রাশটা রাখতে যেতেই তাঁর হাত লাগল পাউডারদানিতে।

টি আলী ঘুরে রেহানার মুখোমুখি হলেন। ‘দয়া করে কিছু ধরবেন না,’ তিনি বললেন। রেহানার হাত থেকে জিনিসটা নেয়ার জন্য তিনি দ্রুত এগিয়ে এলেন। রেহানার কনুইয়ের সঙ্গে ধাক্কা খেলেন তিনি। তারপর রেহানার হস্তের ওপর দিয়ে হাত ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগোলেন যতক্ষণ পর্যন্ত না ব্রাশের নাগাল পান। তিনি সেটা শক্ত করে ধরলেন। তাঁর ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলা অন্তরঙ্গ অনুসন্ধানী হস্তের স্পর্শে রেহানা কঁকড়ে গেলেন। কেন জানি রেহানাও ব্রাশের হাতল আঁকড়ে ধরলেন আর হাত থেকে সেটা ছাড়তে চাইলেন না। তাদের মধ্যে কয়েক মুহূর্তের জন্য ধস্তাধস্তি হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত রেহানার হাত থেকে ব্রাশটা পিছলে না গেল।

টি আলী ব্রাশটা উল্টো দিকে টানছিলেন। সেটা তার মুঠো ফসকে ছুটে গেল আর গিয়ে ঠাস করে ধাক্কা খেল আয়নায়।

সঙ্গে সঙ্গে আয়নার কাচ চুরমার হয়ে যায়নি। একটা ঘূর্ণির মতো ফাটল যেন চোখ মেলল, ছড়িয়ে পড়ল আয়নার ওপর থেকে নিচে। তারপর কাচের

টুকরোগুলো পড়তে শুরু করল, প্রথমে ধীরে, এরপর সহসাই বানবান করে।

টি আলী আয়নার দিকে ছুটে গেলেন।

‘কী করছেন আপনি?’

‘উজবুক মেয়ে!’

রেহানার দিকে চিৎকার করার সময় এক দলা থুথু তাঁর ঠোঁট দিয়ে বেরিয়ে এলো। তারপর তিনি হাঁটু মুড়ে দু’হাতে ভার দিয়ে মাটিতে বসে পড়লেন, কাচের টুকরোগুলোর মধ্যে কী যেন খুঁজতে শুরু করলেন।

‘আমি খুবই দুঃখিত। আপনাকে এ রকম অস্থির করতে চাইনি।’

‘সব ছারখার করে ফেলেছেন!’

‘প্লিজ আলী সাহেব, দয়া করে উঠে দাঁড়ান।’

‘বেরিয়ে যান! বেরিয়ে যান এখান থেকে! এটা আমার রোজের ঘর!’

রেহানা টি আলীর হাত ধরে টান দিলেন। তিনি ডুকরে কেঁদে উঠে বললেন, ‘আমি বলছি আপনি বেরিয়ে যান!’

রেহানাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে টি আলী নিজের মনে বিড়বিড় করে কী যেন বলে যেতে থাকলেন। রেহানা ভাঙা কাচের টুকরোর ওপর থেকে তাঁর হাত সরিয়ে দিতে আবার চেষ্টা করলেন। তারপর হঠাৎই গয়নার বাস্‌টো তাঁর চোখে পড়ল, ঢাকনা খোলা, শিলের মতো ভাঙা কাচের টুকরোর মধ্যে একদিকে হেলে পড়ে ছিল। কিছু চিন্তা না করেই তিনি তুলে নিলেন সেটা, পায়ের নিচে চাপা-পড়া ভাঙা কাচের শব্দে ঢাকনা লাগানোর শব্দ ঢাকা পড়ল। রেহানা নিশ্চিত ছিলেন যে, ভদ্রলোক তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন, মনের মানচিত্রে ঘরের নিখুঁত ছবি তাঁকে ধরিয়ে দেবে।

কিন্তু টি আলী নিশ্চল। ‘আপনি এখনো যাননি? আমি বলছি, আমাদের শান্তিতে থাকতে দিন। চলে যান। আহা রে, আমার হতভাগী রোজ।’

রেহানা দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

টি আলী নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। অবশ্যই জানবেন। গয়নার বাস্‌টো দরজার কাছে রেখে যাওয়ার কথা একবার ভাবলেন রেহানা, এখনো খুব বেশি দেরি হয়নি; অন্তত এটা নিয়ে ধরা পড়ার চেয়ে তো ভালো, যে কোনো মুহূর্তে ভদ্রলোক তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন; তিনি দেখতে পারেন রেহানা জানেন, তিনি দেখতে পান। কিন্তু মুহূর্ত পরেই দরজার বাইরে বেরিয়ে এলেন রেহানা। তারপর ছুটে করিডোর পার হলেন; বসার ঘরের মধ্য দিয়ে, যেখানে গোলাপজল শরবত ওরা পান করেছে; সামনের দরজা খুললেন, নেমে পড়লেন রাস্তায়, যেখানে অন্ধকার তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রাস করে নিল; আর তারপর বাড়িতে, যেখানে বিছানায় তিনি গুটিগুটি মেরে ফুঁপিয়ে কাঁদলেন, আর খুশিতে হাসলেন, আর ফুঁপিয়ে কাঁদলেন।

‘চুরি করলেন,’ মেজর বললেন। অন্ধকারে তার প্রতিক্রিয়া বোঝা গেল না।

‘হ্যাঁ,’ রেহানা বললেন, ‘হ্যাঁ, আমি চুরি করলাম।’

‘একজন অন্ধ লোকের কাছ থেকে।’

ও তাঁকে ঘৃণা করবে, তিনি জানতেন। কিন্তু এখন আর ভেবে কী হবে! ‘হ্যাঁ, একজন অন্ধ লোকের কাছ থেকে।’

‘আর তাঁর মৃত স্ত্রীর কাছ থেকে।’

‘হ্যাঁ, আমি তো বললাম। টি আলীর স্ত্রী।’

রেহানা কি কিছু শুনলেন—ও কি কাঁদছে?—আর তারপর মেজর তাঁর হাঁটুতে থাপ্পড় দিলেন, একবার, দুইবার। গলা পরিষ্কার করে ঢোক গিললেন।

‘আমি দুঃখিত—এটা আসলে...।’

‘কী?’

‘এই কথা আপনি এত দিন গোপন রেখেছেন?’

‘হ্যাঁ, ঘৃণাক্ষরেও কাউকে বলিনি।’

তিনি আবার পায়ে চাপড় দিলেন। এখন তাঁর নিশ্বাস ঘরঘর করছে আর রেহানা তাঁকে দেখতে না পেলেও বুঝতে পারলেন তাঁর মুখ খোলা আর চেষ্টা করছে, কষ্টেস্টে চেষ্টা করছে কথা বলতে। ‘আমি ভাবলাম, নিদেনপক্ষে কাউকে খুন করেছেন আপনি।’

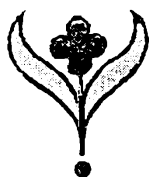
‘এটা বলার মতো কোনো কথা হলো?’

মেজর কথা বলার চেষ্টা ছেড়ে দিলেন, আর এখন তিনি শুধু হাসছেন, হা হা করে—ছেলেমানুষি, বোকা হাসি। রেহানা তাঁর গলার পেছনে সুড়সুড়ি অনুভব করলেন। একটু কেশে তা তাড়িয়ে দিতে চাইলেন। আবার সুড়সুড়িটা ফিরে এলো। মেজরকে ধমক দিয়ে যেন নিজে আশ্বস্ত হতে চাইলেন। ‘আপনার ধারণা এটা তামাশা?’

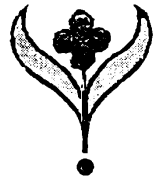
‘না, না। অবশ্যই এটা তামাশা নয়।’ আবার ওর নাক যেন ঘর্ঘর করে উঠলো। ‘মাফ করবেন!’

‘ছিঃ! আমার জীবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর লজ্জার ঘটনা আপনাকে বললাম, আর আপনি হাসতে শুরু করলেন।’ রাগ করে ঘুরে দাঁড়ালেন রেহানা, মরটা অন্ধকার থাকায় স্বস্তি পেলেন তিনি, এখন মেজর তাঁর মুখের ভাব ধরতে পারবেন না। সেই মুখে এখন এক টুকরো হাসি থাকতে পারে অথবা বেদনার ছকুটি। আর তাঁর গলার ভেতরের সুড়সুড়িটা হাসির দমক হতে পারে অথবা অশ্রু। সব মিলেমিশে একাকার: বেদনা, তামাশা, আবার তামাশাও নয়। তিনি পরোক্ষ করলেন না, মেজরকে ওখানে রেখে চলে এলেন। শেষ হয়ে যাওয়া সিনেমার স্বপ্ন আভায় প্রজেক্টর তখনো সরসর শব্দ করছে অন্ধকারে, মেজরের মাথা পেছনে হেলিয়ে পড়েছে কৃতজ্ঞতায়, এমন প্রাণখোলা হাসছেন যেন এইমাত্র রেহানা তাঁকে কোনো মেডেল দিয়েছেন।

জুলাই



লালমুখো পাখি



এখন সবে জুলাই মাস, বৈপরীত্যের মাস আগস্ট এখনো আসেনি। আগস্টে, সকালগুলো অসহ্য রকম টলটলে, বাতাস গাঢ়, মেজাজ খিটখিটে; বাড়ির বউঝি আর পরোটাওয়ালা আর জিলাপিওয়ালা সকালের নাশতা বানানোয় জীবনপাত করে, বাচ্চারা সিন্ধু চাদরে জেগে ওঠে আর তাদের মুখ সঁয়াতসঁতে রোমশ তোয়ালেয় মুছে নেয়। তারপর দুপুর আর গোধূলির মাঝামাঝি কোনো এক রহস্যময় সময়ে আকাশ নিজের দম আটকে রাখবে, বাড়তে থাকবে উত্তাপ, মানুষজনের গলার কাছে বাতাস তখন স্থির হয়ে যাবে, একটুও নড়বে না, দরদালানের মতো অনড় হয়ে যাবে সবকিছু, তখন তৈরি হবে একটা নিঝুম নীরবতা, মাঝে মাঝে কেবল নগরবাসীর হা-হতাশের আওয়াজ, হয়তো দুপুরের খাবার খাচ্ছে, নতুবা তোশকের ওপর এ-পাশ ও-পাশ কষছে, তর্ক করছে চুপচাপ পড়ে থাকলে নাকি নড়াচড়া করলে বেশি গরম লাগে, পাওয়া যাবে পুরু প্রসাধনী আবৃত মহিলাদের মুখের ওপর দ্রুত তালে হাতপাখা নাড়ানোর আওয়াজ, চওড়া বুক পুরুষদের নিজেদের ঘাড়ে পাখার বাতাস স্কিরার শব্দ। অথচ এই নিশ্চলতার পরেই মেঘ আর অন্ধকার দানা বাঁধবে, মুঘলধারে নেমে আসবে উল্লসিত বৃষ্টি, মিষ্টি পানির ধারা; চিড় ধরা বজ্রপাত আর বিজলির স্কুলিং। সব মিলিয়ে যেন আবহাওয়ার এক কুচকাওয়াজ, গরমে নেতানো, শ্রান্ত-ক্লান্তদের ভোজসভা; আর

প্রতিদিন একটা ছোট ছেলে বা অতি বৃদ্ধ কেউ, এমনকি কোনো কুকুর যে আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকায় আর জিভ সোজা বের করে রাখে, অপেক্ষায় থাকে যে কখন কোন লগ্নে বৃষ্টির প্রথম নাদুসনুদুস ফোঁটা টপাস করে পড়বে, তার চেহারায় আশা টগবগ করে ফোটে, সকালের দমবন্ধ হওয়া অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়।

কিন্তু মাসটা আগস্ট মাস নয়, জুলাই, মিনমিনে, দ্বিধান্বিত মাস—সামনে একটা কিছু হবে এই হুমকিতে ভীর্ণ হয়ে থাকা একটা মাস। কেবল প্রস্তুতির মাস।

এরকমই এক অন্তর্বর্তী দিনে ১২ নম্বর থেকে ভেসে এলো বিলাপের ধ্বনি, কোনো এক মহিলা পানির জন্য মরিয়া আকুতি জানাচ্ছেন, কপালে বরফ-ঠাণ্ডা পানি দিতে বলছেন। রেহানা মহিলার শিয়রে গিয়ে বসলে, তিনি কঁকিয়ে উঠলেন, ‘আহা রে মেয়েটা আমার, লক্ষ্মী মেয়েটা আমার!’ বাগানে তখন জুলিয়েট নামের কুকুরটা বিকেলের দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করছে।

যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত মিসেস চৌধুরীর নাগাল পেল।

তিনি লম্বালম্বি হয়ে শুয়ে ছিলেন, একটা ভেজা ন্যাকড়া তাঁর কপালের ওপর চেপে ধরা। বাতাস চিরে সিলিং ফ্যান ঘুরছে পূর্ণ গতিতে। পাটের হাতপাখা দিয়ে সিলভি তাঁর মায়ের মুখে বাতাস করছে। সিলিং ফ্যান আর হাতপাখার বাতাসের মধ্যে মিসেস চৌধুরীর মুখ চিড়েচ্যাপ্টা, চুল কপালের সঙ্গে লেপটানো।

‘জোরে, জোরে! আমার কী যে গরম লাগছে!’ মিসেস চৌধুরী বললেন। ‘সিলভি, থার্মোমিটার আন। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছি।’

সিলভি হাতপাখাটা নির্বিকারভাবে রেহানাকে দিয়ে থার্মোমিটার আনতে যায়। পাখার বৃত্তের সীমানা কেউ লাল সুতো দিয়ে টানা সেলাই করেছে, লাল রঙে ডোবানো ঝিনুকের মতো দেখাচ্ছে পাখাটা।

‘এই গরম লাগছে, তো এই ঠাণ্ডা!’ মিসেস চৌধুরী ডুকরে উঠলেন, রেহানা পাখা দিয়ে তার ওপর সামনে-পেছনে বাতাস করতে থাকলেন, মিসেস চৌধুরীর লতানো খোলা চুল ভেসে একবার এদিক, আরেকবার ওদিক যাচ্ছে। মিসেস চৌধুরীর শোবারঘর পরিবারের পুরোনো জিনিসপত্রে ঠাসা বিশাল এক পালঙ্ক, যেটায় ওঠার জন্যই সিঁড়ি দরকার, ডিম্বাকার আয়নার ড্রেসিং টেবিল, দেয়ালজুড়ে পাকা সেগুন কাঠের ওয়ার্ডরোব, প্রত্যেকটার মধ্যে বাচ্চা মুঠোর সমান হাঁ-করা চাবির মুখ। মিসেস চৌধুরীর শাড়িতে সোনার চাবির গোছা গোঁজা, সেই গোছায় আছে এই ওয়ার্ডরোব আর অন্যান্য দরকারি তালার চাবি: চিনি আর তেলের ভাঁড়ার ঘরের, সামনের পেছনের গেটের, বসার ঘরের (যা বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য তালাবদ্ধ থাকে আর চাদরে থাকে ঢাকা), ফ্রিজের এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

গয়নার সিন্দুকের চাবি, সিন্দুকটা মিসেস চৌধুরীর ভারি লোহার আলমারির ভেতরে বসানো।

মিসেস চৌধুরীর বাড়ির বাকি অংশটা তার সুদিনের জাদুঘর। ঘরের পর ঘর পারিবারিক নানা সাবেকি জিনিস অগোছালোভাবে রাখা। কোনো ঘর এত ঘিঞ্জি যে আসবাব এবং রূপার মলিন মোমদানিগুলোর ফাঁকফোকর দিয়ে হাঁটাচলা করাই মুশকিল, নটরাজ আর ভেনাস ডে মিলোর মূর্তি পরস্পরের গায়ে ঠোঁকর খেয়ে আছে; অন্য ঘরগুলো প্রায় খালি, এক ঘরে একটা গ্র্যান্ডফাদার ক্লক একমনে টিকটিক করছে, আরেক ঘরে একটা শূন্য পাখির খাঁচা, খোলা জানালার হাওয়ায় দুলছে, সঁয়াতসেঁতে ফোসকা পরা দেয়ালে কঁচাচকঁচা প্রতিধ্বনি তুলছে। মিসেস চৌধুরীর বাড়িটায় চুইয়ে ঢুকে পড়ছে অমঙ্গলের বাতাস, একটা শঙ্কা যে কিছু একটা ঘটবে, ভেতরের এই বিষণ্ণ নিখর বাতাস নাড়া খাবে তাতে। খুব কম লোকই জানে ওনার বাসার ভেতরের এই হালের সত্যিকার কারণ, রেহানা সেই স্বল্পসংখ্যকদের একজন: মিসেস চৌধুরী এখনো বহুদিন-নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর ফিরে আসার অপেক্ষায় আছেন।

সিলভি থার্মোমিটার নিয়ে ফিরে আসে, মায়ের খোলা মুখে সেটা ঢুকিয়ে দেয়। রেহানার দিকে ঘুরে তাকিয়ে অস্ফুটে বলে, ‘সাবির ধরা পড়েছে।’ ওর গলা ভাবলেশহীন, নির্বিকার।

মিসেস চৌধুরী চেপে ধরা ঠোঁটের ভেতর দিয়ে কথা বলার চেষ্টা করেন। ‘এক মিনিট অপেক্ষা করো,’ সিলভি তাঁকে বলে। আর তারপর, ‘আম্মু, তোমার তো জ্বর নাই।’

‘রেহানা,’ মিসেস চৌধুরী বলেন, ‘আমার মেয়েটার এই হলো কপাল। আমি জানতাম, ছেলেটাকে বিয়ে করা ওর উচিত হচ্ছে না।’

‘কী হয়েছে?’

‘ওর বাহিনী ময়মনসিংহে পাক আর্মির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল,’ সিলভি শুরু করে।

‘এর মধ্যে আমরা কেন জড়িলাম,’ ওর মা মাঝখানে বলে উঠলেন। ‘তোর দোষ, সিলভি, তুই একেবারে পাগল হয়ে গেলি বিয়ে করতে...কারণ কী, ও সামরিক অফিসার। গলে গেলি তুই। পাখা করুন, জেঁপে, রেহানা, আমি পুড়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমি কখনো মিলিটারির লোককে বিশ্বাস করি নাই, কখনো না। ওরা কখন যে কোন বিপদে ফেলবে, টের পাবেন না। এই মেয়ে, আমার জ্বর কত বললি? নাইনটি এইট? হতেই পারে না। আবার দেখ না। না, এভাবে না। আগে ধুয়ে নে। যা, ওটা ধুয়ে আবার নিয়ে আয়।’

সিলভি যাওয়ার জন্য ঘুরল, আর তখন রেহানা লক্ষ্য করলেন যে, ওর চুল

ওড়না দিয়ে ঢাকা। প্রথমে তিনি ভাবলেন, সিলভি হয়তো জোহরের নামাজ পড়ার জন্য তৈরি হচ্ছে, কিন্তু মিসেস চৌধুরীর বিছানার ওপর রাখা দেয়াল ঘড়িটায় তাকিয়ে দেখলেন, এখন মাত্র দুপুর, আজান দিতে এখনো এক ঘণ্টা বাকি।

‘সব আল্লার ইচ্ছা’, ফিরে এসে সিলভি বলল। চামড়ার থলেতে থার্মোমিটার ভরে রাখে সে।

‘আল্লাহর ইচ্ছা-টিচ্ছা কিছু না,’ মিসেস চৌধুরী বললেন। ‘রেহানা আপনি টের পাচ্ছেন, সিলভির কী যেন হয়েছে? মাথা ঢাকছে, হঠাৎ করে পর্দা করছে; পুরো সময় কোরআন শরিফ পড়ে কাটাচ্ছে। বোকামি, এছাড়া আর কিছু না। সাবিরের দেশ ছেড়ে পালানো উচিত ছিল সোহেলের মতো। আপনার সন্তানদের হুঁশজ্ঞান আছে। সাবিরকে কী ভূতে পেল, এই ফালতু আর্মিতে গিয়ে যোগ দিতে গেল? তোর বর একটা গর্দভ সিলভি, একটা গর্দভ আর একটা মরা মানুষ।’

‘ওরা হয়তো ওকে ছেড়ে দেবে,’ রেহানা বলতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু মিসেস চৌধুরী কিছুই শুনলেন না।

‘আমার এখন খেতেও রুচি হয় না,’ তিনি বললেন। ‘আমি খেতে পারি না, ঘুমাতে পারি না, কী যে গরম।’

‘প্লিজ আপা, আপনি তো অসুস্থ হয়ে যাবেন।’

‘আমরা জানি না ও কোথায়, কী হয়েছে। ধরা যে পড়েছে সেটাও জানতে পারতাম না, ওর এক সৈনিক বন্ধু সিলভিকে একটা চিঠি না পাঠালে। ওনাকে চিঠিটা দেখা সিলভি।’

সিলভি মাথা নাড়ে, কিন্তু চিঠি আনতে যায় না। মায়ের পা মালিশ করে দিচ্ছিল সে, পায়ের গোড়ালিতে বুড়ো আঙুল দিয়ে ঘুরিয়ে মৃদু মৃদু চাপ দিচ্ছিল।

চাঁদোয়া টানানো পুরোনো খাটে, মিসেস চৌধুরীর দশাশই শরীর ময়দার টাটকা ময়ানের মতো দেখাচ্ছে।

‘এখন আর কিছু করার নাই রেহানা। আপনাকে ডেকেছি সেটাও জানি না। কিছুই জানি না। আমি ভেবেছিলাম ও বরং আমাদের রক্ষা করবে।’ মিসেস চৌধুরী চোখ বন্ধ করে হাত নেড়ে রেহানাকে চলে যেতে বললেন। গভীর শ্বাস নিয়ে তিনি পাশ ফিরে গুলেন; কয়েক মিনিটের মধ্যে হুলকা নাক ডাকার শব্দ শোনা গেল। সিলভি রেহানার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, ‘খালামগি, থ্যাঙ্ক ইউ, আপনি এসেছেন।’

‘সন্ধ্যার সময় আমি কিছু খাবার নিয়ে আসিব,’ এটুকুই রেহানা শুধু বলতে পারলেন। সাবির কীভাবে ধরা পড়ল? ধরা পড়ার বিষয়টাই-বা এরা জানল কীভাবে? আর সিলভির এই নতুন ভাবসাবের কী রহস্য, ওর শান্ত আত্মপ্রত্যয়, অন্য যে কোনো স্ত্রীর মতো বিলাপ করা বা বুক চাপড়ে হাউমাউ করে কাঁদার

বদলে মায়ের পায়ের পাতা টিপে দেয়া? রেহানার গা হালকা ঝিমঝিম করে, যেন সারা দিন কিছু খাননি তিনি।

দুপুরের খাবারের পর সিলভি ছোট একটা কাপড়ের থলে হাতে সামনের দরজায় এসে দাঁড়ায়। হাঁপাচ্ছে। খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওকে, যেন লাফিয়ে রাস্তা পেরিয়ে এসেছে, গরমকালের গন্ধের মতো ঘ্রাণ বেরোচ্ছে ওর গা থেকে: ডাঁই করে দেয়া সুগন্ধি পাউডারে ঢাকা ঘামের গন্ধ। পরনে একটা টিলেঢালা ফুলহাতা সালোয়ার-কামিজ, চুল মাথা আঁটো করে ওড়নায় বাঁধা।

‘আম্মু ঘুমাচ্ছে,’ দোপাটা খুলে বলল সিলভি।

রেহানা দেখলেন, সিলভির চুল খুলে পড়লো। তিনি এক গ্লাস পানি ঢেলে দিয়ে বললেন, ‘নাও, খাও।’ সিলভি এক চুমুকে পানি শেষ করল। ‘সোবহান আল্লাহ’ বলে সজোরে গ্লাস নামিয়ে রাখল। তারপর যেন ইতিমধ্যে তারা একটা আলোচনার মাঝখানে আছে, এমন ভঙ্গিতে বলল, ‘আমার জন্য এটা বলা খুব ধৃষ্টতা হবে, আমি আল্লাহকে খুঁজে পেয়েছি বা আল্লাহ আমাকে খুঁজে পেয়েছেন। আমরা তাঁকে খুঁজে পাওয়ার কে, যিনি পবিত্রতম, সবার ওপরে পরম মহিমাময়? কারণ তিনি সবখানে, সবার নিশ্বাসে, সবার হৃদয়ে আছেন। সন্ধান করলেই দেখা মেলে।’ সিলভির চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে। ‘এই জীবন কিছু না, শুধু ফাঁকি...আপনি তা দেখতে পান না খালামণি? এই পার্থিব জীবন, এই দুঃখকষ্ট।’ ওর হাত অস্থির হয়ে ওড়না নিয়ে খেলা করে, কামিজের হাতা সমান করে ও। ‘আপনি তো আমাকে নামাজ পড়া শিখিয়েছিলেন, মনে আছে? আম্মুর ধৈর্য ছিল না। আপনি শেখালেন। এ কাজের জন্য আপনি অনেক সোয়াব পাবেন।’

অবাক হয়ে রেহানা সিলভির দিকে ধন্যবাদসুলভ মাথা নাড়েন। সিলভির কাঠি কাঠি হাতগুলো মনে পড়ে তাঁর, যখন সে হাত তুলত—একবার, দু’বার, তিনবার—কপালে ছোঁয়াত।

‘শুধু যদি আমরা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি, আল্লাহ সব গুনাহ মাফ করে দেন। সেজন্য প্রতিদিন আমি ক্ষমা ভিক্ষা করি।’

‘কিসের জন্য ক্ষমা চাও তুমি?’

সিলভির মুখ ঘষেমেজে সাফ করা, তাকে দেখাচ্ছে স্বচ্ছ, অমলিন। সব রং ঝাপসা হয়ে ফ্যাকাশে গোলাপি, শুধু ওর গাল দুটো বাদে, সেখানে রক্ত চলাচল হচ্ছে, লালচে এবং জীবন্ত। ও নিশ্বাস নেয়, একটু ইতস্তত করে আর মুহূর্তে রেহানা মেয়েটার পুরো অতীত দেখতে পান; ওর মায়ের শ্বাসরুদ্ধকর কিন্তু অদ্ভুতরকম নির্বিকার ভালোবাসা; বিশাল ঘিঞ্জি বাড়ি, বাবাকে হারানোর ভার, ও যদি ছেলে হতো ওর বাবা হয়তো থেকে যেতেন, এই সত্য জানার কষ্ট। রেহানা

সব সময় কল্পনা করতেন, তিনি সিলভির ভেতরটা দেখতে পান; যে অপরাধবোধ ও বহন করে ঘুরে বেড়ায় তা দেখে রেহানার নিজের অপরাধবোধের কথা মনে পড়ে যায়, নিজের ভারের কথা। কিন্তু এখন, ওর এই সরলতায়, সিলভি শিকারির মতো হিংস্র।

সিলভি ওর ব্যাগ আঁকড়ে ধরে, কিছু বলতে চেষ্টা করে। অবশেষে যখন ও মুখ খোলে, ওর কথা পোশাকি শোনায়, অনেকটা আবৃত্তির মতো। ‘এগুলো আপনাকে দিতে চাই আমি। পুড়িয়ে ফেলতে পারতাম, কিন্তু আমি চাই আপনি সাক্ষী থাকেন, আমি যে এগুলো আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি তার। এগুলোর মায়া আমি একেবারে ছেড়ে দিচ্ছি, সেটা যাতে আপনি জানতে পারেন। আমি একজনকে চেয়েছিলাম—আপনাকে, আমি আপনাকে চেয়েছিলাম, জানানোর জন্য।’ শব্দগুলো এখন ওর মুখ থেকে দুদার করে বের হচ্ছে। ‘আল্লাহ সব দেখতে পান, তিনি সাক্ষী আছেন, সেটাই আমার জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমি লজ্জিত যে, সেটা হয়নি।’ সিলভি তার হাত কপালে রেখে চুলের সিঁথি পাট পাট করে।

‘সাবিরের ঘটনায় আমি খুব দুঃখিত সিলভি,’ রেহানা শেষে বলেন। ‘কিন্তু এই খবর তো গুজবও হতে পারে, তুমি কীভাবে নিশ্চিত হলে?’

‘এটা গুজব না।’

‘তুমি কীভাবে জানো?’

‘সোহেল,’ সিলভি এমনভাবে বলল যেন এই দোষ সোহেলের অথবা রেহানার, কিন্তু ওদের দু’জনকেই ও ক্ষমা করে দিয়েছে।

রেহানার মনে হয়, তাঁর হৃৎস্পন্দন থেমে গেছে। ‘তোমার সাথে ওর দেখা হয়েছে?’ তিনি জিজ্ঞেস করেন, চেষ্টা করেন গলা উঁচু না করতে। ‘ও কোথায়?’

‘না। আমি ওকে দেখিনি। আমি পর্দা করি। পরপুরুষের সামনে আমি যাই না।’

পরপুরুষ? সিলভির হলো কী? কোন ধর্ম ওকে গ্রাস করল? তার ধর্ম তো নয়। রেহানা নিজে অধার্মিক নন। প্রতিদিন নামাজ পড়েন, অন্তত একবার হলেও মাগরিবের সময়, নামাজ কালামের জন্য দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় সেটা। ইকবাল যখন মারা গেল, তিনি নামাজ পড়তেন শুধু কিছু একটা করার জন্য, সে কারণে এই প্রশ্ন তাঁর মাথায় আসেনি যে, এই নিষ্ঠুর জীবন তাঁকে কী দিয়েছে, আর এই প্রার্থনা থেকে তিনি যে সাহায্য পেতেন তার জন্য তিনি লজ্জা বোধ করতেন না। জীবন তাঁকে অনেক শাস্তি দিয়েছে; কিন্তু যে-আল্লাহর কাছে তিনি প্রার্থনা করেন, সেই আল্লাহ শাস্তিদাতা নন, প্রতিহিংসাপরায়ণ নন, নিষ্ঠুর নন; তিনি করুণাময়, তিনি রহমানুর রহিম। এই স্বস্তি নিজের পাওনা হিসেবেই নিয়েছেন তিনি, নিয়েছেন আত্মবিশ্বাসের সাথে, তার বদলে পরম করুণাময়ের

কাছে তিনি কিছুই চাননি—কোনো পাপস্বলন নয়, নিয়তির কোনো হঠাৎ পরিবর্তন নয়। রেহানা অভিজ্ঞতা থেকে জানতেন, তা হাসিল করা সম্ভব নয়।

সিলভি ব্যাগ হাতড়ে একটা চারকোনা প্যাকেট বের করল। গাঢ় লাল সিল্কের কাপড়ে আঁটো করে বাঁধা। সিলভি বাঁধন খুলতেই চ্যাপ্টা হওয়া কিছু ফুলের পাপড়ি গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে, পাপড়ির কিনারগুলোয় খয়েরি ছোপ ধরেছে, বুরবুরে হয়ে গেছে। সিলভি প্যাকেটের মোড়ক খোলে, ভেতরে অনেকগুলো কাগজ একটার ওপর আর একটা ভাঁজ করে রাখা, স্কুলের খাতার পাতার মতো কয়েকটা রুল টানা, অন্যগুলো সাদা, ছোট ছোট প্রত্যয়ী হাতের লেখায় ভরা। রেহানা একনজর দেখেন, ইংরেজি, বাংলা, এক বলক উর্দু—বুঝতে পারেন সেগুলো কি।

‘সোহেলের চিঠি,’ সিলভি বলে। জবাবে রেহানা কিছু না বলায় সিলভি বলে যায়, ‘আমি এগুলো পুড়িয়ে ফেলতে চেয়েছিলাম। তারপর ভাবলাম, হয়তো আপনি এগুলো রাখতে চাইবেন। যদি কিছু হয়ে যায়।’

‘যদি কিছু কী হয়?’

‘যদি ওর কিছু হয়ে যায়।’ শব্দগুলো গভীর নিশ্বাস নিয়ে বলল ও। ‘এগুলো আমি আর নিজের কাছে রাখতে পারছি না।’

রেহানা ভাবেন, সোহেলের জন্য কি তাঁর আহত বোধ করা উচিত? ‘কিন্তু এগুলো তো তোমার।’

‘প্রথমে আমি একটু দুশ্চিন্তায় ছিলাম যদি সাবির দেখে ফেলে। কিন্তু এখন আমি এগুলো আর রাখতে চাই না। এটা ঠিক না।’

‘তুমি ভেবে বলছ?’

ঝড়ের কোনো ছাপ নেই চেহারায়, তবু সিলভি তখনো চিঠির বাউলটা শক্ত করে ধরে রেখেছে।

‘হ্যাঁ, আমি ভেবেই বলছি। আপনি এগুলো পড়তে পারেন। এমন কিছু নেই এগুলোতে—শুধু কবিতা, অনেক কবিতা। আমি ভাবলাম এগুলো হয়তো আপনি চাইবেন।’

‘ঠিক আছে। আমাকে দাও। আমি রেখে দেব।’

চিঠিগুলো তবু আঁকড়েই ধরে রইল সিলভি, ‘আমি প্রায় পুড়িয়ে ফেলেছিলাম।’ কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। তারপর সিলভি যত্ন নিয়ে পাপড়িগুলো একটা একটা করে তুলল, আর চিঠির বাউল লাল সিল্কে বাঁধল, তারপর কাপড়ের ওপর আঙুল বুলিয়ে সমান করে দিল, টেনে আঁটো করল চিঠিগুলো আড়াল করার জন্য।

শেষমেশ যখন সে প্যাকেটটা রেহানার দিকে বাড়িয়ে দিল, এক অশুভ ভাবনায় রেহানা কেঁপে উঠলেন, যেন তাঁর ছেলে ইতিমধ্যেই মারা গেছে আর এই চিঠিগুলো সেটারই উপহার, একটা বিনিময়—একটা জীবনের পরিবর্তে এক

বাউল চিঠি। নিজের কাছে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, চিঠিগুলো খুলবেন না।

‘সাবিরের জন্য আমি খুব দুঃখিত,’ প্রসঙ্গ বদলানোর চেষ্টায় রেহানা কথাটা আবার বলেন। রেহানা ভাবছিলেন, হাজার শুকুর খোদা, হাজার শুকুর, আমার ছেলে বেঁচে আছে। ‘তাহলে সাবিরের কথা তোমাকে সোহেল বলেছে?’ চিন্তাটা তাঁর মাথায় আবার আসে, তাঁর ছেলে বেঁচে আছে। এই জানার আনন্দ তাঁর বুকে গুনগুন করে বেজে ওঠে। শুধু জিজ্ঞেস করতে পারাটাই এত স্বস্তির। ‘তুমি ওর সাথে কথা বলেছ?’

‘ও বাসায় এসেছিল। ‘আমি পরদা করি,’ ওকে বললাম, কিন্তু ও জোর করল। তাই আমি জানালা খুলে দিলাম, কিন্তু আমি পরদার পেছনে থাকলাম। আর ও বলল, ‘সাবির ধরা পড়েছে। আর্মিরা ওকে কোথাও আটকে রেখেছে। আমি খুঁজে বের করব।’ তারপর বলল, ‘চিন্তা করো না, ওকে আমি তোমার কাছে নিয়ে আসব।’

বোকা, এত বোকা ছেলে।

মেয়েটা আর কী জানে? রেহানা চিঠিগুলো আঁকড়ে ধরেন। আহা রে, ছেলেটা এমন অবোধ, বোকা।

রেহানা সোজা মেজরের কাছে যান। ‘আমি সোহেলের সাথে দেখা করতে চাই,’ তিনি বলেন, তাঁর চোখ মেজরের ভাঙা পায়ের ওপর স্থির রেখে। ‘আপনি জানতেন, ও এখন ঢাকায়?’ উত্তরটা রেহানা জানেন। ‘আপনি জানতেন ও এখানে, কিন্তু আমাকে কিছুই বলেন নাই।’

যথারীতি কোনো কৈফিয়ত দিলেন না মেজর। ‘ঝুঁকি অনেক।’

‘আমি পরোয়া করি না। শুধু বলেন। আপনার কাছে আমি কখনো কিছুই চাইনি। এইটুকু এখন আপনাকে আমার জন্য করতেই হবে।’

মেজর দোটানায় ভুগছেন মনে হলো, ওর গায়ের চামড়ায় একটা অসুস্থ কালচে ভাব ধিকধিক করছে। আঙুলগুলো ফরফর করে উড়ে গিয়ে ধূসর-সবুজ ইউনিফর্মের বোতামগুলোর ওপর বসল। মেজরকে তাঁর ঋণের কথা মনে করিয়ে দেয়ায় রেহানা নিজের ভেতরের অপরাধবোধের ছোট্ট খেঁচা উপেক্ষা করেন।

কী কী করতে হবে, তিন দিন পর সেই নির্দেশ শুনলেন রেহানা।

মিসেস চৌধুরীর ড্রাইভারকে নিয়ে বরাবরের মতো তাঁকে সকালে বেরিয়ে যেতে হবে। ড্রাইভারকে বলবেন, তাঁকে নিউমার্কেটে নিয়ে যেতে। যাওয়ার পথে তিনি অনুযোগ করতে থাকবেন, তাঁকে আজ কত কী করতে হবে, দর্জি তাঁর সবুজ পেটিকোট নষ্ট করে দিয়েছে, মিসেস চৌধুরীর হালিমের জন্য তাঁকে খাসির হাড়ি কিনতে হবে, আর যা দিনকাল পড়েছে—এই সময় খাসির হাড়ি কোথায়

যে পাবেন। নিউমার্কেটে পৌঁছে তিনি গাড়ি থেকে বের হয়ে ড্রাইভারকে বলবেন, দুই ঘণ্টা পরে এসে নিয়ে যেতে। তারপর সোজা গিয়ে নিউমার্কেটের কাপড় বিক্রির অংশে ঢুকবেন, যাবেন পেটিকোটের দোকানে, দোকানটার নাম মিসেস প্রিটি। দোকানদারকে একটা সবুজ পেটিকোট দিতে বলবেন—টিয়াপাখির পালকের রঙের, তাঁকে বলতে হবে। আর সেই পেটিকোট বিক্রেতা তখন তাঁকে একটা প্যাকেট দেবে। ওটার ভেতরে একটা সবুজ পেটিকোট আর এক কেজি খাসির হাড়ি থাকবে। পেটিকোট বিক্রেতা দোকান থেকে বের হয়ে তাঁকে সোহেলের আস্তানায় নিয়ে যাবে।

নীলক্ষেতে বস্তির মতো কতগুলো ঘুপচি ফ্ল্যাটের সামনে তাঁকে নিয়ে এলো পেটিকোট বিক্রেতা। একটা চারতলা দালান দেখিয়ে দিল, বলল সিঁড়ি দিয়ে ফ্ল্যাটের সবচেয়ে ওপরের তলায় যেতে, আর তারপর ছোট করে ‘খোদা হাফেজ, জয় বাংলা’ বলে চলে গেল সে।

কোনো এক অতীতে হলুদ রং করা হয়েছিল এই দালান। এখন গায়ে ক্ষয়ের সাত রং ধরেছে, বাইরের দেয়ালে বৃষ্টির পানি জমে গাঢ় সবুজ শ্যাওলার বড় বড় টান; জায়গায় জায়গায় রং উঠে গিয়ে সিমেন্টের ফ্যাকাশে ধূসর রং বেরিয়ে এসেছে; হলুদ রঙের বাকি অংশগুলোর কিছু অংশে কমলা আর কিছু অংশে গাঢ় খয়েরি ছোপ। বারান্দাগুলোয় ভেজা কাপড় শুকাতে দেয়া, লুঙ্গি, ব্লাউজ আর সিন্ধু পায়জামা। রেহানা ছেলেদের একজোড়া অন্তর্বাস দেখতে পেলেন, পাশে একই রকম বিধ্বস্ত একটা ব্রেসিয়ার আর তার সঙ্গে একটা ছোট বাচ্চার রাতের কাপড়। এই অপূর্ব সমীকরণের জন্য তিনি প্রবল কাতরতা অনুভব করেন, একটি পরিবার : পুরুষ, নারী, শিশু। সুখী হওয়ার এটাই একমাত্র সূত্র, যথাযথভাবে সাজানো। অন্য সব সমীকরণ এর ছায়ায় ঢাকা পড়ে যাবে।

ফ্ল্যাটের কাছাকাছি যেতে অতর্কিতে হামলে পড়ল গুঁটিকির গন্ধ, অনেকের কাছে গুঁটিকি খুব উপাদেয় খাবার, কিন্তু রেহানা ঢাকায় তাঁর এত বছরের জীবনে কখনো তা মুখে তুলতে পারেননি। কাপড় শুকানোর আবেগটা দড়িতে তিনি দেখতে পান লাইন ধরে ছোট মাছ বাঁধা। সেই গন্ধ তাঁকে সিঁড়ি থেকে একেবারে শেষ মাথার ফ্ল্যাট পর্যন্ত অনুসরণ করলো, যেখানে মায়ের জন্য তাঁর ছেলের অপেক্ষা করার কথা। অধৈর্যভাবে তিনি দরজায় ডোঁকা দিলেন।

‘আম্মি,’ ঢোকা মাত্র বলল সোহেল। এই উর্দু শব্দ অনেক যুগ আগের কোনো গোপন ভাষা যেন; তার মানে, ও এখনও একটা ছোট ছেলেই আছে, তাঁর ছোট ছেলে।

‘বেটা আমার,’ তিনি বলেন, ‘আমার লক্ষ্মী ছেলে।’ ওর উপস্থিতিতে তিনি

এতো স্বস্তিবোধ করেন, সবকিছু, এই যুদ্ধ, মেজর, সিলভি, সব দূরের মনে হয়, এই মুহূর্তটার চেয়ে কত নগণ্য, ক্ষুদ্র সেগুলো। তিনি ওকে ঠেলে দিয়ে ওর মুখ খুঁজতে থাকেন। দেখেন ওর উজ্জ্বল মিনতিভরা দৃষ্টি, গম্ভীর কপাল। ‘আম্মি,’ ও আবার বলে। এতো ভরাট কণ্ঠস্বরের ভেতরেও তিনি তাঁর ছোট্ট ছেলেটির গলা শুনতে পান, যার কখনো সৈনিক হওয়ার কথা ছিল না। এই তাঁর ছেলে। তিনি খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন, তাঁর ছেলে এখনো সেই সোহেল আছে কিনা।

‘তুমি সাবিরের কথা শুনেছ,’ সোহেল বলল। উত্তর দেয়ার আগে রেহানা ঘরটা ঘুরে দেখলেন। মনে হলো একটা মানুষের গোটা জীবন এই ছোট ঘরের মধ্যে ঠেসে ঢোকানো হয়েছে, কোনো ক্ষুদ্র উপন্যাসের মতো। মাঝখানে খাট পাতা, ঘরটাকে প্রায় খেয়ে নিয়েছে, মশারি তখনো খাটের ওপর টানানো—একটা বিশাল গজভূতের মতো। জানালাগুলো বন্ধ, আলো যেটুকু আসছে, সেটা একটা বিজলি বাতি থেকে, বাতিটা ছাদ থেকে ভয়ঙ্করভাবে ঝুলছে।

‘সিলভি শনিবার দিন দেখা করতে এসেছিল,’ তিনি তীক্ষ্ণভাবে বলেন, হঠাৎ করে তাঁর মনে হয় সোহেল নিজেকে কতটা বিপদে ফেলেছে। ‘কেন বেটা, কেন তুই তাকে বলতে গেলি?’

‘আমি ভাবলাম ওর জানা উচিত।’

‘কিন্তু ও তো আরও অনেক কিছু জেনে ফেলতে পারে। তোর ব্যাপারটা, গেরিলাদের, সোনার ব্যাপারটা।’

‘ও সবই জানে।’

‘তুই বলেছিস? কখন?’

‘ও সব সময়ই জানত। আমরা যখন সোনাকে তৈরি করছিলাম তখন ওর সাথে দেখা করেছি। আর তার পরেও আরও কয়েকবার।’

‘তুই ওর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলি?’ রেহানা গলায় উত্তেজনা চেপে রাখতে চেষ্টা করেন।

‘কয়েকবার মাত্র।’

প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি না করে পারেন না তিনি। ‘তুই গিয়েছিলি মিসেস চৌধুরীর বাসায়?’

‘আম্মি, আমি সরি। ওর সঙ্গে আমার দেখা কখনোই হতো। ওর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর, আমার নিশ্চিতভাবে বোঝা দরকার ছিল।’

রেহানা টের পান তাঁর চোখ দুটো জ্বলছে। ‘আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না তুই এমন কিছু করতে পারিস।’

‘আমি ভাবলাম...কিন্তু ও অনেক বদলে গেছে। তুমি কিছু লক্ষ্য করেছ? কয়েক সপ্তাহ ওকে দেখিনি, যখন ফিরে এলাম ও বলল, ও আর চায় না আমি

ওর কাছে যাই। বলল, আমাদের শান্তি পেতে হবে, আল্লাহ আমাদের শান্তি দেবেন। আমরা নাকি পাপ করেছি।’

‘তুই ওকে দেখতে গিয়েছিলি? কতবার?’ তিনি চাইলেন সবকিছু খুঁটিয়ে শুনতে, কোন তারিখ, কতবার—সব।

‘বেশি না।’

‘কতবার?’

‘আমার মনে নাই।’

‘আমার এত রাগ হচ্ছে সোহেল, আমি তোর সাথে কথা বলতে পারছি না।’ মুহূর্তের জন্য তিনি ভাবলেন সোহেলকে ওখানে ওর ছায়াঙ্ককার ঘরে ফেলে রেখে চলে আসবেন। ছোট ঘরটায় রেহানা পায়চারি শুরু করলেন। বিছানার পাশে ওর কিছু কাপড় পড়ে থাকতে দেখলেন, ভাঁজ করা শুরু করলেন সেগুলো। তিনি গুনলেন দুটো শার্ট, তিনটা গেঞ্জি, একটা কোর্তা, একটা পায়জামা, দুই জোড়া প্যান্ট।

‘আমি ভাবলাম, আমি যদি ওকে বলি, ও আবার আমাকে বিশ্বাস করতে শুরু করবে।’

একটা লুঙ্গি, এক জোড়া মোজা।

‘আম্মি।’

‘কথা দে, এ রকম তুই আর কখনো করবি না।’

‘আমি সেটা পারব না। আমার আরেকটু সময় দরকার।’

রেহানা হাতের লুঙ্গিটা নামিয়ে রাখেন। ‘ও এটা চুকিয়ে ফেলতে চায়।’

সোহেল মাথা ঝাঁকায়। যখন ঘুরে দাঁড়ায়, তিনি দেখেন কপালের কাছে ওর চুলগুলো লেপ্টে আছে। ‘হতেই পারে না। হয়তো বলেছে ঠিকই, কিন্তু মন থেকে ও তা চায় না।’

‘ও তোর চিঠিগুলো আমাকে ফেরত দিয়েছে।’

‘কী?’ সোহেল স্তূপ করে রাখা কাপড়গুলোর কাছে আসে, রেহানার সামনে এসে দাঁড়ায়।

‘চিঠিগুলো আমার কাছে আছে, বাসায়।’

‘আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না।’

‘আমি তোকে বলছি, ওগুলো এখন আমার কাছে।’ রেহানা একটু থামেন, আর তারপর অনুমানে বলেন: ‘তুই রুমির কবিতা, আমার খসরুর কবিতার লাইন লিখেছিস।’

‘তুমি পড়েছ?’

‘খুব সামান্য।’ এটা সত্যি নয়। নিজের কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের সাথে তাঁর হয়নি। তবে তিনি নিজেও যদি ভালোবাসার চিঠি লিখতেন, সেসব চিঠিতে এই দুই

কবির উদ্ধৃতিই দিতেন। রেহানা একটা সুযোগ পেয়ে সেটা গ্রহণ করলেন। ‘সোহেল, আমার কথা শোন। মেজর বলেছেন, এ ব্যাপারে এমনিতেই কিছু করার নাই। সিলভিরও জানার দরকার নাই। এখন থেকে নীরব থাকাটা খুবই জরুরি।’

‘তুমি মেজরকে বলেছ?’

‘অবশ্যই। আমি আর কার কাছে যাব?’ আর আচম্বিতে তিনি চাইলেন এই সাক্ষাৎ শেষ হোক, যাতে তিনি গিয়ে মেজরকে আদ্যোপান্ত বলতে পারেন, ছেলের জন্য বেদনাভরা ভালোবাসার কথা, অপরিচ্ছন্ন ফ্ল্যাটের কথা, মেয়েটার কথা যে আর কোনো মেয়ে নয়, একটা অভিশাপ, আর তিনি জানতেন মেজরকে এসব কথা না বলা পর্যন্ত আজকের দিনটা পূর্ণতা পাবে না, অর্থহীন হয়ে যাবে।

‘সোহেল, এখন কিছুই আর করার নাই। এই ব্যাপারটা ছাড়—সাবির, আল্লাহ চাহে তো, বেঁচে যাবে।’ মুহূর্তের জন্য তিনি প্রায় খুশি হয়ে উঠলেন যে সাবির ধরা পড়েছে। তাঁর মনে হলো যেদিন গর্বে উচ্ছ্বাসে উজ্জ্বল মিসেস চৌধুরীকে সাথে নিয়ে সাবির তাঁর ড্রইংরুমে পা রেখেছিল, সোহেলের এই পাগলামি সেইদিন থেকে শুরু।

‘না মা, আছে। তোমার কিছু করার আছে।’

রেহানা ভাবেন, তিনি বোধ হয় ভুল শুনেছেন। ‘আমার?’

‘সেজন্যই আমি ঢাকায় ফিরে এসেছি। তুমি, তুমি পারবে সাবিরকে বাঁচাতে।’

‘আমি বুঝতে পারছি না।’

‘ওকে জেলে নেয়া হয়েছে। আমরা জানি এই শহরেরই কোথাও ওকে রাখা হয়েছে।’

বাইরে আলো ফিকে হয়ে আসছে। রেহানার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল সোহেল। হাত দুটো রাখল রেহানার হাঁটুর ওপর, তিনি সেটা অনুভব করতে পারছিলেন না। ওর গলার আওয়াজ যেন বহুদূর থেকে আসছে, জলের তল থেকে, আর তাঁর কথা অস্বাভাবিকরকম জোরাল শোনাল যখন তিনি বললেন, ‘তুই কি চাস, আমি গিয়ে বলি সাবিরের জায়গায় আপনারা আমাকে রাখেন? ওদের কি সাবিরের বদলে আমাকে অত্যাচার করা উচিত? তুই কি তাই চাস?’ সোহেলকে রেহানা প্রায় দেখতেই পাচ্ছিলেন না; ওর চুল আর মুখ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

‘ফয়েজ চাচা সাবিরকে বের করতে পারেন,’ পানির নিচ থেকে উঠে আসা স্বর বলে উঠল।

‘ফয়েজ? তোর চাচা ফয়েজ? না।’

‘আমি তোমাকে বলছি,’ একটা ঢেউ, একটা গর্জন।

‘কীভাবে?’

‘আর্মির সাথে চাচার একটা সম্পর্ক আছে—আমরা নিশ্চিত না ঠিক কী সম্পর্ক।’

কিন্তু তাঁর বেশ প্রভাব আছে আর্মির ওপর।' সোহেলের লাল চোখ বড় হয়ে ওঠে।

শব্দগুলো আস্তে ডুবে যায়, ঘরটা নিস্তব্ধ হয়ে আসে। 'তুই ওনার কাছে আমাকে পাঠাবি শিক্ষা চাইতে?' রেহানা ফিসফিস করে বলেন।

'সিলভির আস্তা ফিরে পাওয়ার এটাই একমাত্র উপায়।'

'তুই ভেবে বলছিস?'

'হ্যাঁ।'

শব্দগুলো থিতু হওয়ার অপেক্ষা করেন রেহানা। যাও, গিয়ে পারভিন আর ফয়েজের কাছে শিক্ষা চাও। সাবিরকে উদ্ধার করো। কিন্তু দৃশ্যটা কল্পনা করার সময় অদ্ভুত একরকম স্বস্তিবোধ হলো তার। এর চেয়ে অরুচিকর, জঘন্য দায়িত্ব আর হয় না। কিন্তু এটা এক ধরনের সুযোগও। ছেলে তাঁকে আরেকটা প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ করে দিচ্ছে। এতগুলো বছরের ক্রীতদাসসুলভ আনুগত্য, মাতৃত্ব, চুরির লজ্জা—তবু তিনি সব সময় জানতেন এ যথেষ্ট নয়। নতুন করে আবার তাকে আত্মত্যাগ করতে হবে।

তবু অবিচারের অনুভূতিটা একদম উধাও হয়ে গেল না। 'তুই আমাকে এই কাজ করতে বলছিস?'

'চাচা ভাববেন তুমি এটা মিসেস চৌধুরীর জন্য করছ। তুমি বলতে পারো যে, মিসেস চৌধুরী তোমার কাছে কেঁদে পড়েছেন তাঁর মেয়ে-জামাইয়ের মুক্তির জন্য। ওনাদেরকে জানাও, তুমি ওঁর মেয়েকে কত পছন্দ করো।'

'সবকিছুই ভেবে রেখেছিস তুই।'

'আম্মি, প্লিজ এটা আমার জন্য করো। এটাই একমাত্র বিষয়, যার পরোয়া আমি করি।'

'এটাই একমাত্র বিষয়? তাহলে যুদ্ধ, দেশ, উদ্বাস্তু, এসব কিছুই না? হঠাৎ করে এসবে আর কিছু এসে যায় না? সাবিরকে ফিরিয়ে আনলে কী হবে মনে করিস তুই? তোর ধারণা, সিলভি তখন তোর বুকো ঝাঁপিয়ে পড়বে?' কিছু বলার আগেই তিনি জানতেন, উত্তর কী হবে।

'হ্যাঁ, তাই।'

'ও সাবিরের স্ত্রী। তোর না।'

'ও জানবে কতদূর পর্যন্ত আমি যেতে চাই।'

'এতগুলো মাস ধরে তুই কী করেছিস? যুদ্ধ করেছিস নাকি পাটকেল ছুঁড়েছিস সিলভির জানালায়?'

'আম্মি, আরেফ যখন মারা যায় আমি তখন সেখানে ছিলাম। ও আমার দিকে তাকাল আর বলল, 'আমার যদি একশটা জীবন থাকত আমি সবগুলো হারাতাম।' কীভাবে যে এই যুদ্ধ আমাদের জীবনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আর সবচেয়ে

নিকৃষ্ট সময় হতে পারে, আমি জানি না। সবকিছু, সবকিছু উল্টে গেছে। অন্যায় এখন ন্যায়। আমার মন এখন সবচেয়ে জঘন্য, সবচেয়ে নিষ্ঠুর চিন্তায় ভরা—আমার শুধু ওকে দরকার। আমি ঠিক বোঝাতে পারব না। জানালায় ওকে যখন দেখি, মনে হয় শুধু ওকেই আমার দরকার।” সোহেলের চোখ দুটো সাঁতরে বেড়াচ্ছিল। ‘প্লিজ মা, আমার জন্য শুধু একবার, আমি কখনো তোমার কাছে আর কিছু চাইব না, শুধু যাও, সাবিরকে নিয়ে আসো, ওখান থেকে বের করে আনো। আমি, আমার জান, প্লিজ।’

‘যথেষ্ট হয়েছে। এখন থাম।’

সোহেল ফুঁপিয়ে কাঁদছিল, ও ভেঙে পড়ল, দুই হাতে মুখ ঢাকল। ‘যখন থেকে আমি কিছু মনে করতে পারি, আমার পুরো জীবন ধরে শুধু সিলভি।’

‘ঠিক আছে।’

‘তুমি করবে?’

‘তুই যেভাবে ওর কাছে দাসখত লিখে দিয়েছিস, আমিও ঠিক সেভাবে বাঁধা তোর কাছে, তুই জানিস সেটা।’

ও চোখ তুলে তাকায়, আর রেহানা জানতেন যে ও ভাবছে, একদিন এর প্রতিদান দেবে, ঋণ আবার ফিরিয়ে দেবে। দু’জনের কেউই কয়েক মিনিটের জন্য কিছু বলেন না, সোহেল তখনো তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসা। কাপড়ের স্তূপ থেকে একটা ন্যাকড়া তিনি ওর হাতে দেন, আর তাতে ও নাক মোছে। তারপর ও হাসে আর বলে, ‘আমার রাজপ্রাসাদ তোমার কেমন লাগছে?’

‘অসহ্য। মোটামুটি ধরনের কোনো জায়গাও ওরা তোর জন্য খুঁজে পেল না?’

‘আমি তো জয়কে খেপাচ্ছি। ও তোমার রান্না খাচ্ছে আর আমাকে এখানে থাকতে হচ্ছে।’

‘তোর জন্য আমাকে কিছু নিয়ে আসতে দিচ্ছিস না কেন?’ প্রশ্নটাকে এত করুণ মনে হলো। কি আর এমন তিনি নিয়ে আসতে পারতেন?

‘তুমি আবার এখানে আসতে পারবে না,’ সে বলল।

‘কাউকে দিয়ে খাবার, কাপড় পাঠাবো।’

‘একদম ঠিক হবে না। খুব বিপজ্জনক হতে পারে।’

কিছু একটা রেহানাকে খেপিয়ে তুলল, ‘বিপজ্জনক পুরো ধানমণ্ডিকে মাটিতে মিশিয়ে দেয়ার মতো বিস্ফোরক গোলাপঝাড়ের নিচে পুঁতে রাখা আছে। আর আমাকে বিপদে ফেলা নিয়ে এখন তুই চিন্তা করছিস?’

সোহেল ওর লম্বা হাত দুটো দিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে ফিসফিস করে বলল, ‘ধন্যবাদ, ধন্যবাদ আমি, তুমি আমার জীবন বাঁচাচ্ছে।’

আমার জীবন তো তোরই জীবন, তিনি ভাবেন। ‘এখানে কি তুই

বেশিদিন থাকবি?’

‘না। সাবির ছাড়া পেলেই আমি সীমান্ত পাড়ি দেব।’

‘ফয়েজ ভাই যে ওকে ছাড়িয়ে আনবেন তার কোনো নিশ্চয়তা নাই। অথবা ওর আদৌ সে ক্ষমতা আছে কিনা কে জানে।’

‘আছে। আমি জানি ওনার সে ক্ষমতা আছে। তোমার শুধু ওনাকে রাজি করাতে হবে।’

মাহের আঁশটে গন্ধ গা থেকে দূর করতে বাসায় ফিরে প্রথম যে কাজটা রেহানা করলেন তা হলো—গোসল। শাড়ি বদলালেন আর রাতের খাবারের জন্য চুলোয় ভাত চড়ালেন তিনি। সন্ধ্যা নেমে আসছিল আকাশ জুড়ে, এর বেগুনি আলো হালকা চাদর বিছিয়েছে সোনা আর বাংলোর ওপর।

তারপর তিনি মেজরের ঘরে গেলেন।

রেকর্ড প্লেয়ার নিশ্চুপ, আর হাত দুটো ভাঁজ হয়ে কোলের ওপর রাখা। দেখে মনে হলো দাড়ি কামিয়েছেন, ওঁর থুতনি আর গাল চকচক করছে। মেজর স্তব্ধভাবে বসে ছিলেন, কিছুই করছিলেন না, উল্টো দিকের দেয়ালে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন, ফাঁকা দেয়ালে মালা ঝোলানো ফ্রেমে সুপ্রিয়ার বাবা-মার ছবি।

‘জায়গাটা কি অনেক দূরে?’ কোনো ধরনের সম্ভাষণ না জানিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন। ‘আপনি কি পথ হারিয়েছিলেন?’

‘না।’

‘এই মাত্র ফিরলেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘আপনার চুল ভেজা কেন?’

‘গোসল করেছি।’

‘আমি ভাবলাম আপনি বললেন আপনি এই মাত্র ফিরেছেন।’

‘আপনি কি উদ্বিগ্ন ছিলেন, নাকি এমনিতেই নাক গলাচ্ছেন?’

এরপর মেজর আর কোনো কথা বললেন না। বোঝাই যাচ্ছিল কী ঘটেছে তিনি সব জানতে চান, কিন্তু কোনো কারণে রেহানা মেজরের ওপর বিরক্ত হয়ে ছিলেন, আর বিকেলের ঘটনা কেমন তালগোল পাকানো লাগছিল রেহানার কাছে। রেহানা শেষতক সোহেলের দেখা পেয়েছেন, তাই এখন আর ভাবছেন না যে, ওরা সোহেলকে বিশেষ কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে বন্ধিত করছে। ওদের সবার মতোই সোহেল একটা পশু মাত্র, কেবল ওর দেহের জন্যই ও ব্যবহারোপযোগী, ওর শক্তি, অন্য যে কোনো দেহের মতোই, যে কোনো শক্তি। যদি সবাই এক কাতারেরই হয়, তাহলে ওকে এই হানাহানিতে টেনে নেয়ার কী দরকার ছিল?

‘ও মনে করে আমি সাবিরকে বের করে আনতে পারব,’ রেহানা শেষে বললেন।

‘আপনি? একজন সৈন্যকে জেল থেকে বের করবেন? কীভাবে?’

‘আমার স্বামীর ভাই। আর্মির সাথে তাঁর খুব ভালো যোগাযোগ আছে।’

মেজরের মুখ চুন হয়ে গেল।

‘ব্যাপার হচ্ছে—সোহেল সাবিরের স্ত্রীকে ভালোবাসে।’ এ কথাগুলো ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেরিয়ে এলো। এই লোকটার উপস্থিতিতে শব্দগুলো কেন এমন করে অজান্তে মুখ থেকে বেরিয়ে যায়? আবারও লোকটা কিছুই বললেন না, আর আবারও তিনি কৃতজ্ঞ বোধ করলেন—কারণটা হয়তো এই যে, কোনো ব্যাপারেই ওকে কখনো বিস্মিত মনে হয় না। নিজে ভালো বোধ করার জন্য রেহানা ওকে বিছানা থেকে উঠতে বলেন, যাতে তিনি চাদরটা পাল্টে দিতে পারেন।

‘আপনি বলেছেন, আপনি এটা করবেন?’ তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বিছানা থেকে নড়লেন না।

‘অবশ্যই আমি বলেছি আমি করব।’

‘আমি আপনার সাথে যাবো।’

এই পরামর্শে তাঁর আরও বিরক্ত লাগল। ‘আপনি কীভাবে যাবেন?’ নিষ্ঠুরের মতো বললেন তিনি। ‘আপনি তো গেট পর্যন্তও হেঁটে যেতে পারেন না।’

‘আপনি ধরা পড়তে পারেন।’

‘তিনি আমার ভাণ্ডার, আমাকে ধরিয়ে দেবেন না,’ কথাটা সত্যি না জেনেও বললেন রেহানা। ‘আমার প্রতিবেশীর জন্য আমি উদ্বেগ দেখাতেই পারি। এর পেছনে সন্দেহ করার কিছু নেই।’

‘উনি যদি প্রশ্ন করেন এই যুদ্ধে আপনি কোন পক্ষে, বাংলাদেশ বিশ্বাস করেন, না পাকিস্তান, তখন কী বলবেন?’

‘আমার যা বলা দরকার।’

‘আপনার এটা করা উচিত না।’

‘আপনার সন্তান নেই, তাই বলছেন।’ ঘাড় জ্বালা করেছে তাঁর, হুইল সাবানের গন্ধ পেলেন যেটা দিয়ে তিনি মুখ ঘষেছেন আর চুলে জবাকুসুম তেলের অবশিষ্টাংশ, আর হাতের নিচে ঘামাচি পাউডারের সূঁচ ঘ্রাণ।

মেজরের মাথার ওপর ফ্যান বন্ধ। দুপুরবেলায় সব সময় গরম থাকে। তবু এ সময়টায় মেজরের জ্বর বেড়ে যায় আর তিনি কাঁথার নিচে কাঁপতে থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত না সূর্য ডুবে যায় দিগন্তে।

রেহানা ঠোঁটের ওপরের ঘাম মুছে নিয়ে বলেন, ‘গান বাজাচ্ছেন না কেন?’

‘খুব ভয়ঙ্কর কাজে পা দিচ্ছেন, মারাত্মক ঝুঁকি নিচ্ছেন আপনি।’

‘আমি এর মধ্যে পারভিনকে খবর পাঠিয়েছি, শুক্রবার দুপুরবেলা ওদের সাথে খাব, কথা হয়ে আছে।’

মশারি ভেদ করে একটা মশা ভেতরে ঢোকান চেষ্টা করছে, এটা দেখতে দেখতে ওই রাতে রেহানা নিজেকে বললেন, আমি ইকবালকে বলব না। আমি যদি ওকে বলি, শেষে দেখা যাবে আমি ওর কথা মেনে নিয়েছি। আমি জানি এটা বিপজ্জনক, আর হয়তোবা কোনো কাজেও আসবে না। আর পারভিনের মুখের কি হনুরে ভাব কল্পনা করলেন তিনি। তাঁর সেই বোকা বোকা গোল চোখ। না, বোধ হয় কোনো কাজ হবে না। সাবির আমার কে? ওর যদি সুযোগ থাকত ও কি আমার সোহেলকে বাঁচাত? কিছুই করতো না। ফটাফট ও উল্টোপথে হাঁটা দিত। মিসেস চৌধুরী? আমরা দু’জনেই এর উত্তর জানি। আর ওই মেয়েটা সিলভি, ও-ই তো সব গুণগোলের মূল।

শেষ পর্যন্ত ইকবালের কথাই মেনে নিতেন তিনি। না, ইকবালের সঙ্গে তিনি দেখা করতে যাবেন না।



কালো একটা মার্সিডিজ বেঞ্জ রেহানাকে নিতে এলো। ড্রাইভারের পরনে সাদা শার্ট ও কালো সরু টাই। চালকের সিটে লোকটা শক্তভাবে বসে ছিল, সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছিল জানালা দিয়ে। যখন দেখল রেহানা গেট বন্ধ করে বেরিয়ে এসেছে আর তালা লাগানোর জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছে, সে চট করে গাড়ি থেকে বের হয়ে দরজা খুলে সটান দাঁড়িয়ে গেল। লোকটা দেখতে কালো ও লিকলিকে। জুতোর তলা দিয়ে সিগারেটটা পিষে সে রেহানার এগিয়ে আসার অপেক্ষা করল।

রেহানা গাড়ির কয়েক গজের মধ্যে আসতেই লোকটা হাত ভাঁজ করে সটান একটা স্যাঁলুট ঝুঁকল।

‘মিসেস রেহানা হক?’ সে জিজ্ঞেস করল।

রেহানার জিভ টাংরার আঠার মতো লেগে ছিল। ‘জি,’ তিনি কোনোভাবে বললেন।

‘কাসেম ড্রাইভার। আপনাকে হক সাহেবের বাড়িতে নিতে এসেছি।’

‘ধন্যবাদ,’ রেহানা উত্তরে বললেন।

রেহানা গাড়িতে ঢুকতেই দরজা ঠাস করে লেগে গেল। ভেতরটা বিশাল আর কেরোসিনের গন্ধ ভাসছে। কাসেম ওর পা এক্সেলেটরে চেপে ধরল, দ্রুত বেরিয়ে গেল ওরা। রেহানা টের পেলেন তিনি চামড়ার সিটের ওপর অস্বস্তিকরভাবে বারবার পিছলে যাচ্ছেন আর এদিক-ওদিক কাঁত হতে হতে তাঁর শাড়ি কুঁচকে

যাচ্ছে। পারভিনের সঙ্গে দেখা করার জন্য রেহানা খুব ভেবেচিন্তে কাপড় পরেছেন। পরেছেন সবচেয়ে সাদামাটা শাড়ি—মাড় দেয়া একটা ছাই রঙের অরগান্ডি, যেটা কুঁচির জায়গায় ফুলে থাকে, তাতে তাঁর কোমরটা মোটা দেখায়। শাড়ির ভাঁজ ইঙ্গিত করে সমান করার চেষ্টা করেননি, এমনকি শাড়ি পরার পর কুঁচিও সমান করেননি হাত দিয়ে। লাগাননি কোনো প্রসাধনী; চুল টেনে আঁটো একটা খোঁপা বেঁধেছেন আর সাধারণ কালো খোঁপার কাঁটা দিয়ে আটকে দিয়েছেন সেটা। পারভিনকে বেশি সুন্দর দেখানোটা সবসময়ে দরকার।

ওরা মিরপুর রোড পার হয়ে কলাবাগানের দিকে ঘুরলেন। দ্বিতীয় রাজধানীর খোলা মাঠ দ্রুত পিছনে ফেলে এয়ারপোর্টের দিকে এগিয়ে চলল গাড়ি। রেহানা গাড়ির ভেতরের কালচে পরিসরে আরও বেশি ডুবে গেলেন, চেষ্টা করলেন ঘাবড়ে না যেতে।

গাড়ি মোড় ঘুরল আর হঠাৎ করেই রাস্তাটা অচেনা হয়ে গেল। বেশ প্রশস্ত, বড় রাস্তার মতো, এবং চলে গেছে ধোঁয়াটে কোনো অজানা গন্তব্যে। আর তখুনি সোহেলের কাছ থেকে শোনা টর্চার সেন্টারের চিন্তা তাঁর মাথায় আসতে লাগলো। ঘাড় উঁচু করে তিনি দেখার চেষ্টা করতে থাকলেন নিষ্ঠুর গোপনীয়তা ধারণ করে আছে এমন কোনো নিচু দালান চোখে পড়ে কিনা।

‘আমরা কোথায় যাচ্ছি?’

‘চিন্তা করবেন না ম্যাডাম।’ কাসেম গাড়ির আয়নায় রেহানার চেহারা দেখতে পেয়ে তাতে মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, ‘আমরা জলদি পৌঁছে যাব।’

কয়েক মিনিট পর, রেললাইন পার হয়ে তারা ঘুরলেন। ছোট একটা পাহারা চৌকির সামনে থামল গাড়ি। উর্দি পরা এক লোক কালচে কাচ ভেদ করে উঁকি দিল।

‘কাচ নামান!’ জানালার গায়ে থুতু ছিটিয়ে সে বলল।

রেহানা হাতল ধরে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন, কাসেম বাধা দিল।

‘শালা গাড়ির নম্বর প্লেট দেখতে পাস না!’ চালকের আসন থেকে সে খঁকিয়ে উঠল।

সিপাহি গাড়ির সামনে এসে নম্বর প্লেট ভালো করে দেখল। তারপর রেহানার জানালায় ফিরে সে আবার উঁকি দিল। ‘প্যাসেঞ্জার কে?’

‘ব্যারিস্টার হক সাহেবের বোন।’

‘কে? আমাকে রেজিস্টার দেখতে হবে,’ সে বলল।

‘নিজেদের লোককে চিনতে পারো না, শালা! এই চৌকি আমরা প্রত্যেক দিন পার হই। আজ হঠাৎ কি হলো যে তুমি গাড়ি চিনতে পারো না। গাড়ি থেকে বের হয়ে একটা ধোলাই দিতে হবে নাকি?’

মুহূর্তের জন্য থমকে গেল সৈনিক; তারপর ঘাড় ঝাঁকাল, যেন সে কোনো কিছুর তোয়াক্কা করে না। ‘আচ্ছা, যান। কিন্তু আমাকে ওপরে জানাতে হবে।’

আর তারপর গাড়ির কালো কাচে বন্দুকের বাঁট দিয়ে টোকা দিল।

‘ঘাবড়াবেন না ম্যাডাম,’ দ্রুত বেরিয়ে যেতে যেতে কাসেম বলল, ‘কোনো সমস্যা নাই।’

ফয়েজ আর পারভিন গুলশানে থাকে। জায়গাটা শহরের উল্টো প্রান্তে, এয়ারপোর্ট আর ক্যান্টনমেন্ট পেরিয়ে শহরের উত্তর দিকের সীমানা ছুঁয়ে। ধানমণ্ডির তুলনায় গুলশান নতুন, লোকবসতি আরও কম; প্লটগুলোর গণ্ডি বড়, মধ্যকার মাঠ বিশাল আর সেখানে পানি জমে থাকে। একটা লেক আছে। ফয়েজের বাসা বড় রাস্তা থেকে ভেতরে, দু’পাশে লাইন দেয়া বড় বড় পুরোনো গাছ। উঁচু গেট ও ইটের দেয়ালের আড়ালে বাড়িটা দৃশ্যমান নয়। দারোয়ান গেট খুলে দিল, তারা গাড়িতে সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন—বেগুনি সেগুন কাঠের প্রশস্ত দরজা আর সামনে সাদা-কালো ছক কাটা গাড়ি-বারান্দা।

রেহানা বেল বাজালেন। খুদে একটা নকল পাখির ডাক সারা বাড়িতে প্রতিধ্বনি তুলল। তারপর দামি মেঝেতে জুতোর শব্দ। কয়েক মুহূর্ত পরে দরজা খুলে গেল, পারভিন তাঁর উষ্ণ প্রশস্ত হাসি নিয়ে রেহানার সামনে দেখা দিলেন।

‘আসসালামু আলাইকুম,’ তিনি বললেন। তাঁর পরনে জমকালো ফিনফিনে হলুদ শিফন। গলায় এক ছড়া মোটা মুক্তার মালা। লিপস্টিকে রাঙানো ঠোঁট জোড়া চকচক করছে। রেহানা দেখলেন, আঁচলটা টেনে ওপরে তুললেন পারভিন, যাতে মাথা ঢাকা পড়ে। শিফনের ঘোমটায় তাঁকে গ্রেস কেলির মতো দেখাচ্ছে। ঢাকায় কোনো আইন জারি হয়েছে নাকি, রেহানা ভাবলেন, ‘ঘোমটাহীন মহিলাদের চলাচল নিষেধ’, এমন কোনো আইন।

‘ওয়ালাইকুম আসসালাম,’ তিনি উত্তর দিলেন।

‘প্লিজ,’ বাড়তি মমতা নিয়ে পারভিন বললেন, ‘ভেতরে আসো। তোমাকে দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি।’ চোখধাঁধানো সাদা করিডোর দিয়ে তাঁরা হেঁটে গেলেন। ‘এত ব্যস্ততায় ছিলাম, ভাবলাম তোমাকে ফোন করব, আর তুমি যখন করলে ঠিক তখনই তোমার কথা মনে হলো, ভাবছিলাম কেন তুমি বাচ্চাদের করাচি পাঠিয়ে দিলে—ফয়েজের প্রভাবের কারণে ওরা তো এখানেই নিরাপদ। কেউ ওদের কোনো ক্ষতি করতে পারতো না ইনশাল্লাহ—তবে যাই হোক এই অবস্থা শিগগির কেটে যাবে—চা? আবদুল! আবদুল!’

এক জোড়া চুপসানো দস্তানা পরা বয়স্ক ভদ্র আবদুল এগিয়ে এলো, পরনে বাতিল এক সুট। প্যান্টটা নিচের দিকে মোড়ানো, আর তাতে কঞ্চির মতো খালি পা জোড়া বেরিয়ে এসেছে।

‘আমার ভাবি এসেছেন,’ আবদুল কাছে এলে পারভিন বলেন। চোখ মেঝের দিকে স্থির রেখে আবদুল মাথা নাড়ে। ‘চা আনো—ইংলিশ চা—আর গোল টিন

থেকে বিস্কিট—ক্রয়াকার নয়—বিদেশি বিস্কিট। ও সব সময় গুলিয়ে ফেলে।’ তিনি রেহানাকে রোদের আলোর উজ্জ্বল ঝলমলে বসার ঘরে নিয়ে এলেন, বসতে দিলেন ডুবে যাওয়ার মতো নরম হাতলওয়ালা চেয়ারে। ঘরের পেছনে এক সারি জানালা থেকে বাগান নজরে পড়ে, গাছ ও ঝোপঝাড় অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত, রেখেছে শহরকে আড়াল করে।

‘আমি জানতাম এই দৃশ্য তোমার ভালো লাগবে,’ নিজের আগাম বুঝে ফেলার ক্ষমতায় পারভিন খুশি হলেন।

‘খুব সুন্দর বাগান,’ রেহানা উত্তরে বললেন।

‘এর কৃতিত্ব অবশ্য আমি নিতে পারি না। গাছগুলো নিশ্চয় ব্রিটিশ আমল থেকেই এখানে আছে, তবে এখানে কোলাহল নাই, খুব শান্তি। এছাড়া নতুন বাড়িঘর গড়ে উঠছে। পাশেরটা মাত্র শেষ হলো।’

কম্বটে একটা গন্ধ আর দেয়ালের নীলচে আভা রেহানা লক্ষ্য করলেন। যে চেয়ারে তিনি বসে আছেন, সেটা আর এর সঙ্গে মেলানো সোফা, যেখানে পারভিন পাখির মতো হালকা হয়ে বসে আছেন—এগুলো ছাড়া ঘরে শুধু একটা গোলাকার টেবিল, যার ওপরটা পিতলের। এছাড়া আর কিছু নেই।

‘আমরা এখনো গুছিয়ে উঠতে পারিনি।’ রেহানার চাহনি লক্ষ্য করে পারভিন বলেন, ‘এখনো অনেক গোছানো বাকি।’

‘না, চমৎকার। খুব খোলামেলা।’

আবদুলের এলোমেলো পদক্ষেপের শব্দ ফাঁকা দেয়ালে প্রতিধ্বনি তোলে।

‘সোহেলের কোন খবর পেয়েছ?’

‘হ্যাঁ, আল্লাহর রহমতে ও ভালো আছে।’

‘ও কি তোমার বোনদের কারও সাথে আছে?’

‘না,’ রেহানা আগেই পাখি-পড়ার মতো সব মুখস্থ করে এসেছেন। ‘ও ওর স্কুলের এক বন্ধুর সাথে আছে। আপনি তো জানেন বাচ্চারা কেমন—ভালো কান্নাকাতি করে।’
বন্ধুরা সবার ওপর। শাহীন স্কুলের এক বন্ধু। অনেক বছর ওদের দেখা নাই, কিন্তু চিঠিতে সবসময় যোগাযোগ ছিল।’

‘হ্যাঁ, তাই তো,’ পারভিন বললেন। ‘সবাই সোহেলকে খুব পছন্দ করে। সব সময় মানুষজন ঘিরে আছে ওকে। ও এমন হবে, আপনাদের কার পক্ষে জানা সম্ভব ছিল, তাই না—ছোটবেলায় এতো শান্ত ছিল।’

এই আলোচনা খুব বিপজ্জনক, তাঁদের অভিন্ন অতীত নিয়ে আলোচনা। রেহানা পারভিনকে খুশি করতে চাইলেন। ‘হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন, ও খুব শান্ত ছিল। এখন বদলে গেছে—যেদিন থেকে বই পড়ায় আগ্রহী হয়েছে, ওর কথা বলা আর থামানো যায় না।’

‘আমি শুনেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ঝানু বক্তা হয়ে উঠেছে!’

রেহানা টোপ গেলার ব্যাপারে সতর্ক হয়ে গেলেন। সোহেলের বক্তৃতার বিষয় তো ‘পিকিং না মস্কো? তৃতীয় বিশ্বের সাম্যবাদ’ এবং ‘জিন্নাহ: রাষ্ট্রনায়ক না সাম্রাজ্যবাদী নেতা?’

‘আর ওর কবিতা!’ পারভিন মুগ্ধ গলায় বললেন।

‘হ্যাঁ,’ রেহানা বললেন, ‘আবৃত্তিতে ওর ঝাঁক আছে।’

‘গালিবের কোনটা যেন ও একবার আমাদের জন্য আবৃত্তি করল? না থা কুছ তো খুদা থা...’ তিনি আওড়ান। ভুলভাল করে কবিতা বলে চলেন পারভিন।

‘অপূর্ব। কি মিষ্টি আপনার গলা।’

পারভিনের দৃষ্টি দূর থেকে ফিরে রেহানার ওপর নিবদ্ধ হয়। ‘শুকরিয়া। মানুষজন অবশ্য তা-ই বলে—আসলে, অভিনয়ের ওপর অতগুলো বছরের পড়াশোনা তো।’ রেহানা সবসময় অবাক হন, কীভাবে সবাই নিজেদের সম্পর্কে মিথ্যা প্রশস্তিগুলো অস্বীকার তো করেই না; বরং আরও বহু গুণে বাড়িয়ে নেয়।

‘মায়ার কী খবর?’ তিনি জিজ্ঞেস করেন। রেহানা আবারও তাঁর চর্চিত বক্তৃতা ঝেড়ে দেন।

‘মায়া কোলকাতায়,’ তিনি বলেন।

‘ও—? কেন?’

‘ওখানে এখনো আমার কিছু আত্মীয়-স্বজন আছেন—আমার বাবার দিকের। আর ওরা মায়াকে খুব দেখতে চাচ্ছিল।’

‘আমি ভাবলাম তুমি ওকে করাচি পাঠিয়েছ।’

‘না—আসলে কাছে তো,’ আর্থিক সমস্যার দিকে ইঙ্গিত করে রেহানা মৃদু হাসলেন, বিষয়টা লুফে নিলেন পারভিন।

‘কিন্তু আমাদেরকে বলতে পারতে—’

‘আমি চাপিয়ে দিতে পারি না ভাবি।’

‘আমরা তো এখানে সব সময় তোমাদের জন্য আছি।’

আবদুল সন্তর্পণে ঘরে ঢুকল, পিতলের টেবিলের ওপর টোপ নামিয়ে রাখল কোনো শব্দ না করেই, এজন্য পারভিন মাথা নেড়ে তাকে পুরস্কৃত করলেন।

‘ঢালো,’ তিনি বললেন, রেহানার দিকে এগিয়ে গেলেন বিস্কুট। হুকুম-মতো আনা বিদেশি টিন থেকে একটা বিস্কুট বেছে নিলেন রেহানা আর কামড় বসিয়ে মাখনদার মচমচে বিস্কুটের বিশেষ তারিফ করলেন।

‘যেহেতু তোমার ভাই এখন—কী বলে—একটা অবস্থানে আছে, এসব ছোটখাটো বিলাস আমরা করতেই পারি। এগুলো আমাদের প্রাপ্য, ঠিক না? আর এ রকম একটা সময়ে তো বটেই।’

রেহানা উপলব্ধি করেন, এই বাসায় যুদ্ধকে উল্লেখ করা হবে নানা ধরনের শব্দবন্ধে, যেমন ‘এ রকম একটা সময়’ বা ‘গুণগোলের সময়’, যেন আল্লাহ কোনো সতর্কতা ছাড়াই তাঁদের ওপর এ রকম একটা সময় চাপিয়ে দিয়েছেন আর এতে তাঁদের বিন্দুমাত্র কোনো দোষ নেই।

‘হ্যাঁ, কঠিন সময়, আমি জানি।’

পায়ের শব্দ। রেহানার পেটে মোচড় দিয়ে উঠল যখন ফয়েজ দুই হাত প্রসারিত করে ঘরে ঢুকলেন, একটা গভীর তৃপ্ত হাসি তাঁর মুখের নিচের অংশটা উজ্জ্বল করে রেখেছে। ওপরের অংশ বিশাল কালো চশমায় আড়াল হয়ে আছে।

‘ভাবি!’ উৎসবের আমেজ তাঁর গলায়। ‘তোমাকে দেখে খুব ভালো লাগছে!’ তাঁর সম্ভাষণ গ্রহণ করতে রেহানা উঠে দাঁড়ালেন। একটা কড়কড়ে সাদা কোর্তা পরে আছেন ফয়েজ আর সঙ্গে জুড়ি মিলিয়ে সাদা টুপি। সেই সাথে পাওয়া গেল হালকা গোলাপজল আর মসজিদ-ফেরা পায়ের ময়লা গন্ধ।

‘এটা একটা দেখার মতো দৃশ্য,’ চেয়ার ছেড়ে না উঠে উচ্ছ্বসিত গলায় পারভিন বললেন। ‘রেহানা ভাবি, তুমি জানো না, কত দিন পর তোমার ভাই দুপুরে বাসায় খেতে এসেছে। এমনকি শুক্রবারেও ওকে পাওয়া অসম্ভব।’

‘আমি কৃতজ্ঞ,’ রেহানা বললেন ফিসফিস করে, ফয়েজ ভারি শ্বাস টেনে চেয়ারে বসলেন।

‘ভাবির সাথে দুপুরে খাওয়া তো আমি বাদ দিতে পারি না।’ চোখের চশমা খুলে সেটা রেহানার দিকে নির্দেশ করে বললেন, ‘মাশাল্লাহ, তোমাকে খুব সজীব দেখাচ্ছে।’ তিনি নাকের মাথার জায়গাটা ঘষলেন, যেখানে চশমার কালো দাগ দেবে বসেছে।

এই প্রশংসাকে কীভাবে নেবেন রেহানা বুঝতে পারছিলেন না, তিনি দৃষ্টি ঘুরিয়ে পারভিনের দিকে তাকালেন, সোফার গভীরে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে বেশ জাঁকিয়ে বসেছেন পারভিন।

‘ওকে দেখতে বেশ সুশ্রী লাগছে! তাই না?’ ফয়েজ বলে গেলেন।

‘হ্যাঁ, অবশ্যই,’ পারভিন বললেন।

‘জানো রেহানা, তোমার কোন ব্যাপারটা আমি সবচেয়ে অস্বস্তি করি— এত তকলিফের মধ্যেও তুমি নিজেকে কত হাসিখুশি রাখো! মেয়েদের জন্য বিধবা হওয়ার চাইতে মন্দভাগ্য তো আর হতে পারে না—তবুও এই যে দুটো বাচ্চা তুমি প্রায় বড় করে তুললে, মানুষ করলে—’

‘অবশ্যই,’ পারভিন কথার মধ্যে ঢুকে পড়ে বললেন, ‘প্রত্যেকেরই দুঃখ-কষ্ট আছে, যেমন আমার, খোদা আমাকে কোনো সন্তান দেন নাই, কিন্তু কেউ তো আমাকে কখনো অভিযোগ করতে শোনো না।’

সাথে সাথে রেহানার মনে পড়ে গেল সেই দিনটার কথা, যেদিন তিনি পারভিনের

কাছ থেকে বাচ্চাদের নিয়ে এসেছিলেন। পারভিন ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলেন, বিলাপ করে, বুক চাপড়েছিলেন। রেহানার পায়ে পড়ে বাচ্চাদের রেখে যাওয়ার জন্য মাথা কুটেছিলেন তিনি। ‘একজনকে দাও,’ পারভিন বলেছিলেন, ‘দয়া করে আমাকে অন্তত একটাকে দাও।’ ‘সোহেল,’ তিনি বলেছিলেন, ‘আমি ছেলে চাই। আমি ছেলেটাকে চাই।’ আর রেহানা তাঁকে সেখানে ফেলে রেখে চলে এসেছিলেন, গোলাপি রঙের মার্বেল-মেঝেতে পারভিন গড়াগড়ি খেতে শুরু করেছিলেন যেন গায়ের আগুন নেভাচ্ছেন, আর রেহানার তখন একটা চিন্তাই মাথায় এসেছিল—আহারে, বেচারির হয়তো ঠাণ্ডা লেগে যাবে। সেখানে আবদুল ছিল, এবং সে দরজা খুলে দিয়েছিল, রেহানা বীরদর্পে বেরিয়ে এসেছিলেন, দুই হাতে দুই বাচ্চা নিয়ে, সারা জীবনের জন্য তাদেরকে আগলে ধরে।

রেহানা সচেতন হয়ে তার ধূসর অরগান্ডির আঁচল ঠিক করলেন। আঙুল দিয়ে চিরুনির মতো করে গৌফ আঁচড়ালেন ফয়েজ।

‘বলো,’ অবশেষে বললেন তিনি, ‘আমার ভাতিজি আর ভাতিজা কেমন আছে?’

রেহানা আবার তাঁর মুখস্থ বুলি আওড়ে গেলেন, খেয়াল করে যোগ করলেন টুকটাক কিছু নতুন তথ্য। শাহিন স্কুলের বন্ধু। ভালো ছেলে, করাচিতে অ্যাকাউন্টিং পড়ছে।

‘মাশালাহ,’ ফয়েজ বললেন, ‘হাজার গুরুর যে ছেলেটার এইসব গুণগোল থেকে দূরে থাকার ইঁশ হয়েছে। কম বয়সী ছেলেদের জন্য এখনটা মোটেও নিরাপদ না।’

‘কারণ ওদের আপনারা ধরে নিয়ে বিকলাঙ্গ করে দিচ্ছেন, রেহানা ভাবলেন। ‘হ্যাঁ, সেজন্যই আমি আরও জোর করলাম,’ তিনি বললেন।

ফয়েজ এক হাত ওপরে তুললেন, হাতের তালু বরাভয়ের ভঙ্গিতে ধরা। ‘খারাপ প্রভাব, বুঝলে না।’ অন্য হাত দিয়ে একই ভঙ্গি করে তিনি বললেন, ‘কম বয়স, সহজেই মনের ওপর ছাপ পড়ে—আর ফলাফল এখন যা হচ্ছে তাই হয়।’

গণহত্যা?

‘গুণগোল!’ পারভিনের হাত চট করে স্বামীর কোর্তার পকেটে ঢুকে গেল আর রূপোর চারকোনা একটা বাক্সসমেত উঠে এলো। তিনি বোতামে ছাপ দিয়ে বাক্সের ডালা খুলে ফেললেও ফয়েজ বিষয়টাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করলেন। তারপর একটা সিগারেট তুলে নিলেন পারভিন, রাঙানো দুই আঙুলের ফাঁকে আঁকড়ে ধরলেন।

বিস্মিত রেহানার মুখ হাঁ হয়ে আছে।

‘ভাবি, এত অবাক হওয়ার কিছু নেই।’

ফয়েজ পারভিনকে উপেক্ষা করে তাঁর বক্তৃতা চালিয়ে গেলেন। পাকিস্তানের অখণ্ডতা এখন হুমকির মুখে। তিনি রেহানার দিকে ঝুঁকে এলেন আর নিশ্বাসের গরম হাওয়া বয়ে গেল তাঁর ওপর দিয়ে।

‘জাতীয় অখণ্ডতা, ধর্মীয় অখণ্ডতা অটুট রাখতে আমরা যুদ্ধ করছি। মুক্তিযোদ্ধা

তো আসলে আমরাই।’

‘খাবার দেওয়া হয়েছে স্যার,’ আবদুল বাদ সাধল।

‘আহ, লাঞ্চ। আসো রেহানা, চলো একসঙ্গে খাই।’

ওরা যখন খাবার ঘরের দিকে যাচ্ছেন, ফয়েজ তাঁর স্ত্রীর কনুই শক্ত থাবায় চেপে ধরলেন। পেছনে হাঁটতে হাঁটতে রেহানা এমন ভান করলেন যেন স্ত্রীর হাতে দেবে বসা ফয়েজের পাঁচ আঙুলের গোলাপি ছোপ তিনি লক্ষ্য করেননি। ‘নেভাও,’ তিনি আস্তে করে বললেন।

‘আমার তো আর কিছু করার নাই,’ দরকারের চেয়েও জোরে শোনালা পারভিনের উত্তর। শূন্য মাতৃজঠর চেষ্টায় জানাল তার উপস্থিতি।

সেগুন কাঠের বিশাল টেবিলে তাঁদের তিনজনের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

‘এত কষ্ট করার কোনো দরকার ছিল না,’ টেবিল জুড়ে রাখা বিভিন্ন পদ দেখিয়ে রেহানা বললেন পারভিনকে।

‘আমি একটাও বানাইনি—এমনকি কী রান্না হবে তা-ও জানি না। বাবুর্চিই সব করেছে, এই বাড়ির সাথে বাবুর্চিও মিলেছে। খাইয়ে মোটা করে ফেলল।’ তিনি তাঁর স্ত্রীত ভুঁড়িতে ছোট চাপড় দেন।

‘প্লিজ বসো,’ ফয়েজ বললেন, নিজের বাঁ দিকে বসতে ইশারা করলেন তিনি। রেহানা টেবিলে ছড়ানো নানান পদ খুঁটিয়ে দেখলেন। তেলতেলে ইলিশ মাছের তরকারি আর তার চেয়েও তৈলাক্ত রুই মাছ। মুরগির দুটো পদ: মোসাল্লাম আর কোরমা। টেবিলের শেষ মাথায় পোলাও, এক বাটি ধোঁয়া-ওঠা ডাল, কয়েক রকম ভর্তা, সালাদ আর ছোট এক বাটি আচার।

‘রেহানা মাছ দিয়ে শুরু করো, টাটকা—আজকেই ধরা,’ ফয়েজ বললেন।

গত কয়েক মাস ধরে বাজারে কোনো মাছ নাই, আর ইলিশ তো পাওয়াই যায় না। রেহানার দাঁত শিরশির করে উঠল।

‘এই যে ছেলেছোকরার দল,’ আবদুল ভাত বেড়ে দিলে কিছুক্ষণ নীরবে থাওয়া-দাওয়া চলার পর ফয়েজ বলেন। ‘তরুণ তুর্কিরা—কিশোর জন্য তারা যুদ্ধ করছে? অর্থহীন যুদ্ধ। তুমি কি ভাবো মুজিব কারও পরোয়া করে? ও তো কেবল ভারতের টাকা খাচ্ছে আর মোটা হচ্ছে। আসল কথা হলো, কোনোভাবেই পাকিস্তানকে বিভক্ত হতে দেয়া যাবে না! তুমি কী বলো?’

ইলিশ মাছের যে টুকরোটায় রেহানা কামড় দিয়েছিলেন, সেটা যেন গলায় বিধে গেল। তিনি খোদার কাছে মাফ চাইলেন। তারপর সম্মতি জানালেন ফয়েজের কথায়। ‘হ্যাঁ,’ কোনোমতে বললেন, আপনি ‘ঠিক বলেছেন।’

‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ!’ পারভিন ঘোষণা দিলেন, গ্রেস কেলির ঘোমটা গড়িয়ে পড়ে গেছে কাঁধে।

ফয়েজের আঙুল তখনো তার প্লেটের ডালের মধ্যে ডোবানো, রেহানা সিদ্ধান্ত নিলেন এখনই সুযোগটা নেবেন।

তিনি গলা সাফ করলেন। তাঁর নিজের প্লেট তখনো খাবারে ভর্তি। ভাত আর মাছ প্লেটের এক পাশে সরিয়ে দিলেন, দেখে যাতে মনে হয় তাঁর খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। ‘ফয়েজ ভাই, আসলে আপনার কাছে একটা উপকার চাইতে এসেছি।’

‘অবশ্যই,’ কলার থেকে ন্যাপকিন নামিয়ে ফয়েজ বললেন। ‘আমার যা আছে সেসব তোমার নিজের মনে করবে,’ বললেন তিনি। যেন এছাড়া রেহানার আসার আর কোনো কারণ থাকতে পারে না। ‘চলো হাত ধুই আর মিষ্টিমুখ করি, তারপর তুমি যা মনে হয় চাইবে, তা-ই পাবে।’ তিনি রান্নাঘরের দিকে হাত ইশারা করেন। আবদুল পিতলের বাটিতে পানি আর নতুন সাবান নিয়ে হাজির হয়।

তাঁরা যখন বসার ঘরে ফিরে এসে আবার গুছিয়ে বসলেন, রেহানা শুরু করেন। ‘আসলে, আমার প্রতিবেশী খুব বিপদে পড়েছেন।’

ফয়েজের কপালে ভাঁজ পড়ে। ‘তোমার প্রতিবেশী? ঐ হিন্দুরা?’

‘না, সেনগুপ্তরা না। তাঁরা চলে গেছে।’

‘পারভিন বলছিল যে তোমার ভাড়াটে হিন্দু,’ ফয়েজ বললেন। ‘ওরা যে চলে গেল এখন তুমি কী করবে? এই গুণ্ডাগেলের মধ্যে নতুন ভাড়াটে পাওয়ার আশা তো কম। আমার ধারণা, ওরা তোমাকে ভাড়াও দেয় নাই।’

‘এত তাড়াহুড়োয় ছিল—’

‘এটাই তো আমি সবসময় বলি! এ কথা আমি হাজারবার বলি, এই পারভিন, বলি নাই? এই দেশকে ওরা নিজের দেশ বলে মোটেও পোছে না। একটা কিছু হলো, কি ইন্ডিয়া চলল—ওরা কখনোই পাকিস্তানের অংশ ছিল না। গেছে, বাঁচা গেছে, এটাই আমি বলি, যেখান থেকে এসেছিল সেখানে ফিরে যেতে দাও। তো, তোমার টাকার দরকার, তাই তো?’

‘ব্যাপারটা আসলে আমার প্রতিবেশী মিসেস চৌধুরীকে নিয়ে।’

‘ও—সেই বিখ্যাত মিসেস চৌধুরী,’ পারভিন বলেন। ‘জান, মিসেস চৌধুরীকে তোমার মনে নাই?’ তিনি তাঁকে মনে করার সময়টুকুও দেন না, বলেন, ‘ওই যে চেনো তো তুমি।’

‘হ্যাঁ, আপনি চেনেন,’ রেহানা বলেন।

‘মিসেস চৌধুরী তাহলে কেমন আছেন?’

কথা ঠিক দিকে এগোচ্ছে না। ‘এতগুলো বছর মিসেস চৌধুরী আমাকে খুবই সাহায্য করেছেন, আমার প্রতি খুব সদয় থেকেছেন তিনি,’ রেহানা বললেন।

‘হ্যাঁ, সে সম্পর্কে আমরা সবাই জানি, তাই না জান?’

ফয়েজ তাঁর স্ত্রীর হাঁটুতে চাপড় দেন, বলেন, ‘সমস্যা কী?’ তিনি জানতে চান,

এরই মধ্যে কিছুটা নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছেন।

‘সমস্যা তাঁর মেয়ের জামাইয়ের।’

‘ওইটুকুন পিচ্চি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে?’ পারভিন জিজ্ঞেস করেন।

‘একজন অফিসারের সাথে বিয়ে হয়েছে,’ রেহানা বলেন।

এই কথায় ওঁদের দৃষ্টিতে হালকা আগ্রহ ধরা পড়ে। ‘অফিসার? কে? আমি চিনি তাকে?’

রেহানা ঠিক করলেন পুরো ঘটনা তিনি একবারে বলে যাবেন। ‘ভাইজান, ছেলেটা পাকিস্তান আর্মিতে ছিল, কিন্তু অন্য বাঙালি সেনার মতো সেও বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দেয়। সে যুদ্ধ করছিল। পরে ধরা পড়েছে। মিসেস চৌধুরীরা শুনেছেন যে এখন তাকে ঢাকায় আনা হয়েছে আর আমি তার মুক্তির জন্য আপনার কাছে এসেছি।’

শব্দগুলো থিতু হওয়ার আগেই পারভিন রক্ষয়িত্রীর বাহু মেলে তাঁর স্বামীকে জড়িয়ে ধরলেন। ‘এমন অনুরোধ তোমার করা উচিত হয়নি রেহানা। এই কাজ তোমার ভাইজান তোমার জন্য করতে পারবে না।’

‘ও ঠিকই বলেছে,’ ফয়েজ ফাঁক পেয়ে বললেন। ‘এই অনুরোধ তোমার করা উচিত হয়নি।’

‘এজন্য তুমি এখানে এসেছ? এজন্য তুমি এত বছর পর আমাদের দেখতে এসেছ?’ পারভিনের নাক ফুলে উঠল।

‘আমি শুধু—আমি ওদের জন্য কিছু করতে চাই।’

‘এই মহিলা এত বছর ধরে তোমাকে কেবল খারাপ পরামর্শ দিয়েছে আর তারপরও তুমি ওর পক্ষ নিচ্ছে?’

‘বেচারা মেয়েটা—সিলভি—একদম ভেঙে পড়েছে...’

‘একটা বাঙালি বিদ্রোহীকে ওর বিয়ে করা উচিত হয় নাই, ঠিক না?’

‘ওর সাথে বিয়ে হওয়ার আগে তো মেয়েটা জানত না যে ও বিদ্রোহীদের দলে ভিড়বে। মিসেস চৌধুরী ভেবেছিলেন তিনি মেয়েকে একজন আর্মি অফিসারের সাথে বিয়ে দিচ্ছেন।’

ফয়েজের চেহারা দেখে রেহানার মনে হলো তাঁকে আরও চাপে ধরা যায়। ‘ও সবার তালে পড়ে গেল। আর কীই-বা করতে পারত? ওর পুরো বাহিনী বিদ্রোহ করেছে। ছেলেটা আসলে একটু বোকাটে ধরনের, দুর্বল। ও আর্মিতে ছিল’—তিনি বলতে যাচ্ছিলেন গণহত্যার আগে—‘মার্চের আগ পর্যন্ত, আর তারপর সবার তালে তাল মিলাল।’

‘তাল মিলাল?’

‘হ্যাঁ—আপনি তো জানেন, বয়স কম থাকলে, অনেকে নিজেই জানে না সে কী করছে—আপনি তো নিজেই বললেন, অন্যেরা যা বলছে তারই ধুয়া ধরতে থাকে

এরা। সেই ছেলে কোনো লিডার-টিডার নয়, সবকিছুর পিছে থাকে—আর এখন ওর কোনো খবর নাই, নিজেকে নিজে এই গাড্ডার মধ্যে ফেলেছে, সত্যি কথা বলতে কি, আপনিই আসলে ওকে বাঁচাতে পারেন, মানে, ওকে ওর নিজের হাত থেকে বাঁচাতে পারেন। এই মহাবিপদ থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে আপনার প্রতি ও এতই কৃতজ্ঞ থাকবে যে ও বুঝবে, আপনি, মানে আর্মি, এখানে এসেছে ন্যায় ফিরিয়ে আনতে, এই অচলাবস্থার অবসান ঘটাতে, কাউকে শাস্তি দিতে নয়। এটা করলে আপনি আমাদের জন্য—পুরো দেশের জন্য—বিশাল একটা কাজ করবেন।’ শব্দগুলো রেহানার মুখ থেকে তড়বরিয়ে বেরিয়ে এলো; তিনি চিন্তা করার জন্য এমনকি নিশ্বাস নেয়ার জন্যও কোনো সময় নিলেন না, ফয়েজের চেহারার উৎসুক দৃষ্টি বাড়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাঁর মুখ থেকে স্রোতের মতো কথা বেরিয়ে আসছিল। ‘ছেলেটার হয়তো প্রাণ রক্ষা পাবে,’ তিনি দম ফুরিয়ে শেষ টানলেন।

‘প্রাণ রক্ষা?’

‘আপনিই তার প্রাণ রক্ষা করতে পারেন।’

ফয়েজ মুহূর্তকাল চিন্তা করেন। পারভিন মাথার ঘোমটা টেনে ঠিকঠাক করেন, চেষ্টা করেন নিজেকে কেতাদুরস্ত দেখতে।

‘আমি কীভাবে জানব যে ও আবার মুক্তিবাহিনীতে ফিরে যাবে না? ছেলেটাকে আটক রাখা কি বেশি নিরাপদ না?’

‘খুব সত্যি,’ পারভিন গলা উঁচু করে বলে। ‘আমার স্বামীর কথা শোনো রেহানা, উনি মানুষ চেনেন।’

‘তুমি চুপ করো, আমাকে চিন্তা করতে দাও।’

সামান্য বিরতি দিয়ে রেহানা আবার বলেন, ‘ভাই, আপনি বিশ্বাস রাখেন। যদি ছেলেটাকে বাঁচান ও বদলে যাবে। আপনার মহানুভবতার কারণে বদলে যাবে। ও যখন দেখবে আপনি জেলের তালা খুলে দিচ্ছেন, ও আর কখনো জঘন্য বিদ্রোহীদের সাথে হাত মেলাতে যাবে না।’ কী অবলীলায় বিশ্বাসঘাতী শব্দগুলো তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো।

তিনি রেহানার জন্য অপেক্ষা করছিলেন সোনার ড্রইং রুমে। ক্রিশন পায়ের নিচে রেখে দরজা বরাবর সোফায় বসেছিলেন। গায়ে একটা নতুন শার্ট।

‘কী হলো?’ তিনি জিজ্ঞেস করেন।

‘ফয়েজ ভাই রাজি হয়েছেন।’

পায়ের ওপর পা তুলে দিলেন এমনভাবে যে একটা পা রেহানার দিকে তাক করে থাকে; পায়ের গোড়ালি ঘষে পরিষ্কার করা, গোলাপি আভাযুক্ত আর মসৃণ। ‘এরপরও উনি মত বদলাতে পারেন। এটা একটা ফাঁদও হতে পারে।’

‘আমি আপনাকে বলছি আমি ওদের বোকা বানিয়েছি,’ রেহানা বললেন।

‘ওদের কোনো ধারণাই নাই।’

‘আমার মনে হয় না ব্যাপারটা এত সোজা, আমার কাছে নিরাপদ মনে হচ্ছে না।’

ওকে এখন ইকবালের মতো লাগছে। ফয়েজ আর পারভিনকে যেখানে তিনি একহাত দেখিয়ে দিয়ে এলেন, সত্যিকারের বিজয় যাকে বলে— সেখানে ওর মুখে নিরাপত্তার বুলি ছাড়া আর কিছু নেই। রেহানা টের পান তার মুখ তেতে উঠছে। ‘আপনি বলেছেন, মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়া আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ—তাহলে আজ আমি যা করলাম সেটাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ, এটা আমি আমার ছেলের জন্য করেছি। আপনি বুঝতে পারছেন না?’

মনে হলো মেজর বোঝার চেষ্টা করছেন। তারপর বললেন, ‘খুব বড় ঝুঁকি নিয়েছেন। আপনি কি এর মধ্যেই যথেষ্ট করেননি?’ তিনি হাত নেড়ে ইঙ্গিতে দেখান বাড়িটাকে, তাঁকে এবং গেরিলাদের যাঁদের তিনি আশ্রয় দিয়েছেন।

‘না,’ তিনি বলেন, তার কণ্ঠস্বরে ক্রোধ ফুটে ওঠে, ‘আমি যথেষ্ট করিনি। আমার করণীয়টুকু আমি করতে চাই। হয়তো এটা আমার ছেলের জন্য না—হয়তো এটা অন্য কিছু। আচ্ছা, আপনি কি মনে করেন না আমার সন্তানদের ছাড়াও আর কিছুকে আমি ভালোবাসতে পারি? পারি। আমি অন্য কিছুকেও ভালোবাসতে পারি।’

‘কিন্তু সমানভাবে না।’

ওর এই প্রজ্ঞা রেহানাকে বিস্মিত করে। রেহানা যেন একটা পুকুর, যার তল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছেন এই লোক। ‘হ্যাঁ, সমানভাবে না।’



ফয়েজ খবর পাঠিয়েছেন, দশটার সময় আসবেন তিনি। ছয়টার সময়, ফজরের নামাজের ঠিক পরে, সূর্য তখন সোনার পেছন দিয়ে সবে উঠছে, মিসেস চৌধুরী আর সিলভি দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। রেহানা তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন না কেন ওরা এমন সাতসকালে এসেছেন। তাঁরাও রেহানাকে জিজ্ঞেস করলেন না কেন তিনি এত সকালে তৈরি হয়ে আছেন। মিসেস চৌধুরী রেহানার হাত দুটো নিজের হাতে তুলে নিয়ে কৃতজ্ঞতায় আলতো হাসলেন, তাঁর ফ্যাকাশে হলুদ চোখে সাহসের কাজল টানা।

‘চলেন নাশতা করি।’ রেহানা বললেন।

‘সেই ভালো। সিলভি, যা রান্নাঘরে খালামপিকে সাহায্য কর।’

‘কী খাওয়া যায়? মোগলাই পরোটা?’ পরোটার মাঝখানে কীভাবে ডিম না-ভেঙে ফাটা যায়, রেহানার ভালো রপ্ত করা।

তাঁরা সবে টেবিলের চারপাশে সুস্থির হয়ে বসেছেন, তখন দরজায় দ্বিধাজড়িত টোকা পড়ে। রেহানা দরজা খুলে দেখেন মিসেস রহমান, তাঁর পরনে গোলাপি

সুতির শাড়ি আর হাতে কয়েকটা রজনীগন্ধা। ফুলগুলো বিশুদ্ধ সুবাস ছড়াচ্ছে। মিসেস রহমানের কপালের দুই পাশের ধূসর চুল শক্ত ডানার মতো মুখিয়ে আছে। এত দিন ধরে তিনি চুলে কলপ করছেন, আমি লক্ষ্যই করিনি!— ব্যাপারটা বুঝতে পেরে রেহানা হাসেন। সবকিছু আবার আগের মতো মনে হলো।

‘আমাকে বলেন নাই কেন?’ মিসেস রহমান জিজ্ঞেস করেন। তাঁকে মনোক্ষুণ্ণ দেখায়। ‘আমি তো জানতামই না আপনি এতটা জড়িত।’

রেহানা কী বলবেন ভেবে পেলেন না।

‘আমি সাহায্য করতে পারতাম।’

‘আমিই ওদের ফোন করেছি,’ মিসেস চৌধুরী রেহানার পেছন থেকে এগিয়ে এসে বললেন। ‘ওনাকে ভেতরে আসতে দেবেন না?’

‘আমি আপনাকে বিরক্ত করতে চাই না,’ মিসেস রহমান বললেন। এক পায়ের ভর আরেক পায়ে চালান করে তিনি তখনো দরজায় দাঁড়িয়ে ব্যথিত দেখাচ্ছে তাঁকে।

‘আসেন প্লিজ, আমরা মাত্র নাশতা সারছি।’

‘এই যে, এগুলো আপনার জন্য। আমার বাগানের ফুল। ভেবে পেলাম না কি আনা যায়।’

দরজা বন্ধ করতে গিয়ে রেহানা দেখেন মিসেস আকরাম আসছেন। আরেকজন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে রিকশা থেকে নামছেন তিনি। মিসেস চৌধুরী আর কতজনকে বলেছেন?

‘রেহানা,’ গাড়িবারান্দা দিয়ে হেঁটে আসতে আসতে মিসেস আকরাম বললেন, ‘মিসেস চৌধুরী বললেন, আপনি নাকি সাবিরকে ছাড়িয়ে আনতে যাচ্ছেন। ইনি মিসেস ইমাম। ওনার স্বামীকেও ধরে নিয়ে গেছে।’

রেহানা সিলভিকে শেখালেন কীভাবে ফোটানো তেলে পরোটা ছাড়তে হয়, কীভাবে প্রায় মচমচে হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারপর ডিমটা এর মধ্যে ঢেলে দিতে হয়। মিসেস ইমাম রান্নাঘর থেকে গরম মোগলাই পরোটা নিয়ে এলেন। মেহমানরা বসার ঘরে গোল হয়ে বসলেন, কথাবার্তা খুব কমই হলো। চা দেয়ার পরে রেহানা বুঝলেন, সবাই আসলে তাঁর কিছু বলার অপেক্ষায় আছেন। সাহসী আর প্রতিবাদী কোনো কিছু, যা বদলে দিতে পারবে তাঁদের মনে গেঁথে বসা ভয়ঙ্কর সব প্রতিচ্ছবি অচেনা মানুষজনের মৃত্যু, শব্দের রাস্তায় ট্যাংকের ঘর্ঘর এগিয়ে চলা, দরজায় করাঘাত, বুলেটের ছুঁতোর যাওয়া, ভালোবাসার মানুষ, প্রাণপ্রিয় সন্তানের মাটিতে লুটিয়ে পড়ার শব্দ।

‘আমি এটুকু কেবল আশা করতে পারি,’ তিনি বললেন, ‘আমার ছেলে যদি বিপদে পড়ে, তখন আপনাদের মধ্যে কেউ—হয়তো তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসবেন।’

মোগলাই পরোটা শেষ। রেহানা সবাইকে পানের থালা এগিয়ে দিলেন। কথাবার্তা ক্ষান্ত হয়ে মধ্য-সকালের আলস্যভরা নীরবতায় প্রবেশ করল। এখনই উঠে পড়ার জন্য ভালো সময়।

‘যাওয়ার সময় হয়েছে, মনে হয়,’ বিশেষ কাউকে উদ্দেশ্য না করেই তিনি বললেন। মিসেস চৌধুরী, পানের রসে লাল টুকটুক ঠোট আর কিছুটা তন্দ্রাচ্ছন্ন, সোফায় হাত-পা ছড়িয়ে কাত হয়ে ছিলেন। পরোটার প্লেট আর খালি গ্লাসগুলো ঘরের চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।

রেহানা সবাইকে বিদায় জানাতে উঠে দাঁড়ালেন, তখন দূর থেকে একটা গাড়ি এসে থামার শব্দ হলো আর হর্ন বাজতে লাগল।

মিসেস চৌধুরী হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসলেন। ‘এসে গেছে,’ কঁকিয়ে উঠলেন তিনি। ‘জলদি করুন, আপনার ভাই চলে এসেছেন। এখনই যাওয়া উচিত আপনার। তৈরি হয়ে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকুন, যাতে তাঁকে অপেক্ষা করতে না হয়।’

মহিলারা নিজে থেকে উঠলেন আর দরজার কাছে জড়ো হলেন। রেহানা তাঁদের বিদায় সম্ভাষণের অপেক্ষায় রইলেন। কিন্তু তাঁরা পিছু পিছু গাড়িবারান্দা পর্যন্ত হেঁটে এসে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন।

‘প্লিজ,’ তিনি কপট ভদ্রতায় বললেন, ‘আমার জন্য আর অপেক্ষা করবেন না।’

‘তা হয় না,’ মিসেস চৌধুরী বললেন, ‘আমরা আপনাকে যেতে দেখব।’ সবাই মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

‘আমরা অপেক্ষা করব,’ মিসেস রহমান বললেন, ‘এটুকু তো আমরা করতেই পারি।’

‘কিন্তু আমি—প্লিজ, খামাখা কষ্ট করবেন কেন।’

‘আমরা থাকছি,’ মিসেস চৌধুরী বললেন। নিজের কর্তৃত্বে খুশি হলেন তিনি, ‘তর্ক করবেন না তো।’

‘ঠিক আছে; আমি শুধু, আমাকে শুধু স্যান্ডেলটা বদলাতে হবে।’

‘যান, যান! শিগগির!’

রেহানা ইতস্তত করলেন। ‘এক মিনিটের মধ্যেই আসছি।’

শোয়ার ঘরে ঢুকে কোন স্যান্ডেল জোড়া পায়ে দেবেন ভাবলেন তিনি, শেষমেশ এক জোড়া খয়েরি স্যান্ডেল বেছে নিলেন, গোড়ালি ছোট, চারকোনা। সুতির গাঢ় নীল শাড়ি পরেছেন তিনি, শেষ মুহূর্তে কামের এক জোড়া বুঝকা পরে নিলেন।

‘ঠিক আছে,’ উজ্জ্বল মুখে তিনি জানালেন, ‘আমি তৈরি।’

‘যান তাহলে, দেরি হতে চান না নিশ্চয়ই,’ কোমরে হাত রেখে মিসেস চৌধুরী বললেন।

রেহানা গেটের দিকে এগিয়ে গেলেন, ছোট দলটা তাঁর পেছনে আসছে।

সিলভি রেহানার হাত হাতে তুলে নিল আর কানের কাছে শান্ত নরম গলায়
বিড়বিড় করে পড়তে শুরু করল :

লা-তা'খুযুহ্ ছিনাতুওঁ ওয়া লা নাওম্ ।

লাহ্ মা ফিস্ সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল্ আরদি ।

(তিনি চিরজীবী ও চিরস্থায়ী । তাঁকে তদ্দাও স্পর্শ করতে পারে না, নিদ্রাও না ।

আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর ।)

সবাই গেটে দাঁড়িয়ে আছেন । 'আমি—আমি একটা জিনিস ভুলে গেছি ।'

রেহানা তাঁদের বিস্মিত মুখগুলোকে পাশ কাটিয়ে ছুটে গেলেন; মিসেস চৌধুরীর কণ্ঠ কানে এলো, 'বেচারি নিশ্চয়ই ঘাবড়ে গেছে ।' তাঁর মনে হলো, মিসেস আকরামকে বলতে গুললেন, 'উনি কি মত বদলে ফেললেন নাকি?' ততক্ষণে অনেক দূর চলে এসেছেন তিনি, উত্তরটা কানে এলো না । তিনি পালিয়ে এলেন, গাড়িবারান্দা পার হয়ে, বসার ঘরের ভেতর দিয়ে, বারান্দার ছোট্ট গেট খুলে, কাপড় শুকানোর দড়িতে আত্মসমর্পণের পতাকার মতো ঝুলতে থাকা ভেজা সাদা চাদর সোজা ভেদ করে । হাতের চাবির গোছা বেসামাল হয়ে যাচ্ছিল, ধীরতার জন্য আঙুলগুলোকে অভিশাপ দিলেন তিনি আর শেষ পর্যন্ত সোনার পেছনের দরজার তালা খুলে ধাক্কা দিয়ে ঢুকলেন ভেতরে ।

*

মেজর অপেক্ষা করছেন, যে পোশাকে এসেছিলেন, সেই আর্মির পোশাক পরা; গাঢ় সবুজ সুতো দিয়ে রেহানা ছেঁড়া প্যান্ট আবার রিফু করে দিয়েছেন । তিনি উঠে দাঁড়ান, দৃষ্টি রেহানার ওপর এমনভাবে স্থির যেন তিনি আগে থেকেই ওখানে ছিলেন ।

রেহানা তাঁকে খুব কমই দাঁড়াতে দেখেছেন । তিনি কেবল শুয়ে থাকতেন, চারপাশে ঘুরে ফিরে রেহানা সবসময় ওপর থেকেই তাঁকে দেখেছেন । তাই তাঁর মাথার ওপরটার সাথেই তাঁর পরিচয়: চুলের গহন ঘনত্ব, আঁকাবাঁকা সিঁথি । তাঁর মুখটা জানা—অন্তত যতটুকু জানার সাহস তিনি করেছেন ।

কিন্তু যেদিন ওঁর সঙ্গে প্রথম দেখা, যেদিন রেহানার হাত তিনি নিজের হাতের চওড়া মুঠোয় তুলে নিয়েছিলেন, তারপর থেকে একবারও ওঁর দাঁড়িয়ে থাকা পরিপূর্ণ উপস্থিতির সামনে পড়েননি তিনি ।

দেখেননি তাঁর চোখের ধূসর কোন ।

দেখেননি বুকের দিগন্ত ।

যদি তিনি বসে থাকতেন, রেহানা হয়তো ভাব দেখতে পারতেন যে, তিনি এখনো তাঁর রোগী, তাঁর অধীন । দাঁড়ানো অবস্থায় তিনি এখন অচেনা এক মানুষ ।

অচেনা মানুষটা বললেন, 'কারও মুখের দিকে তাকাবেন না ।'

ওর শার্টের আঁটোসাঁটো কাপড়ের দিকে তাকিয়ে তিনি মাথা নাড়েন ।

গলা উঁচু করে, প্রতিটা শব্দের ফাঁকে বিরাম দিয়ে তিনি বললেন, ‘আসলে, বলবেনই না কোনো কথা। কোনো কথাই বলবেন না।’

‘ঠিক আছে,’ রেহানা বললেন।

‘ডাক্তার একটা চিঠি পাঠিয়েছে,’ মেজর বললেন।

‘কী?’

‘আমি সুস্থ। পা সেরে গেছে। এখন আমার যাওয়ার সময় হয়েছে।’

রেহানার মনে হলো, তাঁর চারপাশের বাতাস ঘুরপাক খাচ্ছে। তিনি নিজেকে বশে আনেন। ‘আর দেখা হচ্ছে না, তাহলে?’

তিনি মাথা নাড়েন। ‘আপনি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি আছি।’

সাহসের ভঙ্গি করে ঘাড় ঝাঁকান তিনি।

‘আপনি যদি তিন ঘণ্টার মধ্যে না আসেন আমি আপনার খোঁজে আসছি।’

‘আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে,’ তিনি বলেন, ‘সবাই অপেক্ষা করছে।’

‘খোদা হাফেজ।’

‘খোদা হাফেজ।’

‘ফি আমানিল্লাহ।’

এবার রেহানাকে দেখে কাসেম আর গাড়ি থেকে নামল না। ফয়েজও না। কালো মার্সিডিজ রেহানাকে গিলে ফেলল। ‘কেমন আছো,’ ফয়েজ বললেন উচ্ছ্বাসহীন গলায়। তিনি কয়লা-কালো সুট পরেছেন আর তার বুকপকেটে চকচকে একটা রুমাল গোঁজা। লেবুর সুবাস ঝরছে সুট থেকে। চকচকে কালো চুল, কপালের কাছটায় হালকা হয়ে এসেছে, পাতলা চিরুনির আঁচড় প্রকাশ করছে।

কারও মুখের দিকে তাকাবেন না। ফয়েজের দৃষ্টি এড়াতে গিয়ে রেহানার চোখ গিয়ে পড়ল কাসেমের চৌকোণ আর নারকেল তেলে চপচপে মাথার পেছনটায়।

ফয়েজ নিশ্চুপ। কালো চশমা তাঁর চোখে, হাতে খবরের কাগজ নিয়ে তিনি জানালা ঘেঁষে বসে আছেন। রেহানা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন; তাঁর ওপর বলতে ইচ্ছা করছে না। পুলিশ স্টেশনে গিয়ে কী দেখবেন সেই চিন্তায় তটস্থ তিনি। মিসেস ইমাম বলেছেন, তাঁর স্বামীর লাশ আর ফেরত দেয়া হয়নি। রেহানা তাঁর ভাবনাগুলোকে বাগে রাখার চেষ্টা করতে থাকলেন।

আমি আপনার খোঁজে আসছি।

মিনিট পেরিয়ে যাচ্ছে, সকালের বৃষ্টিতে ধোয়াশ শহর পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। ফয়েজ এত শান্ত আর স্থির হয়ে বসে আছেন যে, রেহানা ভুলেই গেলেন তাঁর উপস্থিতি। তার বদলে পুরোনো কোনো ছবির সুর মনে করতে চাইলেন, যেটা বাবার সঙ্গে গাইতেন তিনি। একটাও মনে পড়ল না। কোনো অজ্ঞাত কারণে গড সেভ দ্য কিং তাঁর মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল আর সেভ হিম ভিকটো-রিয়াস।

ফয়েজ তখনো খবরের কাগজ পড়ছেন। নিশ্চয়ই খুব ধীরে পড়েন তিনি, কারণ পাতা উল্টাচ্ছেন না।

হ্যাপ-পি অ্যান্ড গ্লো-রিয়াস!

টঙ্গী ট্রাফিক লাইট এলে ফয়েজ ঘুরে বসলেন রেহানার দিকে। শান্তভাবে বললেন, ‘তুমি আমাকে মিথ্যা কথা বলেছ।’

তাঁর গলা উঁচুতে উঠে তীক্ষ্ণ হয়ে কেঁপে গেল। রেহানা টের পেলেন, চশমার আড়ালে তাঁর ঞ্জ জোড়া কুঁচকে আছে।

এর অনেক অর্থ হতে পারে, তিনি অনেক কিছুই বোঝাতে পারেন।

‘আমাকে মিথ্যা বলেছ। তুমি মিথ্যুক।’

‘নিশ্চয়ই কোনো ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে।’

‘তুমি একটা মিথ্যুক, একজন বিশ্বাসঘাতক।’

রেহানা তাঁর মুখোমুখি হওয়ার জন্য সোজা হয়ে বসলেন। ফয়েজ কিছু না কিছু জেনেছেন। কী জেনে থাকতে পারেন, মনে মনে সেই সম্ভাবনার ফর্দে চোখ বুলিয়ে নিলেন রেহানা। ঠিক করলেন, কোন তথ্যটা সবচেয়ে খারাপ হবে (সোনার ব্যাপারটা জেনে যাওয়া), আর কোনটা ভালো (না, কিছু না, কিছুই জানা ভালো না)।

‘তুমি একজন দেশদ্রোহী আর তোমার সন্তানরাও তাই। নিজের পক্ষে তোমার কী সাফাই আছে—তুমি অস্বীকার করতে পারো?’

রেহানা অস্বীকার করলেন না।

‘তুমি আমার বাসায় এসে...’

রেহানা মনে মনে ভাবলেন, আমার সবকিছু তো তোমারই—এ কথায় আর নেই ফয়েজ।

‘...আমি যখন পাকিস্তানের কথা বললাম, তুমি মাথা নেড়ে সাই দিয়ে গেলে আর ভেতরে ভেতরে তুমি তোমার দেশের পিঠে ছুরি মারছ!’ তার ঠোঁটের কোনায় সাদা দুটো থুথুর বিন্দু জমা হলো।

‘আমি জানি না আপনি কী নিয়ে কথা বলছেন,’ রেহানা বললেন।

‘এখন তুমি অস্বীকার করতে চাও? আমার মুখের ওপরে?’

‘আমি বলতে চাইছি, কোথাও কোনো ভুল বোঝাবুঝি নিশ্চয়ই হয়েছে,’ রেহানা পুনরাবৃত্তি করলেন।

‘ভুল বোঝাবুঝি?’ তিনি রেহানার দিকে হাত নাড়লেন। খবরের কাগজ তাঁর মুঠোর মধ্যে কাঁপতে লাগল। ‘সকালে আমি এই খবরের কাগজ পড়ছি। এই নেমকহারামি আবর্জনা পড়ছি যে, মুক্তির কত অসমসাহসী, কত দুর্ধর্ষ আর পাকিস্তান আর্মি কত দুর্নীতিবাজ, কত বীভৎস—তারপর শিরোনামে আমার চোখ আটকে গেল—আর আমি কী দেখলাম—কী?—আমার ভাতিজি—তোমার মেয়ে—এটা তার লেখা! শেহেরজাদ হক মায়া, আমার ভাইয়ের দেয়া সেই

হাস্যকর নাম—এক গল্পকথকের নাম নাকি, তুমি বললে। হেঃ, গল্পই ফেঁদেছে অবশ্য—বানোয়াট, মিথ্যায় ভরা—’

খবরের কাগজসহ তাঁর হাতটা তখনো কাঁপছে।

রেহানা সিটে পিঠ এলিয়ে দিলেন আর বহু কষ্টে চোখ বোজার ইচ্ছা সংবরণ করলেন।

‘মিথ্যুক!’ তিনি খবরের কাগজ ছুঁড়ে মারলেন, যাতে সেটা রেহানার পায়ের কাছে গিয়ে পড়ে। রেহানা ভাবলেন কাগজটা তিনি আসলে ছুঁড়ে ফেলে দিতেই চেয়েছেন, কিন্তু যখন কাগজটা ওর পায়ের কাছে পড়ে রইল, তিনি চোঁচিয়ে উঠলেন, ‘পড়ো!’

পায়ের কাছ থেকে কাগজ তুলে নিলেন রেহানা। পড়লেন। ‘যুদ্ধকালে এক তরুণীর কড়চা। লেখিকা শেহেরজাদ হক মায়ী।’ রেহানা বলতে চাইলেন, এই লেখিকা তাঁর মেয়ে মায়ী নয়, কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত একটা হাসি তাঁর ঠোঁটের কোনায় ফুটে উঠল। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে তিনি মুখ ঢাকলেন।

‘আপনার কাছে মিথ্যা বলা উচিত হয়নি,’ তিনি বললেন।

‘তোমার আর কি কি করা উচিত হয়নি আমি এখন তা গুনতে বসব না। মেয়েকে তোমার আয়ত্তে রাখা উচিত ছিল।’

‘এটা ওর দোষ না।’

‘তাহলে এর ব্যাখ্যা কী? মায়াকে মুক্তিদের সঙ্গে যোগ দিতে তুমিই অনুমতি দিয়েছ? তোমার ছেলেটার অন্তত কিছু ইঁশজ্ঞান আছে।’

যাক, সোহেল সম্পর্কে তাহলে উনি কিছু জানেন না।

‘আমার ভাইয়ের সন্তানদের তুমি এই বানিয়েছ? তোমার কাছে ওদের ছেড়ে দেয়া আমাদের কখনোই উচিত হয়নি। তুমি ওদের শেষ করে দিয়েছ।’ তিনি রেহানার দিকে ঝুঁকে এলেন, সানগ্লাসে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাচ্ছেন রেহানা।

ইকবালের কথা উল্লেখ করায় রেহানার অনুতাপ হলো। তিনি টের পেলেন, বেশ ক’দিন ওর কথা ভাবেননি। আসলে অনেক দিন। এত ব্যস্ততা ছিল, আর সবকিছু এত আজব, এত দ্রুত ঘটছে, নিজেকে বোঝান তিনি। আর তখনই আরেকটা ব্যাপার তাঁর মাথায় এলো। ইকবাল যদি বেঁচে থাকত, তাহলে আজ তিনি কি এখানে, এই গাড়িতে বসে থাকতেন? সাবিরকে মুক্ত করার জন্য কয়েজকে অনুরোধ করতে তিনি কি এখানে আসতেন? এরকম ভয়ঙ্কর কিছু মাওয়ার অনুমতি কি তিনি পেতেন? অথবা স্বামীর যা প্রত্যাশা তা-ই মেনে চলতেন? শিক্ষা কি তাঁর হতো?

এইসব প্রশ্নের জবাব তাঁকে আর জানতে হবে না, এটা ভেবে তিনি স্বস্তিই বোধ করলেন। তাঁকে আর জানতে হবে না, এরকম পরিস্থিতিতে ইকবালের ঢাকায় থেকে যাওয়ার মতো মনোবল থাকত কিনা, অথবা ইকবালের ওইটুকুন ছোট্ট, উৎকণ্ঠাভরা জীবনই উত্তরাধিকারসূত্রে পেতো কিনা তাঁর সন্তানরা। আর যা কিছু অন্যরকম হতে পারতো, সেসব ভাবতে ভাবতে রেহানার মাথা ঘুরতে

লাগল। এখন তাঁর মনে পড়ছে ইকবালের আশঙ্কার মেঘগুলো, ওর ব্যাকুল চিন্তার জটাজাল, সেই ভীষণ ঘাবড়ে যাওয়া মানুষটা, যে সারাক্ষণই চেষ্টা করেছে ভাগ্যের বিরূপতা পরিহার করে বিপদহীন, ঝুঁকিহীন জীবনযাপন করতে। তিনি কি তখন এক মুহূর্তের জন্যও ইকবালহীন জীবনের কথা কল্পনা করেছিলেন, আর ইকবালের মৃত্যুর পর তিনি কি কখনো সামান্য হলেও আনন্দিত হয়েছিলেন? বুক-ভাঙা শোক সত্ত্বেও, দুঃখমোচনের কোনো অনুভূতি কি কোথাও ছিল?

তিনি ভাবতে চাইলেন কথাটা সত্যি নয়, কিন্তু আসলে সত্যি।

‘এখন দেখো তুমি কী করেছে,’ ফয়েজ বললেন।

তিনি নিজে যা বিশ্বাস করেন, ফয়েজের বিশ্বাস ঠিক তার বিপরীত মেরুর হলো কী করে? তাঁর চোখে যা সাদা-কালো, এর ঠিক উল্টোটা কেন ফয়েজ? রেহানা এখন যা বিশ্বাস করেন, তার বদলে অন্য কিছু বিশ্বাসের কথা তাঁর কল্পনাতেও আসছে না; ঈশ্বর বিশ্বাসের মতোই সহজ এটা তাঁর কাছে।

ফয়েজ খারাপ মানুষ নন।

এখন সময় এসেছে তাঁকে সত্য কথা বলার।

‘আমিই ওকে পাঠিয়েছি। কলকাতায়, মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে।’

থুথুর বিন্দু বড় হলো। ‘ওখানে তুমি ওকে পাঠিয়েছে?’ তাঁর মুখ দিয়ে রাগী একটা শ্বাস বেরিয়ে এলো। ‘তুমি আমাকে সব বলো। এখনই।’

কাসেমের কাঁধ তার কানগুলোর কাছে চেপে এলো, যেন সে কিছু না শোনার চেষ্টা করছে।

রেহানা দেখলেন ফয়েজের চিবুক রাগে কাঁপছে। সত্য বলার এখনই সময়।

‘আমি দুঃখিত, আমি মিথ্যা বলেছি। আমার বলা উচিত হয়নি...’

‘তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত।’

‘কিন্তু আমি লজ্জিত না।’ নিজেকে সামাল দেয়ার জন্য রেহানা কয়েকবার টোক গেলেন। ‘ওর এক বান্ধবীকে আর্মিরা মার্চ মাসে ধরে নিয়ে যায়। মেয়েটার নাম ছিল শারমিন।’

‘তার সঙ্গে এসবের কী সম্পর্ক?’

‘আমার কথা শোনেন। ওর নাম ছিল শারমিন। তারা ওকে ধরে নিয়ে যায়, সেনানিবাসে বন্দি করে রাখে—আপনার বাড়ি থেকে এক মাইলও দূরে না জায়গাটা। অত্যাচার করতে করতে মেরে ফেলা হয় মেয়েটাকে। তারা ওর সঙ্গে আরো কি কি যে করেছে—মুখে আনা যায় না এমন জঘন্য পৈশাচিক আচরণ করা হয়েছে ওর সঙ্গে। ও আমার মায়ার বয়সী। এটা আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?’

‘তোমাকে এসবের ব্যাখ্যা দেয়ার কোনো দরকার আমার নেই।’

‘কেন? আপনার কি মনে হয় মেয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে আমি বলতে পারব, যা হয়েছে তা ঠিকই হয়েছে?’

‘আর সেজন্য তুমি তাকে মুক্তিদের কাছে পাঠিয়ে দিলে?’

‘আমার নয়, লজ্জিত হওয়া উচিত আপনার।’

‘কিছু জানো না তুমি।’ রেহানার ওপর থেকে তিনি মুখটা ঘুরিয়ে নেন। রেহানা তার চৌকোনা খুতনি দেখতে পান, যা দিয়ে বোঝা যায় ইকবালের বড় ভাই আরও বেশি আত্মপ্রত্যয়ী। ‘যত ফালতু কথা,’ বলেন তিনি। ‘মেয়েটা যুদ্ধের একটা ক্যাজুয়ালটি। কোনো কিছুতে বিশ্বাস করলে তার জন্য কিছু ত্যাগ করতে হয়।’

‘বাচ্চাদের?’

‘বিচ্ছিন্নভাবে এ রকম ঘটনা কিছু ঘটবেই।’

‘আমি ভেবেছিলাম, এমন একটা সম্ভাবনা ছিল, যে, আপনি হয়তো পুরোপুরি ওয়াকিবহাল নন আর্মিরা কী করে বেড়াচ্ছে। এখন তো আমি আপনাকে বলছি। আপনি এসব থেকে হাত গুটিয়ে নিতে পারেন। এটা আপনার বিবেকের ওপর চেপে বসুক তা নিশ্চয়ই আপনি চান না?’

ফয়েজ তর্জনী দিয়ে টাইয়ের বাঁধন আলগা করেন। রেহানার মনে হলো, ফয়েজের মধ্যে বুঝিবা সংশয়ের বলক উঁকি দিচ্ছে।

গাড়ি ধীর হয়ে থেমে গেল। ‘স্যার,’ কাসেম বলল, ‘মিরপুর থানা।’

ফয়েজ কিছু একটা ভাবলেন মনে হলো। রেহানা ব্যাগ হাতে তুলে নিয়ে চুপ করে রইলেন। তারপর ফয়েজ বললেন, ‘যাও।’

‘কোথায়?’

‘পুলিশ স্টেশন ওদিকে।’ তিনি একটা নিচু দালান দেখালেন—মাঠ পার হয়ে যেতে হবে।

‘আপনি আমার সঙ্গে আসছেন না?’

‘আমি নিষ্ঠুর নই রেহানা। এটা মনে রাখবে। এখন তুমি যাও লোকটাকে নিজে বের করে নিয়ে আসো। তোমার সাথে কোনো রকম সংস্রব রাখার ঝুঁকি আমি নিতে পারি না—ইতিমধ্যে যদি রিলিজ অর্ডারটা না পাঠাতাম, তোমাকে আমি এখনই বাড়ি পাঠিয়ে দিতাম।’ কোটের পকেটে হাত ডুবিয়ে তিনি একটা খাম বের করেন। ‘এটা ওদের দেখাবে।’

‘কিন্তু আমি—আপনি চান ওখানে আমি একা যাই?’

‘এর সঙ্গে আমি আর নিজেকে জড়াব না।’ তারপর তিনি মুখ ঘুরিয়ে নেন, রেহানাকে তাঁর ফিকে হয়ে যাওয়া কালো চুল দেখতে হয়।

রেহানা নেমে যাওয়ার প্রস্তুতি নেন। ফয়েজের শেষ জানার সম্ভাব্য পরিণতি হঠাৎ করে তাঁর চিন্তায় আসে। ‘আপনি কি আর কাজকে বলবেন? মায়ার ব্যাপারটা?’

‘ওকে দিয়ে যখন এসব আবর্জনা ছাপিয়েছ, তখনই তোমার উচিত ছিল এ কথা চিন্তা করা।’ কর্কশভাবে জবাব দিলেন তিনি, মুখ তখনো অন্যদিকে ফেরানো।

ফয়েজ রেহানার প্রশ্নের উত্তর দেননি। এখন যেহেতু তিনি জানেন, যা খুশি

করতে পারেন। সোহেল যে আসলে করাচিতে নেই, এটা খুব সহজেই বের করে ফেলতে পারবেন তিনি। একদিন দুপুরবেলা কেবল সোনায় হাজির হলেই তিনি পেয়ে যাবেন মেজরকে—এর চেয়ে বেশি কষ্ট করার তাঁর প্রয়োজন নেই। ‘আপনি ভুলে যাবেন না, ও আপনার ভতিজি। আপনার রক্ত,’ রেহানা বললেন। রেহানা চাইলেন ফয়েজ তাঁর দিকে ঘুরে তাকান, যাতে তাঁর মনের ভাব কিছুটা হলেও বুঝতে পারা যায়। কিন্তু ফয়েজ এর ধার ধারলেন না।

রেহানা হোঁচট খেয়ে গাড়ি থেকে নামতেই তাঁর পেছনে দড়াম করে লেগে গেল গাড়ির দরজা। কাসেম তাঁর দিকে চকিতে তাকিয়ে লজ্জিত হাসি দিল, আর তারপর গাড়িটা চাকায় ধুলো উড়িয়ে সেই দমবন্ধ হাওয়ায় রেহানাকে ফেলে রেখে চলে গেল।

এক হাতে খামটা চেপে ধরে অন্য হাতে রেহানা শাড়ির কুঁচি সোজা করলেন। একবার রিকশা ডেকে বাসায় ফিরে যাওয়ার কথা চিন্তা করলেন তিনি। ধানমণ্ডিতে ফিরে যাওয়ার রাস্তার দিকে তাকালেন, কিন্তু মাথা থেকে সরাতে পারলেন না সোহেলের মিনতিভরা কাতর মুখ। ভেজা মাঠ পার হওয়ার জন্য হাঁটা দিলেন তিনি, কিছুক্ষণ পরপর স্যাভেলের ফিতা ঠিক করতে দাঁড়িয়ে পড়তে থাকলেন।

অনেক ওপরে আকাশ ঘন হয়ে এসেছে, অলসভাবে পাক খাচ্ছে হাওয়া। দুপুরের অঝোর বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে আর এক কি দুই ঘণ্টার মধ্যে। থানার দরজার কাছে এসে রেহানার মনে পড়ল, তিনি কি বলবেন তা নিজের মনে আওড়ে নিতে ভুলে গেছেন। দরজার বাইরে থামলেন তিনি, ধাতব হাতলটা জং ধরা, মলিন হয়ে গেছে মানুষের হাতের ছাপে। তার স্যাভেলজোড়া ভেজা মাঠে চূপসে গেছে। হাতব্যাগ খুলে তিনি দেখে নিলেন, মিসেস চৌধুরীর দেয়া বাউলিটা ঠিক আছে কিনা। দেহের ভর এক পা থেকে আরেক পায়ে বদল করলেন তিনি আর মনের সঁয়াতসঁতে ভাবটা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলেন। রাবার ব্যান্ডে মোড়ানো বাউলি দেখে আশ্বস্ত হলেন। একটা গভীর শ্বাস নিয়ে ভেতরে ঢোকানোর জন্য তৈরি হলেন। দরজার হাতলের দিকে হাত বাড়াতে যাচ্ছেন, এমন সময় দরজাটা ঝাঁকি খেয়ে খুলে গেল। আর্মির পোশাকে লম্বা দাড়িওয়ালা এক লোক দাঁড়িয়ে। রেহানাকে দেখে লোকটা একটু অবাক হলো আর উর্দুতে ‘মাফ করবেন’ বলে একদিকে সরে গিয়ে রেহানাকে যাওয়ার জায়গা করে দিল।

রেহানা অন্ধকার করিডোর পার হয়ে পা রাখলেন জানালাহীন বড় একটা ঘরে। এক কোনায় টেকো এক ব্যক্তি পেছনায় টেবিলের পেছনে বসে আছে, টেবিলের ওপরটা কাচের, সামনে লোহার চেয়ারগুলো সার করে রাখা। টেকো লোকটা মাঝে মধ্যে তার চেয়ারে বসার ভঙ্গি বদল করলে কঁচাকঁচ আওয়াজ যোগ হচ্ছে টেবিলের ওপর ঘুরতে থাকা সিলিং ফ্যানের টানা সাঁইসাঁই শব্দের সঙ্গে। তিনি

কাছে এগিয়ে গেলে লোকটা লোমশ জুজোড়ার নিচ থেকে তাঁর দিকে তাকায়।

‘কারও সাথে আমার কথা বলা দরকার,’ রেহানা বললেন। যতটা চেয়েছিলেন তার চেয়ে কণ্ঠ জোরেই ধ্বনিত হলো তাঁর।

‘এই ফরমটা নিয়ে ওইখানে অপেক্ষা করেন,’ লোকটা উদাসভাবে থুতনি নেড়ে বসার জায়গা নির্দেশ করল।

‘ফরম?’

‘বন্দিদের সঙ্গে দেখা করার ফরম—এই যে ধরেন।’ ভেজা একটা কাগজ সে রেহানার দিকে বাড়িয়ে দেয়।

‘আমি—আমি কারও সঙ্গে দেখা করতে আসিনি।’

লোকটা চকিতে মাথা তোলে। ‘তাহলে কেন?’ পানের পিক তার ঠোঁটে সূর্যোদয়ের কমলা রং মেখে দিয়েছে।

‘আমি এসেছি—একজন বন্দিকে ছাড়িয়ে নিতে।’

‘আপনে এসেছেন’—সে কমলা শ্লেষা মুখে হাসি দিল—‘বন্দিকে ছাড়িয়ে নিতে?’ কমলা থুতুর ক্ষুদ্রাকার ফোঁটা বন্দির সঙ্গে সাক্ষাতের ফরমের ওপর টপাস করে পড়ল। ‘আপনি কে, পুলিশ কমিশানর? আপনি বন্দিদের ছাড়ান না, বন্দিদের ছাড়ান দেই আমরা—বুঝলেন?’

লোকটার গায়ে পুলিশের নীল পোশাক, বগলে আর কলারের কাছটায় বেশ আঁটোসাঁটো। তার চেয়ারের পিঠে, যেখানে সাধারণত সে মাথা রেখে বিশ্রাম নেয়, একটা গোলাপি-সাদা চেকের তোয়ালে ঝুলছে। লোকটা তোয়ালের দিকে ঘুরে মুখ থেকে পানের পিক মুছে নিল।

ফয়েজের দেয়া খামটা বাড়িয়ে ধরলেন রেহানা। ‘আমার কাছে রিলিজ অর্ডার আছে,’ তিনি বললেন।

‘দেখি কী জিনিস।’ টান দিয়ে তাঁর হাত থেকে খামটা নিল সে। ‘সাবির মুস্তাফা,’ পড়ল সে। একটা বিরাটকায় খাতার দিকে ঘুরে মোড়ানো পাতাগুলোয় দ্রুত চোখ বুলিয়ে যেতে শুরু করল। যতটা সাহসে কুলোয়, খাতার ওপর ঝুঁকে পড়লেন রেহানা। খাতাটা থেকে ঘামের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। আঙুল দিয়ে নাম লেখা লিস্টিটা সে নিচ পর্যন্ত দেখে নিল।

‘সে এখানে নাই।’

‘কী? আপনি ঠিক জানেন?’

লোকটা অধৈর্য হয়ে তাঁর দিকে খাতাটা ঘুরিয়ে দিল। ‘আপনে কি এইখানে ওর নাম দেখতেছেন?’ খাতাটা ঠাস করে বন্ধ করে দেয়ার আগে সে বলল।

‘ভাই,’ রেহানা বললেন, ‘আরেকবার দেখেন।’

খাতা বন্ধই থাকল। ‘আমি বললাম সে এখানে নাই। খামাখা সময় নষ্ট করছেন।’ মিসেস চৌধুরীর ঘুষের টাকার বাউলটা রেহানা টান দিয়ে বের করলেন।

ধীরেসুস্থে খুললেন, যাতে লোকটা ভালো করে টাকার তোড়া দেখতে পায়। পঞ্চাশ টাকা বের করলেন তিনি। ‘আবার দেখেন,’ তিনি বললেন সাহস সঞ্চয় করে।

অপূর্ব দক্ষতায় পাঁচ আঙুল দিয়ে সে টাকাটা মুঠিবদ্ধ করে, হাঁ করে থাকা বুকপকেটে ঢুকিয়ে দিল। কিছুক্ষণ সময় নিয়ে বলল, ‘হ্যাঁ। মুস্তফা। মুক্ত...না, চালান দেয়া হয়েছে।’ সে একটা দ্রুত ওপরে তুলল। ‘মুসলিম বাজারে।’

‘মুসলিম বাজার? আরেক থানা?’

পান-খাওয়া দাঁত বের করে হাসল সে। ‘না। ওটা থানা না।’

‘তাহলে কী? আমি কোথায় খুঁজব?’

‘এর চেয়ে বেশি আমি বলতে পারব না।’ মাথা নেড়ে বলল সে। হাতের ইশারায় চলে যেতে বলল রেহানাকে। রেহানা পাত্তা দিলেন না। লোকটা ড্রয়ার খুলে আর একটা ভাঁজ করা রুমাল বের করে আনল। তারপর ভাঁজ খুলল, সেখানে পান পাতা গাদা করে রাখা। একটা পাতা যত্ন করে তুলে নিল লোকটা, তারপর টেবিলের কাচের ওপর রাখল। রেহানা দেখছেন, এরপর সে ছোট গোলাকার টিনের মুখ খুলল। পানপাতার ডাঁটা ছিঁড়ল আর টিনের মধ্যে ডোবাল, তাতে সাদা চুন গোল হয়ে লাগল, সেটা সে পুরো পান পাতায় মাখল আঙুলের ডগা দিয়ে, তাতে কয়েক টুকরো সুপারি আর এক চিমটি জর্দা দিল, শেষে বানানো পান পাতা কয়েক ভাঁজে তিনকোনা করে মুখের মধ্যে চালান করে দিল।

রেহানা তাকে সময় দিলেন ভালো করে পানটা চিবিয়ে তা গোলাকার দলা করে গালের এক পাশে পাঠিয়ে দেয়ার। তারপর ব্যাগের ভেতরে আবার হাত ঢুকিয়ে বললেন, ‘আপনি হয়তো মুসলিম বাজারের কাউকে ফোন করে তাদের জিজ্ঞেস করতে পারেন।’

রেহানার পেছনে দরজা হাট করে খুলে গেল। তিনি ঘুরে দেখলেন, টোকার সময় যে লোকটাকে পাশ কাটিয়ে এসেছেন, সেই লোকটা। ‘এই কুদ্দুস,’ অমার্জিত বাংলায় বলল লোকটা, ‘চা দোও।’

কুদ্দুস কয়েক মিনিটের জন্য গায়েব হয়ে ফিরে এসে চেয়ারের মধ্যে কুঁকড়ে বসলো।

‘বস চীনা চা পছন্দ করেন,’ সে বলল। তাকে কিছুটা অপ্রস্তুত শোনাল। সে তার প্যান্টে হাত মুছল।

আরেকটা পঞ্চাশ রূপি নিয়ে রেহানা তৈরি ছিল। ‘আপনি কি কাউকে বলতে পারেন ওকে এখানে নিয়ে আসতে?’ টাকাটা তিন কাচের ওপর চেপে ধরলেন।

চীনা চা ওদের মধ্যে মৈত্রী গড়েছে। ‘দেখি কী করতে পারি,’ বলে সে কালো ভারি রিসিভার তুলে নম্বর ঘোরাল। ‘হ্যালো? ইনিসপেক্টর কুদ্দুস। মিরপুর থানা। একজন মহিলা আসছে। বলছে তার কাছে রিলিজ অর্ডার আছে। সাবির মুস্তফা। এইখানে ছিল-আপনাদের ওখানে চালান করছে তারে। ধরবো? ঠিক আছে। কে

বলছেন? ও, আচ্ছা, সরি স্যার। স্যার মহিলা বলছে—জি জি অবশ্যই। আমি তাঁকে বলব। জি। খোদা হাফেজ স্যার। জি, স্যার, পাকিস্তান জিন্দাবাদ।’ সে আন্ত করে রেহানার দিকে ঘুরল।

‘ওখানে আপনার নিজে যেতে হবে,’ সে প্রায় সখেদে বলল। ‘তারা কাগজ দেখতে চায়। আমি জানিয়ে দিব। আপনাকে গিয়ে দেখা করতে হবে। রিকশা নিতে পারেন—বলবেন মুসলিম বাজার, পাম্প হাউস। বললেই চিনবে।’

‘অনেক ধন্যবাদ,’ রেহানা বললেন।

‘কোনো ব্যাপার না। আচ্ছা, আল্লাহ ভরসা।’ কুদ্দুস ওর দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল। তারপর মুহূর্তে তার চেহারা পাল্টে গেল। সে রেহানার কাঁধের ওপর দিয়ে ইশারায় ডাকল। ‘সেন? ‘মিস্টার আর মিসেস সেন?’

বয়স্ক এক দম্পতি টেবিলের কাছে এগিয়ে এলেন, তাঁদের মাথা পরস্পরের দিকে কাত করা, মহিলার হাতে একটা টিফিন ক্যারিয়ার। টিফিন ক্যারিয়ারের ভেতর ছলকে উঠছে কোনো তরল পদার্থ, মহিলার ছেলের একটা অনুরোধ তিনি কল্পনায় দেখতে পেলেন, গভীর মমতায় হাত ডুবিয়ে মায়ের আনা ডাল খাচ্ছে।

‘আপনারা এখন ভেতরে যেতে পারেন।’ কুদ্দুস উঠে দাঁড়িয়ে বেল্ট থেকে চাবির একটা গোছা খুলল। ‘আসেন আমার সঙ্গে।’ ওরা একসঙ্গে বেরিয়ে গেল। রেহানা ঘটাং শব্দ শুনল দরজায়, কুদ্দুস ভেতরে ঢুকে দরজা আবার লাগিয়ে দিয়েছে।

বাইরে বৃষ্টি। পুরু চাদরের মতো পানি আকাশ ভেঙে পড়ছে, গাঁ গাঁ শব্দে ছুটছে ঘূর্ণি বাতাস। মাঠ পেরিয়ে বড় রাস্তায় যেতে যেতে পা ফেলার ছলাং ছলাং শব্দও তাঁর সঙ্গ নিলো। রাস্তার ধারে ইতস্তত কয়েকটা চায়ের দোকান। সেগুলোকে ঘিরে রিকশার জটলা। রেহানা আঁচল দিয়ে মাথা ঢাকার প্রাণপণ চেষ্টা করলেন, কোনো লাভ হলো না; চারদিক থেকে হামলে পড়লো বাতাস, হাত থেকে উড়ে গেল আঁচল আর তিনি শাড়ি সামলানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠলেন।

কাছাকাছি ছাপরার একটা সরু চালার নিচে মাথা হেঁট করে ঢুকলেন তিনি, দেখলেন, উঁচু মেঝেতে একদল লোক পা আড়াআড়ি করে বসে আছে, কেরোসিন কুপির নিভু নিভু আলো তাদের মুখে লাল আভা ছড়াচ্ছে।

‘মুসলিম বাজার? কেউ যাবেন?’ ছাপরায় বিস্কুট আর পেট্রোলের গন্ধ মিলেমিশে একাকার।

নিজেদের মধ্যে কিছু নিয়ে বলাবলি করছে ওরা। টিনের চালায় বৃষ্টির বিরামহীন ঝমঝম শব্দে রেহানা কিছু শুনতে পেলেন না। ওদের মধ্যে একজন, সবচেয়ে কম বয়সী, সে পা সোজা করে উঠে দাঁড়াল। ‘বকুল আপনারে নিয়া যাবে,’ পেছন থেকে একটা লোক তার হাতের জ্বলন্ত বিড়ি দিয়ে ইশারায় ছেলেটাকে দেখিয়ে বলল। বকুল লুঙ্গি মালকোঁচা করে বেঁধে নিল। মনে হলো

‘এইখানে দাঁড়ান,’ ছাপরা থেকে দৌড়ে বের হয়ে যাওয়ার সময় বলল ছেলেটা। রেহানা দেখতে পেলেন রিকশার হুডের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে ছেলেটা; হুডটা একবার মজবুত করে লাগানোর পর সে সিটের নিচ থেকে প্লাস্টিকের পর্দা বের করল। ‘আসেন আপা! জলদি করেন!’

একটা চারকোনা পাকা দালানের সামনে এসে বকুল রিকশা থামাল। ছাদটা করোগেটেড টিনের, উঁচু আর ত্রিকোণ। টিনের ওপর বিবর্ণ হয়ে যাওয়া লাল রঙে লেখা ইন্ডিয়া জিমেনেসিয়াম। রিকশা থেকে নেমে ভেতরে যাওয়ার সময় রেহানা বকুলকে কুড়ি টাকা দিলেন। ‘তোমার জন্য আরও কুড়ি টাকা আছে, ফিরে এসে দেব। তুমি এখানে আমার জন্য অপেক্ষা কোরো,’ বৃষ্টির গর্জন ছাপিয়ে তিনি চেষ্টা করে বললেন। ‘আমার যত দেরিই হোক, তুমি এখানে থেকো। এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা—যা-ই হোক, বুঝেছ?’

নিরন্তর অপেক্ষার তৃতীয় প্রহরে খাবারের চিন্তা মাথায় এলো রেহানার। কটা বাজল কোনো ধারণাই নেই তাঁর। পেটের ভেতর ক্ষুধা জানান দিলে নিশ্চয়ই দুপুরের খাওয়ার সময় পেরিয়ে গেছে। ব্যাগের মধ্যে এক প্যাকেট বিস্কুট না রাখার জন্য তিনি নিজের ওপর বিরক্ত হলেন। সবার সামনে মুঠা খাওয়ার কোনো ইচ্ছা তাঁর নেই। বৃষ্টির জন্য সময় ঠাহর করা কঠিন; দীপ্তে নিচে নেমে আসা ধূসর মেঘের দল সূর্যের নামনিশানা মুছে ফেলেছে। ঝুপঝুপ ওপর শিক টানা সরু ঘুলঘুলি দিয়ে রেহানা দেখলেন, বৃষ্টি তখনো অস্বীকার করে পড়ছে। এর মধ্যে তাঁর শাড়ি শুকিয়ে গেছে, চোখ জ্বালা করছে আর শরীরের গাঁটে গাঁটে একটা ভোঁতা যন্ত্রণা হচ্ছে। তিনি হাঁট ভাঁজ করে বসলেন, ভাবলেন চোখ বুজবেন,

কেবল মুহূর্তের জন্য, জ্বালা করা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত ।

অবশেষে প্রহরী যখন সাবিরকে নিয়ে এলো, রেহানার মনে হলো তিনি বুঝি স্বপ্ন দেখছেন । হাত-পায়ের ব্যথা অগ্রাহ্য করে ঝাঁকি দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তিনি । থানার ঘটনা যেন অনেক দিন আগে ঘটেছে, এক ক্ষীণ স্মৃতি । কতক্ষণ ঘুমিয়েছেন তিনি জানেন না । বৃষ্টি থেমেছে । টিউবলাইট একটানা ঝাঁঝি শব্দ করে যাচ্ছে; সন্ধ্যা নামার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে ।

কালো কিছু একটা দিয়ে ওর মাথা ঢাকা । একটা মুখোশ—না, একটা আচ্ছাদন । ওর মুখের ওপর আঁটো করে টান দিয়ে বাঁধা । ওর নাক, ওর চৌকোনা থুতনি তিনি দেখতে পেলেন । মাথাটা ও সামনে-পেছনে দোলাচ্ছিল, আচ্ছাদনের সেলাইয়ের ফাঁক দিয়ে শব্দ করে শ্বাস নিচ্ছিল ।

ওর পায়ে জুতো নেই । পায়ের পাতা নোংরা মেঝেতে পিছল ছাপ রেখে আসছে । সাবিরকে যে লোকটা নিয়ে এসেছে, রেহানা তার দিকে ঘুরলেন । কালো চকচকে দাড়ি দেখতে পেলেন তিনি । পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঘুরিয়ে দেখলেন তিনি । লোকটা খুব লম্বা । এই লোককে কি তিনি আগে কোথাও দেখেছেন? তিনি আবার দেখলেন । *কারও মুখের দিকে তাকাবেন না ।* লোকটা মৃদু হাসি দিল । ঘাবড়াবেন না । কাঁপুনি থামানোর জন্য নিজেই নিজের হাত ধরলেন রেহানা ।

‘ওকে এখন নিয়ে যেতে পারেন,’ লোকটা বলল । ‘এখানে সই করেন ।’ সে তাঁর দিকে ফরম আর কলম বাড়িয়ে দিল ।

রেহানা ফরমটা পড়লেন না । ‘দয়া করে ওর মুখের ওপর থেকে কাপড়টা খুলে দিন,’ ফরমের ওপর এলোমেলো হাতে লিখে বললেন তিনি । ‘আর ওর বাঁধন আলগা করে দিন ।’

‘অবশ্যই,’ লোকটা ভদ্রভাবে বলল । সে সাবিরের কবজির বাঁধন খুলল । সাবিরের শার্টের হাতা লোকটার হাতের ওপর লটপট করছিল । লোকটা ওর মুখের কাপড় খুব আয়োজন করে খুলল ।

রেহানা সাবিরের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, আসলেই ও সাবির কিনা তা বোঝার জন্য । হ্যাঁ, সেই । ওর গলার ফুলে থাকা কণ্ঠা তিনি চিনতে পারলেন, ওর স্থূল ঘাড়, যার জন্য ওকে ঘাড়-গর্দানে মনে হয় । ওর চোঁটগুলো ফোসকায় ভরে গেছে, মুখের চারপাশে চামড়া সাদা হয়ে পড়েছে, প্রবাসের আংটার মতো ।

‘এই মহিলা তোমার রিলিজ অর্ডার নিয়ে এসেছেন,’ লোকটা বলল । ‘তুমি যেতে পারো ।’

সাবির শূন্য দৃষ্টিতে রেহানার দিকে তাকাল । ‘আমি রেহানা...মিসেস হক ।’

গাছের পাতা সাফ-সুতরো করে আর বাতাসে সোঁদা গন্ধ ছড়িয়ে বৃষ্টি বিদায় নিয়েছে । রেহানা ও সাবির কেউ কারও সঙ্গে কোনো কথা বিনিময় করল না ।

রেহানা শুধু ওর নিশ্বাসের ওঠানামা শুনতে পেলেন। ওপরে মেঘমুক্ত আকাশ, তারারা বিকমিক করে জ্বলতে শুরু করেছে, আর সেইসব নক্ষত্রের নিচে অথৈ জলে মন্থন করছে এই ব-দ্বীপ অঞ্চল।

‘বকুল!’ রেহানা ডেকে উঠলেন। ‘বকুল!’ সুনসান রাস্তাটা ঝকঝক করছে। রিকশা আর ছেলেটার কোনো হৃদিস নেই। বড় রাস্তা যে কোন দিকে তিনি মনে করতে পারলেন না। আশপাশে কোনো দোকানও নেই, শুধু টানা শূন্য রাস্তা—মাঝে মাঝে টেলিফোনের খামে তার ঝুলছে।

‘সাবির বেটা, তুমি কি একটু হাঁটতে পারবে?’

সাবির পথের কুকুরের মতো রাস্তার ধারে উবু হয়ে বসে পড়েছে, ওর দুই হাত দু’পাশে আলগাভাবে ঝুলছে।

‘আমাদের হাঁটতে হবে,’ তিনি একটু জোরে বলেন।

ওর মাথা দুই হাঁটুর মধ্যে গাঁজা।

‘সাবির?’

রেহানা ওর নত মাথা থেকে ভেসে আসা সাইরেনের মতো তীব্র চাপা স্বর শুনতে পেলেন। ‘সাবির?’ তিনি আবার ডাকলেন। কোনো জবাব নেই। তিনি ওর কাঁধ ধরে টান দিলেন। বিলাপ বাড়তে লাগল; তীক্ষ্ণ অপার্থিব রোদন ধ্বনি; এমন একটা কান্না যার কোনো উৎসমুখ নেই।

তিনি কী করবেন বুঝে পেলেন না। খুব ছোট ও নগণ্য দেখাচ্ছে সাবিরকে, গুটিয়ে-গুটিয়ে আছে এমনভাবে যেন মাটি ওকে গিলে খাবে। আর ও মাটির গভীরে তলিয়ে গেলে কেউ পরোয়া করবে না, কারণ ও বিলাপরত থরথর কম্পমান একটা নগণ্য কণা ছাড়া আর কিছু নয়। ওকে ওখানে ফেলে রেখে দৌড়ে পালানোর মরিয়া ইচ্ছা হঠাৎ করেই রেহানার মাথায় চাড়া দিয়ে উঠল।

দূরে কোথাও সন্ধ্যার কারফিউ শুরুর তীক্ষ্ণ শব্দ তিনি শুনতে পেলেন।

‘আমাদের এখনই যেতে হবে সাবির, একটু চেষ্টা করো বেটা,’ তিনি বললেন। ও নড়ল না। তিনি ওর কলার ঘিরে জমা ময়লা দেখতে পেলেন, ওর স্ট্রাড ধূসর আর ক্লিষ্ট। হয়তো ও ঘুমিয়ে পড়েছে।

‘ঠিক আছে। তুমি এখানে থাকো,’ নিরুপায় হয়ে বললেন তিনি। ‘আমি কিছু একটা জোগাড় করব।’ ওর সঙ্গে কথা চালিয়ে গেলে যেন ওর উত্তর দেবে এমনভাবে বললেন তিনি। তাতে নিঃসঙ্গ ভাব কিছুটা কমল। ‘এখানে থেকে। নড়ো না কিছু। শুনতে পাচ্ছে। নড়ো না। আমি ফিরে আসব।’ রেহানা উঠে দাঁড়ালেন আর এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যেতে শুরু করলেন, সাবির এক চুলও নড়ল না।

রেহানা হাতব্যাগটা আঁকড়ে ধরে জিমনেসিয়ামের সামনে থেকে হাঁটতে লাগলেন, মিসেস চৌধুরীর দেয়া টাকার বান্ডিলটা একবার স্পর্শ করে নিলেন। প্রথম যাকে দেখে তার দিকেই সব টাকা ছুঁড়ে দিয়ে পা ধরে বলব বাসায় নিয়ে

যেতে। অথবা অন্য কোথাও, এখান থেকে দূরে অন্য যে কোনোখানে।

বড় রাস্তার মোড় পেরিয়ে তিনি হাঁটতে লাগলেন যতক্ষণ পর্যন্ত না জিমনেসিয়াম চোখের আড়াল হয়ে যায়। অন্ধকার নেমে আসছে; খুব শিগগির রাস্তার আলো অথবা চাঁদের কিরণ ছাড়া এক হাত সামনে দেখাও অসম্ভব হয়ে পড়বে। আমার এখন ফিরে যাওয়া উচিত, তিনি ভাবলেন। সাবিরের সঙ্গে থাকি, অন্তত ও আমার সঙ্গে থাকবে। তিনি প্রায় ফিরেই যাচ্ছিলেন, হঠাৎ একটা কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খেলেন।

‘কে ওখানে?’ আঁধারের প্রতি চেষ্টা করে উঠলেন তিনি। সামনে হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দেখলেন, রিকশার কাঠামো বুকের খাঁচার মতো বেরিয়ে আছে।

‘আপা আমি,’ কেউ একজন ফিসফিস করে বলল। আর কেউ না, বকুল।

‘বকুল!’ হাজার শুকুর। রেহানা খুশিতে চিৎকার করতে চাইলেন, কিন্তু তার বদলে ধমকে উঠলেন, ‘আল্লাহর ওয়াস্তে কোথায় ছিলে তুমি? আমি তোমাকে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে বললাম না! এক মাইল হাঁটলাম আমি।’

‘ওরা ওইখানে রিকশা রাখতে দিতেছিল না। লাঠি নিয়া একটা লোক দালান থিকা বাইর হইল।’ এখন তিনি বকুলের মুখটা অল্প দেখতে পাচ্ছেন। ‘এইখানে আইসা বইসা আছি।’

রেহানা রিকশার সিটে উঠে বললেন, ‘আমাদের ফিরে যেতে হবে।’

সাবিরকে যেখানে রেখে গিয়েছিলেন, সেখানে সে নেই।

‘কারফিউ শুরু হতে আর আধা ঘণ্টা বাকি আপা,’ বকুল বলল। সাবিরের খোঁজে রেহানা জায়গাটা চষে ফেললেন। অন্ধকারে কিছু দেখা গেল না। ‘সাবির!’ তিনি ডেকে উঠলেন, ‘সাবির!’ তখন জিমনেসিয়ামের দিক থেকে খটখট শব্দ শুনতে পেলেন তিনি। কারো হাত দরজার ওপর সজোরে কিল মারছে।

রেহানা এক দৌড়ে জিমনেসিয়ামের কাছে গেলেন; এই অন্ধকারে কোনোরকমে চেনা যায় সাবিরকে। চেষ্টা করলেন ওর হাত ধরতে। ‘সাবির, আস্তে! আমি রিকশা এনেছি। আমরা বাসায় যাচ্ছি।’

ওর এক হাত শক্ত করে ধরে রিকশার দিকে টেনে নিয়ে গেলেন তিনি। অতর্কিতে ও চিৎকার করে উঠল। ‘না, প্লিজ!’ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ও।

রেহানা আঁকড়ে ধরে রইলেন, চেষ্টা করলেন ওকে ভয়সী জোগাতে, ওর নরম আঙুলে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিলেন। ‘চলো বেটী, চলো যাই। আমি তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাব।’ কিন্তু সাবির চিৎকার করতে থাকল আর রেহানার হাত থেকে মুচড়ে ওর হাত ছাড়িয়ে নিতে চাইল। টানাটানিতে ওর শার্টের হাতা খুলে পড়ল, আর রেহানা দেখতে পেলেন যে হাত তিনি ধরে আছেন, তার ডগাগুলো কালচে। কেউ ওর আঙুলে কালো রং করেছে। সাবির পশুর মতো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল আর বলল, ‘না, প্লিজ, আমি কিছু করি নাই!’ ওর গলা কর্কশ আর শ্লেষামেশানো।

আর না পেরে রেহানা ওকে ছেড়ে দিলেন, সে হাঁটুতে মুখ ঢেকে কান্নার গমক শুরু করল। 'না, না, না,' ও ফিসফিস করল, বুকের ওপর হাত দুটো জড়ো করে বলল, 'প্লিজ'। রেহানা ঝুঁকে কাছ থেকে দেখলেন। নখগুলো নরম আর দগদগে। আরও কাছে ঝুঁকলেন। নখ নেই, শুধু দগদগে লালমুখো থ্যাৎলানো আঙুল।

'হায় আল্লাহ,' রেহানা অস্ফুটে বললেন। এখন ওকে ধরতে তাঁর ভয় লাগছে, ওর পোশাকের আড়ালে আর কী আছে জানতে ভয় করছে।

'আপা, আমি উনাকে পাঁজাকোলা কইরা রিকশায় নিতে পারব।' বকুল এসে ওর পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল। সে সাবিরের সামনে উবু হয়ে বসল আর ওর মাথা কোলে নিল। তার আরেক হাত সাবিরের হাঁটুর নিচ দিয়ে ঢুকিয়ে দিল, তারপর একটা শব্দ করে উঠে দাঁড়াল। গায়ে বল আছে তার, দেখে বোঝা যায় না। সাবিরের মাথা পেছনে ঝুলে পড়ল। বকুল ভারি পায়ে রিকশার কাছে এগিয়ে এলো। 'আপনে সোজা কইরা ধরতে পারবেন?'

রেহানা অন্য পাশ দিয়ে রিকশায় উঠলেন আর সাবিরের কলার ধরে টান দিলেন। 'উঠে বসো, প্লিজ বেটা, উঠে বসতে চেষ্টা করো।' তিনি টের পেলেন তার চোখ থেকে টপটপ পানি ঝরছে। সাবিরের শরীর একটু খাড়া হলো, আর দুই হাতে ওর কাঁধ জড়িয়ে ধরে কোনোমতে তিনি তাকে সোজা রাখতে পারলেন।

'চলো, তাড়াতাড়ি,' বকুলকে বললেন তিনি।

'কোথায় থাকেন, আপা?'

'ধানমণ্ডি পাঁচ নম্বর।'।

শুধু একটা কথাই তিনি ভাবতে পারছেন, ওঁর আমার দেখা হতেই হবে, মাত্র একবার, কেবল একটুক্কণের জন্য তাকাব। এই কালো আচ্ছাদন উধাও হয়ে যাবে, সাবির মরবে না, সাবির একটা লাল-নখ পাখি, হায় আল্লাহ, শুধু একবারের জন্য, এমনকি ও যদি কোনো কথা উচ্চারণ না করে, একটা শব্দও না, ওকে আমার কিছু বলতে হবে না, ও এমনতেই জানবে, আমি গেটের ভেতরে পা দেয়ার আগেই ও জানবে, আমি ওকে বলার জন্য মুখ খোলার আগেই ও জানবে। আমি কালো কাপড়ের কথা ওকে বলব না, আমি কিছুতেই বলব না, আমি আশা করব না যে ও এখনো ওখানে আছে। আমি কল্পনা করব ও এরই মধ্যে চলে গেছে; আমি বাসায় ফিরে আর জায়নামাজ খুলে বসব। আমি খোদাকে বলব যা করার করতে। তিনি করছেন। এরপর আমি আর কিছু তাঁর কাছে চাইব না। লোকটাকে শুধু সরিয়ে দাও। লোকটাকে সরিয়ে দাও।

সাবির একটা পাখি, একটা লালমুখো পাখি।

ও ওখানে নেই। সোনা ফাঁকা, শূন্য। তার বোন মার্জিয়ার যখন ম্যালেরিয়া হয়েছিল, রেহানার মা ওর শিয়রে বসে বললেন, দোহাই আল্লাহ, অসুখটা ওর ওপর থেকে তুলে নিয়ে আমাকে দিয়ে যাও। আমার মেয়েকে না। আমাকে দাও।

ঠিক ও-রকমভাবে নিজেকে দেখে রাখার জন্য রেহানার এখন কাউকে চাই। আমার থেকে নাও। ছেলেটার ফোসকা পড়া ঠোট নাও। ওর দুধসাদা, মৃত চোখজোড়া নাও। ওর ক্লান্ত প্রশ্বাস নাও। দোহাই খোদা, ওর রক্তাক্ত হাত দুটো নাও। ওর রক্তিম ডানাগুলো নাও। আমি ওসব চাই না। আমি চাই না। আমার স্বস্তি নাও। আমার এই স্বস্তি নাও যে, ও সোহেল ছিল না। আমার চাওয়া নাও, আমার আকাঙ্ক্ষা নাও। ও যখন ওখানে নেই, ওর ফেলে যাওয়া স্মৃতি নাও।

তিনি বিছানায় নিজেকে এলিয়ে দিলেন, ওর ঘ্রাণে ডুবে গিয়ে।

খোদা, তিনি বললেন, চোখের অশ্রু বাধাহীন, অবাধ—আমার বাসনা নিয়ে যাও। ঘরটা দুলে উঠল। সুপ্রিয়ার মা-বাবা দেয়াল থেকে চোখ নামিয়ে তাঁর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে আছেন। তিনি চোখ বুজলেন, আর স্বপ্নে দেখলেন একটা লোক খসখসে পুরুষ হাতে তার ঘাড় মালিশ করে দিচ্ছে। মানুষটার হাত তাঁর গলায় উঠে গেল, পেশি-শিরা চেপে ধরল, চেপে ধরল যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁর দম প্রায় আটকে যায়; আর তারপর আবার সেই হাত তার কাঁধে নেমে এলো, আর তাঁর হাতের ওপর দিয়ে গুটিগুটি এগিয়ে গেল নিচের দিকে, তাঁর কনুই আর কোমরের মাঝের শূন্যতায় পিছল খেল।

‘রেহানা’, নিজের নাম শুনে তিনি হতচকিত হলেন। নিজের নাম কী যে অচেনা শোনাল! ‘তুমি স্বপ্ন দেখছিলে!’

‘না—সব ছিল—সাবির...’

‘আমি জানি।’ আমি জানতাম তুমি জানবে!

মেজরের নিশ্বাস তাঁর চুলে। তিনি তাঁর পিঠে ওর পেটের উষ্ণতা টের পেলেন। তিনি ওর হাত দেখতে পেলেন, টানটান শিরা, কোমর জড়িয়ে ঐক্যবাক্যে যাচ্ছে আর তাঁকে চেপে ধরে রেখেছে, যেন ওর হাতের টান ছাড়া তিনি ভেসে যেতে পারেন।

রবার-পোড়া গন্ধ তাঁর নাকে-মুখে হুঁশ হুঁশ করে ঢুকে গেল।

ভেজা চোখ দুটো রেহানা বালিশে গুঁজে দিলেন। মুখ খুললেন আর কান্না চাপা দেয়ার চেষ্টা করলেন। ও সব জানে, তাঁর মনে হলো। এটাই ওর ক্ষমতা। কম বলা আর বেশি জানা।

হাত দুটি আরো শক্তভাবে তাঁকে ধরল, রেহানা পিছু হটতে পড়লেন, তাঁর বুকের ভার নিজের ওপর অনুভব করতে পারছেন। শ্বাস ও প্রশ্বাস, নিশ্বাসের উষ্ণতা তাঁর কানে দাহ বয়ে আনলো।

বালিশের ওপর তার হাতের মুঠি শক্ত হলো।

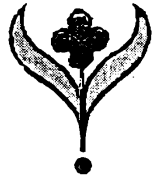
‘ঘুমাও,’ মেজর বললেন, ‘এখন তুমি ঘুমিয়ে পড়ো।’

তাঁর চোখ অলৌকিকভাবে বন্ধ হলো, আর তিনি টের পেলেন তাঁর পুরো শরীর ছেড়ে দিচ্ছে—নিশ্বাস তখনো দ্রুত গতি হলেও স্বপ্নহীন গভীর ঘুমে তিনি তলিয়ে গেলেন।

আগস্ট
সেপ্টেম্বর
অক্টোবর



সল্ট লেক



বাংলার মাথার ওপরের আকাশ অব্যবহিত। বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে নেই কোনো পাহাড়শৃঙ্গ, কোনো উপত্যকা, কোনো গিরি; আদিগন্ত প্রান্তরজুড়ে ছেদ পড়েনি কোথাও। এটা একান্তই সমতল, যেন কোনো হাওর বা নদী পথ পায়নি কোথাও যাওয়ার। দিগন্তের পরিমাপ নেয়ার মতো কোনো বিন্দুর দেখা পেতে চোখ কেঁদে মরে, দূরত্বের কোনো ছাপ, কিন্তু পায় না কিছুই। মাঝে মধ্যে মেঘের দল; কখনো বৃষ্টি, কিন্তু এসবই কেবল রঙের খেলা : সাদা ধবধবে মেঘপুঞ্জ, বর্ষার কালো মেঘের ঘনঘটা।

শহর ছাড়িয়ে আর কোথাও কোনো সুন্দর দালানকোঠা নেই, যা উদ্ভাসে গলে যেতে পারে বা কয়েক জনমের বর্ষণে ধসে পড়তে পারে। প্রত্যাশিত ভূমি শহরে নেই...তাদের আকাশছোঁয়া জাঁকজমকে নেই, তাদের ধ্বংস হওয়ার বেদনায় নেই...আছে অব্যবহিত মাঠে, এই গগনললাটে, এই সটান দিগন্তে। প্রতিবছর এই অবাধ উন্মুক্ত প্রান্তর যেন সমুদ্র হয়ে যায়, যখন জলের কুহকে তলিয়ে যায় ভূমি, আর তারপর আবার জেগে ওঠে, যেন কোনো জাদুর কাঠির ছোঁয়ায়, আর এভাবেই চলতে থাকে আবর্তন, পুনরাবৃত্তির খেলা, এই ভূমির দীর্ঘ বন্যাকবলিত ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে।

এই প্রান্তর চিরে সূর্যের পিছু ধাওয়া করে আগরতলা থেকে কলকাতাগামী রেহানার ট্রেন ঝঙ্কার তুলে পশ্চিমমুখী হলো। রেহানা একটা ফাঁকা কামরা

পেলেন, খোলা জানালায় তাঁর চুল চোখে-মুখে আছড়ে পড়ল যতোক্ষণ না তা মুখের চারপাশে জট পাকিয়ে মুখিয়ে রইল। গাছের দীর্ঘ ছায়া তাঁর ওপর তির্যক হয়ে পড়ল, পিয়ানোর রিডের মতো সামনে-পেছনে।

রেহানাকে ঢাকা ছাড়তেই হলো। আর নিরাপদ নয়। মায়া সম্পর্কে ফয়েজ জানত। জয় আর মেজর ভাবল, তাঁর গতিবিধি হয়তো কেউ লক্ষ্য করছে। বাড়িটার ওপরও হয়তো নজর রেখেছে। উপায় নেই। এমনভাবে যাবেন যাতে মনে হয় আপনি অনেক দিনের জন্য চলে যাচ্ছেন। তাই তিনি দুটো বাড়ি তালাবদ্ধ করলেন আর আসবাবগুলো চাদরে ঢেকে দিলেন... বাবাকেও তিনি তা-ই করতে দেখেছেন, অনেক দিন আগে, যখন তাঁরা ওয়েলিংটন স্কয়ার হারাল। তিনি ভাবলেন, তাঁকে কি রিফিউজি বলা যায়,...এই ট্রেন, এই দূরত্ব, সব ফেলে চলে আসা, আসবাবের ওপর চাদর পাতা।

তাঁকে ঘুরপথে আসতে হয়েছে, প্রথমে পূর্ব দিকে যাত্রা করে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে ঢুকলেন, তারপর ট্রেন ধরে কলকাতা। এটা উত্তরমুখী ট্রেন, বাংলার অবশিষ্ট অংশ পার হচ্ছে...সরষক্ষেত, ধানক্ষেত, মরিচক্ষেত; তারপর ভূমি বেঁকে গিয়ে টোল খেল যখন তারা পশ্চিমমুখী হয়ে আসামে ঢুকলেন। সকালে রেহানা জেগে উঠে দেখলেন দিনের প্রথম আলোয় স্নাত চেউ খেলানো নিসর্গ। নির্মল বাতাস বয়ে আনছে আপেলের গন্ধ। পাহাড়ের বাতাস।

মেমসাহেবদের নিয়ে শীতকালীন অবসর কেন্দ্রে যাওয়ার পথ হিসেবে এই অর্ধ-বৃত্তাকার ব্রিটিশরা পেতেছিল, এখন একে মুরগির ঘাড় বলে। মেমসাহেবরা ছুটি কাটাতে যেতেন শিলচর, শিলিগুড়ি, শিলং...এই হিল স্টেশনগুলোর নাম পাতার মর্মর ধ্বনির মতো, যেখানে আর্দ্রতায় সিঁক্ত হয়ে কাপড় নির্জীবভাবে বুলে থাকে না, যেখানে বাতাস গুরু, ঠোঁট ক্রিমলিগু, টুপি পরিধেয়। দেশ থেকে দূরে দেশোয়ালি ভাব।

এখানকার আলো অন্য রকম। ভেজা বাতাস একে মলিন করে না, সরাসরি আকাশ থেকে ছড়িয়ে পড়ে ঝকঝকে চোখধাঁধানো আভা নিয়ে, আলোকিত করে নিচের টিলা, সবকিছু আচ্ছাদিত করা সবুজের ওপর নেমে আসে আর নামে চিকচিকে শিশিরের ওপর।

রেহানা কথাগুলো আওড়ে গেলেন। আমি তোমার জায়গা ফিরে আসব।

তিনি উদ্বাস্তু নন। বাংলা তার জন্য অপেক্ষা করছে, এর সদর দরজায় লোহার তালা। ঘরের বাতিতে কেরোসিন ভরা। পানির ট্যাংক তৃষিত, জানালা বন্ধ। পর্দাগুলো ফেলা, বিছানা টান টান করে পাক্সি। তার প্রতিবেশী আছে। আছে নোংরা প্লেট। ফ্রিজে খাসির একটা পা।

রেহানা সাবিরকে মিসেস চৌধুরীর বাসায় নিয়ে গেলেন। তিনি দেখলেন, সিলভি বের হয়ে গেটের কাছে এলো আর স্বামীর দিকে তাকাল, তার মুখ জুড়ে

ছিল বাছুরের মতো ধূসর চোখ, আর মুখের কিনারে সরু রেখা ফুটে উঠেছিল।

বিদায় না জানিয়েই তিনি ফিরে এলেন।

তাঁর দায়িত্ব তিনি করেছেন। মুসলিম বাজার থেকে আসলে ঠিক কী জিনিস তিনি ফিরিয়ে এনেছেন ওদের সেটা বুঝে-ওঠার অপেক্ষায় তিনি রইলেন না।

রেহানা পা তুলে সামনের আসনের ওপর রেখে চিঠির বাড়িল খুললেন। চিঠির গায়ে ন্যাপথলিনের গন্ধ। তাঁর মনে হলো, সিলভি এসব চিঠি কোথায় রেখেছিল, হয়তো ভাঁজ করে রাখা কাপড়ের মধ্যে, জুড়ি-মেলানো সালায়ার-কামিজের ভেতরে, অথবা ওর গয়নার বাক্সে বা পুরোনো পাঠ্যবইয়ের ভেতরে। একেবারে চূড়ান্ত মুহূর্তে, যখন তাঁকে সিদ্ধান্ত নিতে হলো কী কী নেবেন আর কী কী নিতে পারবেন না, রেহানা কিছুতেই চিঠিগুলো ফেলে আসতে পারলেন না। এরা তার স্মৃতিকাতরতার একমাত্র দায়। তার বাকি বাঁধাছাঁদা একান্ত গতানুগতিক; তিনটা করে শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট, একটা রাতের কাপড়, প্লাস্টিকের চিরুনি, পাতলা তোয়ালে, কাঁথা আর একটা প্লেট। জয় ওকে একটা প্লেট নিতে বলেছে।

সব গোছানোর পর মেজর রেহানাকে জানালেন যে তিনি তাঁর সঙ্গে যাচ্ছেন না। আগরতলা তিনি আলাদাভাবে যাবেন। ‘সেভাবে যাওয়াটাই আপনার জন্য নিরাপদ। মায়া আপনার সঙ্গে কলকাতায় দেখা করবে। সবকিছু ঠিক করা আছে।’ ওর চোখের পাতায় সামান্য কম্পন রেহানা দেখলেন; অন্তরের ভাব চেপে রাখা; রাখতে পারা।

রেহানা ক্যাপ খুলে ফ্লাস্কের চায়ে চুমুক দিলেন। অসুস্থ হয়ে পড়ার অবস্থা তাঁর। হাত-পা কেমন অস্থির, শিথিল। জ্বরতপ্ত গাল। বুকে পুড়ে-যাওয়া নোনা ভাব। অস্বস্তিকর ঘাম। ভালোবাসা।

গালিবের একটা পঙক্তি মনে পড়ে গেল। *জিন্দেগি ইউ ভি গুজারই যাতি।* জীবন এমনি করে কেটেই যেত; কোনোভাবে পার হয়ে যেত, আলোড়নহীন, গতানুগতিক, এই জ্বরতপ্ত অনুভূতি ছাড়া, যা তার ভেতরে উথলে উঠছে ভাসিয়ে নিতে চাইছে আমূল।

ট্রেন যখন দক্ষিণে কলকাতামুখী হলো, বর্ষার প্রান্তর অস্থির ফিরে এলো। রেহানা তাকিয়ে রইলেন জলমগ্ন নিসর্গের দিকে। চারুকোনা ধানি জমিতে মাঠ ভাগ হয়ে আছে, পায়ের পাতার সমান কাদামাটির অমিল দিয়ে ঘেরা। একেক জমিতে ধান বেড়ে ওঠার একেক পর্যায়; কোথাও বীজধানের ছোট্ট লেবু-সবুজ চারা, আরেকটু বাড়লে তুলে নিয়ে অন্য কোথাও বপন করা হবে; বেড়ে-ওঠা চারা, ঘন তবে অল্প গাঢ়; আর কোথাও দুধেল আভার ধানগাছ, শস্য ঘরে ওঠার জন্য প্রস্তুত। জমিগুলো ছোট ছোট দ্বীপ যেন, প্রতিটাই নিজেদের বেষ্টনীতে জলে প্লাবিত; আর সব মিলে একসঙ্গে সবুজ ও সোনালি দাবার ছক।

আবহাওয়া বদলে গেল, আর হঠাৎ করেই আকাশ ধূসর হয়ে উঠলো। রেহানার খোলা জানালা দিয়ে তির্যক বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। তিনি উঠে দাঁড়ালেন আর জানালার কপাট ধরে টানাটানি করলেন, ঘটাং করে শেষতক কপাট নিচে নেমে আসে। এরপর একটানা শুধু ট্রেনের ঝিকঝিক শব্দ, রেললাইনে গাড়ির চাকার অবিরাম ঘর্ষণ। জানালায় বৃষ্টির ঘন ফোঁটা আঙুলের টোকার মতো বাজতে থাকে, আর সবকিছুই নীলচে কালায় একাকার; আসনের কাঠ, বাইরে নিচু হয়ে ঝুলে থাকা মেঘের দল, আর জানালার কপাট, যা ট্রেনের চলার সঙ্গে তাল মিলিয়ে খটখট করেই চলেছে।

ট্রেন শিয়ালদহ স্টেশনে ঢুকে সশব্দ গর্জনে থেমে গেল। দরজা খুলতেই রেহানা ব্যাগ নিয়ে নামলেন। মনে হলো কেউ যেন ওকে চলমান জনসমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলেছে। চারপাশে মানুষ গিজগিজ করছে, যেন ঘন কুয়াশার মধ্যে একসঙ্গে সবার দম আটকানো অবস্থা। ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে নিজের পথ করে প্লাটফর্মের শেষ মাথা পর্যন্ত গেলেন। পায়ের পাতায় দাঁড়িয়ে মানুষের মুখের ওপর দিয়ে দেখার চেষ্টা করলেন। মায়া তাঁকে কীভাবে খুঁজে পাবে? একটা বেঞ্চের সামনে তিনি ইঞ্চিখানেক জায়গা পেলেন, সেখানে ব্যাগটা রেখে তার ওপর বসে পড়লেন। কয়েক মিনিট পরই তিনি যাত্রীদের বিভিন্ন ধরন আলাদা করে চিনতে শুরু করলেন। একদল আছেন মাত্র-পৌঁছেছেন গোছের, তার মতো একই রকম আলুথালু কাপড় আর দিশেহারা ভাব নিয়ে বসে আছেন; আর আছে কিছুক্ষণ-হলো-পৌঁছেছেন গোছের, এখনো স্টেশনের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, অপেক্ষা করছেন কিছু একটা ঘটার, হয়তো কেউ নিতে আসবেন ওদের, অথবা কলকাতা পর্যন্ত এসে যখন পৌঁছেছেন তাহলে ওদের এখন কী করা উচিত এসব বলবে; আর যারা কয়েক সপ্তাহ, কয়েক মাস হলো এসে পৌঁছেছেন, যারা উপলব্ধি করেছেন এই স্টেশনের বাইরে তাদের যাওয়ার কোনো জায়গা নেই, মাথা গোঁজার কোনো সম্ভাব্য ঠাই নেই, আর তাই এখানেই রয়ে গেছেন, প্লাটফর্মের এবড়োখেবড়ো অসমান মেঝেতে বিছানা পেতেছেন। কাঁথায় ঢাক্তা ওদের মুখ; কেউ ওদের নিতে আসবে আর এখান থেকে অন্য কোথাও নিয়ে যাবে-সেই আশায় ওরা পার করে দিয়েছে অনেক অনেক দিন। দিবা কি রাত যা-ই হোক, ঘুমের সময় কি না-সময়, ওরা এখানে মৃতের মুখোশ পরে শুয়ে থাকে, প্লাটফর্মের ওপর ওদের বিছানাটুকু সম্বল করে।

‘মিসেস হক?’ দুই দাঁতের মাঝে সুমিত্র স্বীকধারী একজন তরুণ রেহানার উদ্দেশে ডেকে উঠল। সে পা ছড়িয়ে হেলতে-দুলতে রেহানার কাছ অবধি এলো। ‘আপনি মিসেস হক?’

রেহানা বুঝে পেলেন না জবাব দেবে কি না। দ্বিধা নিয়ে বললেন, ‘হ্যাঁ?’

‘দেখার মতো মিল! এই ভিড়ের মধ্যেও আমি আপনাকে চিনে ফেলেছি।’ সে মুচকি হাসি দিল, এই নির্জীব দেহধারীদের ভিড়ে একটু খাপছাড়া লাগল ওর এই হাসি।

‘আপনি?’

‘আমি মুকুল, মাসিমা। আপনি আমাকে তুমি করে বলবেন। আপনাকে নিতে এসেছি। মায়াদি আসতে পারেননি; খুব দুঃখ পেয়েছেন, আমাকে পাঠালেন। আমি আপনাকে সোজা আপিসে নিয়ে যাব...ওখানেই অপেক্ষা করছে সবাই।’

ছেলেটাকে আর প্রশ্ন করার উদ্যম ছিল না রেহানার; হাত থেকে জোর করে সে ব্যাগটা নিয়ে নিল, প্রফুল্ল মনে ভিড় ঢেলে রেহানাকে পথ দেখিয়ে বাইরে আনল, স্টেশনে ঢোকান মুখ দিয়ে বাইরের উত্তাপ ঝাপটা দিচ্ছিল।

মুকুলের গাড়িটা হলুদ রঙের ভল্ভোয়ানন বিটল্। গাড়ির সঙ্গে মিলিয়ে বাম্পারও হলদে রঙ করা। গাড়ির দরজা খুলে ব্যাগগুলো তোলার সাথে সাথে গুরু হয়েছিল মুকুলের কথা। ব্রেক ছেড়ে, ঝাঁকি দিয়ে গাড়ি সচল না করা পর্যন্ত চললো তার কথার তুবরি। ‘মাসি, পেছনে আরাম করে বসুন...সামনের সিট ভরা জঞ্জাল...মানে, ঠিক জঞ্জাল না, প্রচারপত্র...আপনাকে নিতে আসার আগে আমার এগুলো পৌছে দেয়ার কথা ছিল, কিন্তু রাস্তায় বেজায় ভিড়, এদিকে আমি দেরি করতে চাইনি!’

‘আমাকে নিতে আসার জন্য অনেক ধন্যবাদ,’ রেহানা বললেন।

‘এটা তো পরম ভাগ্য মাসি। মায়াদির কাছে আপনার সম্পর্কে কত শুনেছি!’ গাড়ির আয়নায় রেহানার চোখে নজর রেখে সে বলল।

‘সত্যি?’ রেহানা অস্ফুটভাবে বললেন। চেষ্টা করলেন দুপুরের কড়া রোদ থেকে চোখ আড়াল করতে।

‘হ্যাঁ, বটেই তো,’ সে জবাব দিল। ‘কেন বলবো না বলুন, আপনি আমাদের সবার কাছে একটা দৃষ্টান্ত। একজন বীর!’ রাস্তার জমে-থাকা পানির ওপর দিয়ে গাড়িটা ছুটে বেরিয়ে গেল আর একদঙ্গল স্কুলছাত্রের গায়ে সেই সাদা পানির ঝাপটা লাগল।

‘কলকাতায় এই প্রথম নাকি?’ ঘাড় ফিরিয়ে রেহানার দিকে তাকিয়ে মুকুল জিজ্ঞেস করল।

‘উম্, না আসলে, আগে আমি এখানে থাকতাম।’

‘সত্যি?’ মুকুল জিজ্ঞেস করল। ‘কোথায়? কোন্ পাড়ায়?’

রেহানা ভুল ঠিকানা দেয়ার ঝামেলাতে পড়লেন না। ‘ওয়েলিংটন স্কয়ার।’

‘ওয়েলিংটন স্কয়ার? কী সাংঘাতিক, আপনারা নিশ্চয়ই খুব ধনী।’

ভল্ভোয়ানন গাড়লের মতো কেশে শহরের সরু রাস্তা ধরে এগিয়ে চললো। রেহানা জানালার কাচ তুলে দিলেন, কিন্তু কাচের ভেতর দিয়েও কলকাতার

জলকাদা আর পচা সবজির গন্ধ পাচ্ছিলেন। টাঙ্গার ঘড়ঘড় আওয়াজ তিনি শুনতে পেলেন, কড়াইয়ে বাদাম ভাজার শব্দ। তিনি দৃষ্টি আনত রেখে তাঁদের পুরনো বাড়ির দিকে তাকানোর লোভ সংবরণ করলেন।

আমি কলকাতায় ফিরে আসিনি, নিজেকে বিড়বিড়িয়ে বললেন, আমি কলকাতায় ফিরিনি। রেহানার বিয়ে যখন ইকবালের সঙ্গে ঠিক হলো, তিনি ততদিনে কলকাতা থেকে পালাতে পারলে বাঁচেন। একের পর এক বোনদের বিয়ে হয়ে তারা করাচি চলে যাচ্ছিল। ওয়েলিংটন স্কয়ারের বাড়িটা অনেক দিন আগেই হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল, আর ওরা কলেজ স্ট্রিটের বইয়ের দোকানের ওপর একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিল। প্রতিদিন সকালে বাবা বইয়ের দোকানে গিয়ে কোন কোন বই তাঁর ছিল সেই ঘোষণা দিতেন। ‘গ্রেট এক্সপেকটেশনস!’ তিনি প্রায় চৈঁচিয়ে বলতেন। ‘আকবরনামা। টেলস অফ দ্য আলহাম্ব্রা।’

একটা দোতলা বাড়ির সামনে মুকুলের গাড়ি ঝাঁকি খেয়ে থামল। বাড়ির সামনে আয়তাকার এক টুকরো বাগান। গেটে লেখা ঠিকানা, ৮ থিয়েটার রোড। ‘মাসিমা, ভেতরে যান। আমি গাড়ি রেখে আপনার জিনিসপত্র নিয়ে আসছি।’

‘না, ঠিক আছে...ছোট ব্যাগই তো...আমি নিজেই নিতে পারব।’ রেহানা কৃতজ্ঞ মনে গাড়ি থেকে নামলেন।

অফিসের দরজা খোলা, বাইরে থেকে তিনি শুনতে পেলেন টাইপরাইটারের খটখট শব্দ, আর রেডিও থেকে ভেসে আসা তীক্ষ্ণ আওয়াজ। চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলেন, ঘরের ছাদ অনেক উঁচুতে, নিউজ প্রিন্টের আর মাকড়সার জালের গন্ধ নাকে এসে লাগল। এক সারি টিউবলাইট নীলাভ আলোয় স্নাত করে ঘরটায় অফিসভাব নিয়ে এসেছে।

‘মা!’ মায়া রেহানার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তাঁর দম প্রায় বেরিয়ে আসার জোগাড়। তারপর ও তাঁর কাঁধ চেপে ধরল, ধরে সামান্য পিছু ঠেলে মুখটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। ‘আম্মু!’ ও আবার তাঁকে কাছে টেনে নিল, আর রেহানা ভাবলেন, মায়া যখন তাঁর শাড়িতে মুখ লুকাল তিনি কি ওর চাপা নিশ্বাসের শব্দ শুনলেন। ‘খুব সরি, আমি স্টেশনে যেতে পারি নাই... সোভিয়েত সরকার মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, ভাবতে পারো? কেমন আছো মা, তোমার জন্ম খুব মন খারাপ হতো’—সবার দিকে হাত বাড়িয়ে বললো, ‘এই যে, ইনি আমার মা!’ কয়েকজন টেবিল থেকে চোখ তুলে তাকাল, সালাম আর নমস্কার দিল রেহানাকে। ‘পরে সবার সঙ্গে তোমার পরিচয় হবে। সব ঠিক ছিল, টেন?’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব ঠিকঠাক ছিল।’ মেয়ের মস্তকী কী পরিবর্তন হয়েছে তা লক্ষ্য করার জন্য রেহানা সামান্য সময় নিলেন। সাদা শাড়ির বদলে ও সুতির একটা টকটকে লাল শাড়ি পরেছে। ঠোঁটজোড়া ফাটা, চুল আলুথালু, অনেক লম্বা হয়ে গেছে আর শক্ত করে বেণি বাঁধায় চুল নিচের দিকে একেবারে সরু হয়ে গেছে,

তবে ও আরো শক্তপোক্ত হয়েছে। এক আঙুলে অষ্টধাতুর সস্তা একটা আংটি পরে আছে। ওর সবকিছুই এখন অন্য রকম। চোখদুটি ঝকঝক করছে, আর রেহানা সেই চোখের উষ্ণতা টের পেলেন যখন দৃষ্টি মেলে ও মায়ের দিকে তাকাল। ‘আমার চিন্তা হচ্ছিল,’ মায়া বলল।

‘না, সব ঠিক ছিল, কেবল একটু ক্লান্তিকর।’

‘তোমার থাকার জায়গা ঠিক করা আছে...তুমি যেতে চাও, একটু ঘুমাবে?’ রেহানার হাত থেকে মায়া ব্যাগটা টেনে নিল।

ওদের নিজেদের মধ্যে অবস্থানের পরিবর্তনটা রেহানা খেয়াল করলেন। ‘আমার একটু ক্ষুধা লেগেছে...যদি গোসল করা যেত...মানে কোনো অসুবিধা না হলে...তুমি ব্যস্ত না?’

‘না মা, আজকে আমি সম্পূর্ণ তোমার।’ রেহানার কাঁধ জড়িয়ে ধরল মায়া আর সহজভাবে হাসল। ‘কোথায় যেতে চাও? ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল? ওয়েলিংটন স্কয়ার? নাকি কলেজ স্ট্রিট?’

‘প্রথমে চলো...’

‘হ্যাঁ, সরি মা...বাসায়...হ্যাঁ, প্রথমে বাসায়। আর কয়েক মিনিট আম্মু।’

রেহানার এত পরিশ্রান্ত লাগছে যে ওর হাত দুটো ঠাণ্ডা হতে শুরু করল।

‘দাঁড়াও, তোমাকে একটু চা করে দিই।’ মায়া দৌড়ে গেল।

সেই সুযোগে রেহানা অফিসটা আরেকটু খুঁটিয়ে দেখলেন। দেখার এমন কিছু অবশ্য ছিল না। কাগজের বান্ডিল টেবিলের ওপর ভাই করে রাখা আর মেঝের সবটুকু খালি জায়গা জুড়ে কেবল কাগজের স্তূপ। চশমাপরা অল্পবয়সী এক লোক চোখ কুঁচকে টাইপরাইটারের ওপর ঝুঁকে কাজ করছে। দেয়ালে কয়েকটা পোস্টার সাঁটা। পাশের ঘরে যাওয়ার দরজার ওপর মুজিবের কালো কোট পরা ছবি ফ্রেম করে বাঁধানো। ছবিটা এরই মধ্যে পুরোনো লাগছে দেখতে।

চেয়ারে রেহানা শরীর এলিয়ে দিলেন, টাইপরাইটারের বিরামহীন খটখট শব্দে কেমন যেন ঘোর লেগে যাচ্ছে।

পেছনের ঘরে স্টেশন খুঁজে পেয়ে রেডিওর তীক্ষ্ণ ধাতব শব্দ বন্ধ হলো।

‘আম্মু,’ মায়া বলল। ওর হাতে ধরা এক কাপ চা আর দুটো বিস্কুট, ‘বিবিসির খবরটা শুনে, তারপর আমরা যাব।’

খবরের টুকরো টুকরো অংশ রেহানার কানে এলো, সেই সাথে অফিসের লোকজনের মন্তব্য। ‘বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস থেকে বলছি...এক ঐতিহাসিক ইন্দো-রুশ মৈত্রী চুক্তি...যদি ইন্দিরা গান্ধী স্বাক্ষর করেন, এই যুদ্ধে বিজয় অর্জন বাংলাদেশের জনগণের জন্য সুনিশ্চিত...’

একটা জোরালো উল্লাস ঘর ছাপিয়ে গেল। একই সঙ্গে তিনটা টেলিফোন বেজে উঠল।

‘জয় বাংলা! জয় বঙ্গবন্ধু!’

এই উল্লাস ধ্বনি কয়েকবার উচ্চারিত হলো, সেই সঙ্গে পরস্পরের পিঠ চাপড়ানি। জিরাদার নোনতা বিস্কুট দুটো রেহানা গোত্রাসে খেলেন আর টের পেলেন তার হাঁটু যেন জমাট বেঁধে যাচ্ছে।

‘বেটা,’ তিনি মায়াকে বললেন, ‘আমাকে তুমি তোমার... ফ্ল্যাটে নিয়ে যাবে।’

‘মা, ইস সরি মা...আমরা এক্স্ফুগি যাব।’ একটু দ্বিধাশ্রিতভাবে বললো, ‘ওটা আসলে কোনো ফ্ল্যাট না।’

‘তাতে কী। আমি শুধু আমার পা লম্বা করতে চাই।’ রেহানা ওর জিনিসপত্র গুছিয়ে সামনের দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

‘না আম্মু, এদিকে।’ মায়া তাকে পথ দেখিয়ে দালানের পেছনে নিয়ে গেল, যেখানে আরও গুরুতর ভাব নিয়ে লোকেরা টেবিলের ওপর ঘাড় গুঁজে কাজ করে যাচ্ছে। রেডিও ঘিরে ছোট জটলাটার ভেতর দিয়ে চেপেচুপে ওরা এগোল। যখন ওরা দ্রুত পায়ে ঘর পার হচ্ছে, ছেলেদের মতো ট্রাউজার পরা অল্পবয়সী একটা মেয়ে ওদের দিকে হাত নাড়ল।

‘তোমার মা?’

‘হ্যাঁ,...আম্মু, ওর নাম সুলতানা।’

ছেলেদের মতো দেখতে মেয়েটা রেহানাকে দেখে বলমলে হাসি দিল। মেয়েটার চোখের তারা কালো আর দুটিময়। ‘খালা, আপনার সব কথা আমরা শুনেছি। যদি কিছু লাগে, আমাকে বলবেন।’

ওরা সরু জায়গা পার হয়ে একটা প্রায়-অন্ধকার সিঁড়ির কাছে এলো। ‘আমরা থাকছি উপরতলায়,’ মায়া বলল। একই সঙ্গে দুটো করে সিঁড়ি লাফিয়ে পার হলো ও।

মায়াকে অনুসরণ করে চললেন রেহানা। মাটিতে রাখা খবরের কাগজের স্তুপের পাশ কাটিয়ে, কাদার আঁচড় লেপা দেয়ালের মধ্য দিয়ে পানের দাগে রঞ্জিত করিডোর ওরা পার হলো।

সিঁড়িঘরের দরজা খুলতে চওড়া টানটান ছাদ সামনে। ছাদ ঘিরে কিছু রেলিং দেয়া, আর তার ওপর দিয়ে রেহানা থিয়েটার রোডের অনুসরণ বাড়ির ছাদ দেখতে পেলেন। পাশের ছাদে একজন মোটামতো মহিলার কাপড় শুকানোর দড়িতে একটা হলুদ শাড়ি নেড়ে দিচ্ছেন। ‘এই দিকে মায়া বলল। ওরা ছাদ পার হলো। দূরে এক কোণে টিনের চালা দেয়া একটা ছোট চিলেকোঠা নজরে পড়ল। দরজার দুটো সরু কপাটে লোহার একটা বড় তালু বুলছে।

মায়া চাবি চুকিয়ে তালু খুলল। দরজা খুলে যেতেই ছোট ঘরটা নজরে এলো, একদিকের দেয়ালের গায়ে লাগানো তক্তাপোশ আর অন্য দেয়াল ঘেষে ভারি একটা কাঠের টেবিল পাতা। খাট আর টেবিলের মাঝখানে জানালার মতো কিছু, যেখানে আড়াআড়িভাবে শিক লাগানো। শিকের ওপর একটা গামছা

ঝুলছে, দাবার ছকের মতো এর লাল-সবুজ নকশা পাকা মেঝেতে বড়দিন উৎসবের মলিন ছায়া ফেলছে।

‘আম্মু, এর চাইতে ভালো কিছু জোগাড় করতে পারি নাই।’

রেহানা ওর বিস্ময়ভাব দূরে সরিয়ে রাখলেন।

‘ঘরটা আমি সাফ-সুতরো করেছি।’ জীর্ণ ঘর মোছার একটা ন্যাকড়া কোনায় রাখা।

‘ভালোই তো, জান। খুব বেশি দিনের জন্য তো না।’

‘আমার জন্য অবশ্য এটা উন্নতি! এত দিন তো আমি নিচের তলায় ঘুমাতাম।’

‘অফিসে?’

‘আর কোনো জায়গা নাই,’ মায়া ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, ‘এমনিতে মজাই লাগত।’ মায়া শাড়ি খুলল আর রেহানাও তা-ই করলেন, জানালার দিকে পিঠ দিয়ে। রাতের কাপড়ে মাথা ঢোকালেন তিনি আর চুল থেকে খোঁপার কাঁটা খুলতে শুরু করলেন।

মায়া এরই মধ্যে নিজেকে তক্তাপোশে এলিয়ে দিয়েছে, ‘আম্মু, আমি সাবিরের কথা শুনেছি।’

রেহানার আসলে সাবিরকে নিয়ে কথা বলতে একটুও ইচ্ছা হলো না, কিন্তু মায়াকে সাবির সম্পর্কে সব বললেন তিনি, নীলক্ষেতের ফ্ল্যাট, কীভাবে সোহেল ওর কাছে কেঁদে পড়ল, সবই বললেন।

‘মিসেস চৌধুরী পাগলের মতো করছিল।’

‘আর সিলভি?’

‘সোহেলের ধারণা...মানে, ও আসলে এটা সিলভির জন্য করতে চেয়েছিল। ওর ধারণা সিলভি হয়তো ওকে ফের ভালোবাসবে যদি ও...তারপর আমি..., সাবিরকে ফিরিয়ে আনতে পারি।’

‘আর?’

‘জানি না। সাবিরের অবস্থা খুব খারাপ ছিল।’

‘ওকে ছেড়ে দেয়ার জন্য তুমি তদবির করলে?’

‘তোমার ফয়েজ চাচাকে ধরতে হলো।’

‘কীভাবে এতো সব করলে মা?’

‘আমি সত্যি জানি না।’ তিনি উপলব্ধি করলেন সত্যি কথাটাই তিনি বলছেন; সেই দিনটি ওর কাছে এখনো ঝাপসা, যেন এই ঘটনা অন্য কারও ক্ষেত্রে ঘটেছে আর তিনি কেবল স্মৃতিটা ধার করেছেন।

‘তুমি যতটা ভাবো তার চেয়ে তুমি অনেক সাহসী।’

‘কিংবা হতে পারে আমি হয়তো নিছকই বোকা।’ রেহানা ব্যাগ হাতড়ে কাঁথা বের করে মুখের সামনে ধরলেন, কাপড়ের কিনার থেকে তিনি যেন উত্তাপের আশ্রয় নিতে চাইছিলেন।

‘তোমাকে অন্য রকম লাগছে,’ মায়া বলল, ‘কেমন...আমি ঠিক জানি না।’

রেহানা গায়ে কাঁথা জড়িয়ে নিলেন, তারপর দেয়াল আর মেয়ের মধ্যখানে শুয়ে পড়লেন। ওপরে তাকিয়ে চোখে পড়ল ছাদ, ছাতলার দাগ মেঘের আকার নিয়ে। ছাদের চুনকামের সঙ্গে মিশে আছে। ‘তোমাকে দেখে আমিও তা-ই ভাবছিলাম।’

মায়া পাশ ফিরল। ‘আমার চলে আসার খুব দরকার ছিল আন্সু, আমার মনে হয় তুমি এটা বুঝবে। তোমাকে একেবারে একা ফেলে আসতে আমার যে কী খারাপ লেগেছিল...।’

তিনি একেবারে একা ছিলেন না। তিনি মুঘল-ই-আযম দেখেছিলেন আর সম্পূর্ণ অজানা এক মানুষকে ভালোবেসেছিলেন, কিছু শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন, যা প্রায় এক যুগ বুকের কোন গভীরে লুকানো ছিল।

মায়া তখনো কথা বলছে, ‘...আর এখানে এত ব্যস্ততা, চিন্তা করারও ফুরসত পাই না।’ চট করে সে উঠে বসল আর চুলের মাঝখানের সিঁথি ঠিক করল, বাঁ পাশের চুলগুলো ধরে বেগি গাঁথতে শুরু করল। তোশক নড়ে একটু সরে গেল। রেহানা গভীর একটা নিশ্বাস বুকে চেপে রাখলেন। তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন মেয়েটা কত অস্থির হতে পারে।

‘আচ্ছা...সাবির...ওরা পরে ওকে নিয়ে কী করল?’

রেহানা ছাদ থেকে চোখ সরালেন না। তিনি ভাবছিলেন কোন ব্যাখ্যাটা মায়া সঙ্গে সঙ্গে বর্জন করবে না।

‘বন্দিদের সম্পর্কে অনেক রকম খবর আমরা পাই,’ মায়া বলল, ‘আমি সবই জানি।’

‘তাহলে আমার বলার দরকার নাই।’

‘আমি তবু জানতে চাই।’ ও এখন ডান পাশের বেগিতে হাত দিয়েছে। আর ওর মুখে ফুটে উঠছে স্কুলবালিকার সব জানতে চাই চেহারা।

‘ওকে অত্যাচার করেছে।’

‘কীভাবে? ওরা কী করেছে?’

‘আমি জানি না।’

‘অবশ্যই তুমি জানো।’

‘আমি সত্যি চাই না...’

‘আল্লাহর দোহাই আন্সু, আমি তো কচি ব্যক্তি না!’

রেহানা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাল ছেড়ে দিলেন। ঠিক আছে, নিজেকে শান্ত রাখো, মনে মনে বললেন তিনি। ‘ওরা মেরেছে, মেরে ওর হাড় ভেঙে দিয়েছে।’

‘ওরা তাকে বাধ্য করেছে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, সারা দিন।’

‘ওর পিঠ ভরে দিয়েছে সিগারেটের দন্ধ ঘায়ে ।

‘ওরা ওকে বেঁধে উল্টো করে বুলিয়ে রেখেছে ।

‘ওরা বাধ্য করেছে লবণপানি খেতে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার ঠোঁট ফেটে চৌচির হয়ে যায় ।’

‘আর ওর আঙুলের সবগুলো নখ উপড়ে ফেলেছে ।’ চোখ থেকে যাত্রা শুরু করে অশ্রু গাল পার হয়ে কানের কাছে এসে টপটপ ঝরল । চোখ বুজলেন আর দেখলেন, তার চোখের পাতার ভেতরে রক্ত দপদপ করছে । যখন চোখ খুললেন, মায়া জানালায় দাঁড়িয়ে,...ছেঁড়া গামছাটা মেলছে আর ভাঁজ করছে । তারপর সে ঘুরে দাঁড়াল আর অদ্ভুত শান্ত গলায় বলল, ‘সাবির ভাগ্যবান যে তুমি তাকে ফিরিয়ে আনতে গেছিলে । ওরা ওকে দিয়ে কবর খোঁড়াত আর সেই কবরেই তাকে মাটিচাপা দিত ।’

রেহানা মাথা ফিরিয়ে কপালটা দেয়ালের গায়ে চেপে ধরলেন । দেয়ালের গায়ে খসখসে কাঁটার মতো ফুটে আছে চুন-সুরকি ।

‘মা, তুমি এত সাহসী,’ বলে বিছানায় গা এলিয়ে দিল মায়া । ‘এত সাহসী’, রেহানার পিঠে সে হাত বুলিয়ে চলেছে । ‘এসো, এখন ঘুমাই, ঠিক আছে?’ সে ঘুরে মায়ের দিকে পিঠ দিয়ে গুটিসুটি মেরে রইল । রেহানা মায়ের অস্থির উচ্ছ্বাস ওর পেছনে টের পেলেন । ‘কালকে আমরা রিফিউজি ক্যাম্পে যাব ।’

তিনি শুয়ে জেগে রইলেন আর মেজরের কথা ভাবলেন, ওর নীল শিরাময় হাত, নিশ্বাসের ভার ।

এই ভালোবাসা বাচ্চাদের প্রতি ভালোবাসার মতো নয় ।

এই ভালোবাসা দেশকে ভালোবাসার মতো নয়

অথবা ঘটনাচক্রে স্বামীকে ভালোবাসার মতো নয় ।

এটা কেমন জগৎসংসার গিলে খাওয়া ক্ষুধার্ত ভালোবাসা । এরই মধ্যে তাঁর ভেতরে তোলপাড় তোলে আরও পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা । একটা দিনও পার হয় না তিনি আরও চান । এর মধ্যে ব্যথা আছে কিন্তু এই স্থিতির সঙ্গে তার আগে পরিচয় ছিল না । বাবা-মা-স্বামীকে হারানোর ব্যথা এ নয় । বিমানবন্দরের কুয়াশাচ্ছন্ন জানালায় দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানানোর মতো বুকভাঙা ব্যথা এ নয় ।



‘আম্মু, ওঠো, উঠে পড়ো!’ এক গুচ্ছ চুল রেহানার গালে পড়ে শিহরণ জাগাল । ঘুমকাতুরে চোখ খুলে তিনি দেখলেন, তার মেয়ে চৌকির ওপর ঝুঁকে আছে, এক হাতে ধোঁয়া-ওঠা গরম চা আর অন্য হাতে একটা টুথব্রাশ । তিনি মনে করতে

চেষ্টা করলেন কোথায় আছেন। ‘আমাদের জলদি করতে হবে’—মায়া বলল। রেহানার হাতে টুথব্রাশ ধরিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিল। গতকালের কোমলতা উবে গেছে, সেখানে জায়গা করে নিয়েছে অচপল দক্ষতা।

‘কয়টা বাজে?’ রেহানা পাশ ফিরলেন, ঘাড়ের শক্তভাব দূর করতে পেছনটায় হাত দিয়ে মালিশ করলেন। ‘সব তো অন্ধকার।’

‘সাড়ে পাঁচটা। আমাদের তৈরি হয়ে সুলতানার সঙ্গে দেখা করতে হবে।’ চায়ের কাপ উঁচিয়ে ও দরজা দেখাল। ‘ও আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।’

‘আমরা কোথায় যাচ্ছি?’

‘আমি তোমাকে বলেছি, আজকে আমার ক্যাম্পে কাজ।’

রেহানার পেট গরম আর খালি। ‘নাশতা করব না?’

‘এখানে খাবার জায়গা আছে—খাওয়া খারাপ না—তাড়াতাড়ি করো, তাহলে হয়তো যাওয়ার আগে একটু আলুভাজি-পরোটা খাওয়ার সময় পাওয়া যাবে।’

‘ঠিক আছে’—রেহানা বললেন। তোশকের ওম থেকে নিজেকে ঝেড়ে তুললেন, ‘কাপড় বদলে আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি। তুমি নিচে যাও, আমি আসছি।’

আধঘণ্টা পর, রেহানা শাড়ি পরে নিলেন, নিচের তলার গোসলখানায় দাঁত মাজলেন, যেখানে ঘামের গন্ধে টেকা দায়—আর তেলতেলে পরোটায় মোড়ানো আলুভাজি গপগপ করে খেলেন, তারপর নিজেকে খুঁজে পেলেন সুলতানা আর মায়ার মধ্যখানে চিড়েচ্যাপটা হয়ে একটা নড়বড়ে ট্রাকের সামনের সিটে বসে থাকতে। সুলতানার হাতে গাড়ির স্টিয়ারিং, তার পরনে একই ধূসর প্যান্ট আর ঘাড় খোলা সাদা কোর্তা। ও ট্রাক চালাচ্ছে, রেহানা মুখ নেড়ে মায়াকে কিছু বললেন, ওর কোলের ওপর ওরাল ডিহাইড্রেশন থেরাপি লেখা একটা বাক্স। ‘যুদ্ধ চলছে, আম্মু’, মায়া রেহানার দিকে ফিরল আর অবোধ্য একটা হাসি দিল; ‘আমাদের যেমন ইচ্ছা আমরা তা করতে পারি।’

একটা জরাজীর্ণ কফি হাউসের সামনে ওরা দাঁড়াল। ডিম আর টুথপেস্টের গন্ধসহ মুখটা মুকুল খোলা জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল আর চোঁচাল, ‘নমস্কার, সুপ্রভাত, মাসিমা।’ তারপর সে ট্রাকের পেছনে লাফ দিয়ে উঠে গেল, ওষুধের বাক্স, গুঁড়ো দুধের টিনের মধ্যে গুছিয়ে বসল।

এক ঘণ্টা পর। আকাশে তখনো হলুদ ছোপ পরন্ত ধরেনি আর রাতের ভারি শিশির তখনো গাছের গায়ে আর গাড়ির উইন্ডস্ক্রিনে লেপ্টে আছে। মায়া ও সুলতানা গান ধরল। পাকিস্তানি সেনা আর স্কিটাল নিয়ে সুলতানা কিছু একটা বলল, আর তা-ই নিয়ে মায়া পেট চেপে ধরে হাসতে হাসতে খুন হলো। এই যাত্রা শিগগিরই শেষ হোক। রেহানা তা-ই চাইলেন।

‘অর্ধেক পথ এসে গেছি!’ মায়া আমোদিতভাবে বলে উঠল। আর তখনই শুরু

হলো বৃষ্টি। উইন্ডস্ক্রিনে বৃষ্টির এলোপাতাড়ি ফোঁটা বাচ্চাদের ঝুমঝুমির মতো শব্দ তুলল। সামনের রাস্তা অনেক দূর চলে গেছে, ঝাপসা আর কাদায় মাথা।

এবার হাওড়া ব্রিজ পার হলো ওরা আর কলকাতার সীমানা ছাড়ল। যত দূর চোখ যায়, শূন্য মাঠ শুকনো খড়ে মেটে সোনালি হয়ে আছে। ওরা একটা পাটের কল পার হলো, সঙ্গে পার হলো ঘাস আর গোবরের গন্ধ; তারপর একটা চামড়ার ফ্যাক্টরি, এর আঁশটে গন্ধ রাস্তায় উপচে পড়ছে; এবার একটা সিমেন্ট কারখানা, স্তম্ভের মতো কালো ধোঁয়া আকাশ গিলে ফেলছে আর কানে আসছে হুল ফোটানো তীক্ষ্ণ শব্দ। আধঘণ্টা পর মুকুল পেছনের কাছে টোকা দিল। ‘প্রায় এসে গেছি!’ চেষ্টায়ে বলল। মাইলফলকের দিকে আঙুল উঁচিয়ে দেখাল, সেখানে লেখা—‘সল্ট লেক ২ কিলোমিটার।’ প্রবল বাতাস ওর চুল আর কান চ্যাপ্টা করে দিয়েছে।

সুলতানা কাত হয়ে স্টিয়ারিং ডানে ঘোরাল, আর সরু এবড়োখেবড়ো পথ ধরে এগোল। অনেকটা দূরে রেহানা বিরাটকায় তাঁবু দেখতে পেলেন এর পাশে বিশাল মাঠ জুড়ে ছোট ছোট ছাপরা আর কোনোরকমে দাঁড় করানো আচ্ছাদন। মাঠ ছাপিয়ে রয়েছে সিমেন্টের পেল্লায় সব পাইপ।

‘এটাই কি উদ্বাস্তু শিবির?’

‘জি খালা’—সুলতানা বলল, ‘এটাই।’

তাঁবুর দিকে যেতে, রেহানা একটা বিশাল ব্যানার ঝুলে থাকতে দেখলেন, তাতে রেডক্রসের চিহ্ন আঁকা।

‘আম্মু’—মায়া বলল, ‘এসে গেছি। সল্ট লেক উদ্বাস্তু শিবির।’

‘তাঁবুটা কী?’

‘হাসপাতাল।’

কাঠের কতোগুলো লম্বা তক্তা তাঁবু অবধি পথের কাজ করছে। মাঠের চারপাশে মানুষের জীবন ছত্রখান হয়ে ছড়ানো, যারা দ্রুত তাদের ঘরবাড়ি, স্বজন ত্যাগ করে চলে এসেছে। জুতো, চিরুনি, কাপড়ের টুকরো, ভাঙা হাঁড়ি কাদা মাটিতে সয়লাব হয়ে আছে। মায়া ও সুলতানা কাঠের তক্তা ডিঙিয়ে পথের হলো, জলে ডোবা পায়ের ছাপ, তেলতেলে গর্ত এড়িয়ে সামনে এগিয়ে গেল। মায়া ওর লাল শাড়ি একটু উঁচু করে ধরেছে, যাতে গোড়ালি মুক্ত থাকে। জুতো শক্তভাবে পায়ে আঁটা। জায়গাটা কী রকম সে সম্পর্কে রেহানাকে কেউ আগে কোনো আভাস দেয়নি। সে এক হাতে শাড়িটা উঁচু করে ধরলেন, যাতে কাদায় মাখামাখি না হয়। অন্য হাতে স্টেটসম্যান পত্রিকা দিয়ে মাথা আড়াল করলেন। ততক্ষণে মেঘ কেটে সূর্য সতেজে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে, বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে সেই ভারি ও ঘোলাটে উত্তাপে। তিনি মাথা নিচু করে নড়বড়ে অসমান তক্তার ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে মন দিলেন।

রেডক্রস তাঁবুর ভেতরের সবাই মায়া ও সুলতানাকে দেখে হইহই করে উঠল

আর হাত মিলিয়ে স্বাগত জানাল। সাদা অ্যাপ্রন পরা লম্বাটে এক লোক ওদের দিকে এগিয়ে এলেন। ‘এই তো! আমার মঙ্গল প্রভাতের প্রতিমারা’—গমগমে গলায় বললেন তিনি।

‘ডক্টর রাও, ইনি আমার মা’—মায়া বলল।

লোকটার দুটিময় জলপাই চোখ। ‘কলকাতায় আপনাকে স্বাগতম। আমি যখন পরিদর্শনে বের হবো, আমার সঙ্গে যোগ দিতে পারেন।’ তিনি মায়ার কাঁধে হাত রাখলেন।

‘অবশ্যই—’ মায়া মুখে লালিমা ছড়িয়ে বলল, ‘ওষুধের জোগানগুলো আগে গুছিয়ে রেখে নিই।’

‘ঠিক আছে তাহলে, পরে দেখা হবে’—এই বলে লম্বা পা ফেলে দ্রুত তিনি এগিয়ে গেলেন।

সুলতানা এরই মধ্যে ওষুধের বাক্স খুলে ওকে ঘিরে দাঁড়ানো কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবীকে নির্দেশ দিল কার কী করতে হবে। মায়া সুলতানার সঙ্গে কজের একটা সারিতে যোগ দিল। র্লেড দিয়ে বাক্স চিরে খোলা, তাক অনুযায়ী ওষুধ জমা রাখা, এসব করছিল।

দূরে দাঁড়িয়ে রেহানা শরীরের ভর এক পা থেকে আরেক পায়ে নিয়ে ওদের কাজ দেখছিলেন। আবার যেন তিনি ফিরে গেছেন বোনেদের সঙ্গে সেই আগেকার সময়ে, যখন ওরা বড়দের কাজগুলো করত আর তিনি আলগোছে গায়েব হয়ে যেতেন।

‘আম্মু’—সিরিঞ্জের একটা প্যাকেট খুলতে খুলতে খুলতে মায়া বলল, ‘তুমি কি জায়গাটা ঘুরে দেখতে চাও?’

‘হ্যাঁ, একটু ঘুরে আসি’—রেহানা জবাব আশ্বস্ত হয়ে দিল।

‘সুলতানা, আমরা এখনই আসছি।’

‘আমিও পরে আসছি’—কপট ভাব নিয়ে সুলতানা ফ্র নাচাল। ‘ডক্টর রাওয়ের সঙ্গে সবাই মিলে দেখা করতে পারি।’

ওরা যখন তাঁবুর বাইরে পা রাখল, রেহানা দেখলেন, অনেকগুলো পরিবার জড়সড় হয়ে একপাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে।

‘ওরা কিসের জন্য অপেক্ষা করছে?’

‘টিকা’—মায়া বলল। সে ঘড়ি দেখে নিল। ‘প্রতিদিন সকাল দশটায় টিকা দেয়া হয়।’ লাইনের শেষ মাথায় ভাঁজ খোলা টেক্সিলের ওপাশে আধপাকা চুলের কোট পরা একজন লোক বাচ্চাদের প্যাকাটের হাতে সুচ ফোটাচ্ছে।

বিবর্ণ চালাঘর ছাওয়া মাঠে রেহানাকে মায়া পথ দেখিয়ে নিয়ে এল, সেখানে মৌচাকের মতো গাদাগাদি সিমেন্ট পাইপের তিন-চারটে স্তূপ সার বেঁধে রাখা।

‘নবাগতদের ওরা ওখানে রাখে’—মায়া বলল, পাইপগুলো দেখিয়ে।

‘কোথায়?’

‘ওখানে।’

ওখানে থাকার কোনো কাঠামো নেই, শুধুই পাইপ। ‘আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না।’

‘মা, পাইপের ভেতরে দেখো।’

রেহানা কপালের ওপর হাত রেখে ভালো করে তাকালেন—এবার জীবনের অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর হলো।

সত্যিই তাই। প্রাপ্তবয়স্ক কোনো মানুষ দুই হাত টানটান করে ধরলে যতটা প্রশস্ত হয় প্রতিটি পাইপ বড় জোর ততটুকু চওড়া, ভেতরে মানুষ ঠাসা। একটু আড়াল তৈরির জন্য কোনটায় লুপ্সি ঝুলছে। ওপরে শাড়ি শুকাতে দেয়া। পাইপের বাঁকের সঙ্গে হেলান দিয়ে ভেতরে তাদের পিঠ বেঁকে আছে, পুরুষ আর নারী ঘুটঘুটে অন্ধকারে দেয়ালের ঢালে মিশে আছে।

মায়া আর রেহানা হাঁটতে হাঁটতে পাইপগুলোর কাছাকাছি চলে এলো। ওরা যত এগিয়ে গেল পায়ের নিচে মাটি তত দেবে যাচ্ছে মনে হলো। আর এখানেও কাঠের তক্তা পাতা। মানুষের বর্জ্য-আবর্জনার দুর্গন্ধ হঠাৎই রেহানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, আর তিনি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গেলেন।

‘মায়া’—রেহানা বললেন, শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে, ‘আমরা এখানে আর কতটা সময় থাকব?’

‘এই ক্যাম্পে?’

‘না, কলকাতায়।’

‘কেন?’

‘আমি জানতে চাই—আমাদের বাড়ি ফেরার আর কত দেরি?’

‘ঢাকা এখন আর নিরাপদ না। ওরা যখন-তখন বাড়িঘরে হামলা চালায় আর ঘুণাঙ্করেও কেউ যদি তোমার মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দেয়ার কথা আর্মির কাছে ফাঁস করে দেয়, তাহলে আমাদের সবাইকেই আটক হতে হবে।’

‘কিন্তু যখন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম তখন তো পরিণামের কথা জানতাম।’

‘পরিস্থিতি অনেক বদলে গেছে। আর্মিরা ঘাবড়ে গেছে, ওদের আর হুঁশ নেই, এলোপাতাড়ি আক্রমণ চালাচ্ছে।’

রেহানা জানতেন, বাড়ি ফেরার আকুতি নিয়ে উদাস হয়ে থাকা নিছক ছেলেমানুষি বিলাস, কিন্তু নিজেকে সামলাতে পারছিলেন না। সবকিছু এত দ্রুত ঘটে যাচ্ছে, এখানে পৌঁছানোর পর, ... এরপর কী ঘটবে তা ভেবে দেখার সময়ও তিনি পাননি। এমন অতল অনুভূতি হবে তা তিনি বুঝতে পারেননি। তার আসলে আসা উচিত হয়নি।

‘মা, চিন্তা কোরো না। শিগগিরই তোমার মন বসে যাবে।’

ওরা এগিয়ে গেল। পাইপগুলো কাছে থেকে আর বড় দেখাল না। কিনারে বসে বাচ্চারা পা দোলাচ্ছে, মহিলারা ভেতরে প্রায় ঝুলে আছে, তাদের মুখ ছেঁড়া আঁচলে ঢাকা।

ওরা একটা ছেলেকে দেখল, ছয় সাত বছরের বেশি বয়স হবে না, পাইপের পাশে উবু হয়ে বসে আছে। ‘তুমি আজকে এসেছ?’—মায়া জিজ্ঞেস করল, ওর পাশে গুঁড়ি মেরে বসে ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত তাকিয়ে দেখল। ‘আগে তো তোমাকে দেখিনি।’

ছেলেটা পাটের আঁশ দিয়ে দড়ি বুনছিল। যখন মাথা তুলে তাকাল, রেহানা দেখল ওর চামড়া মুখের ওপর সঁটে আছে। ওর ঘাড়ের, যেখানে নাড়ি থাকার কথা, সেখানে শূককীটের মতো সেলাইয়ের কাটা দাগ।

মায়া ওর হাতের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে বিড়বিড় করে কী যেন বলল।

‘এই ছেলে, জোরে কথা বলো’—মায়া ওর থুতনি ধরে রক্ষভাবে বলল।

‘জি আপা।’ আঁশের একটা বাঁধন শেষ করে আরেকটা শুরু করল।

‘কোথা থেকে এসেছ?’

‘পাবনা’—সে ফিসফিস করল।

‘কোথা থেকে?’

‘পাবনা’—ছেলেটা বলল, আরও নরম হয়ে, প্রথম বাঁধনটা দাঁতে আটকে।

‘কোন গ্রাম?’—মায়া জিজ্ঞেস করল।

‘আমি জানি না।’

‘তুমি গ্রামের নাম জানো না?’

‘দুলাল, তাড়াতাড়ি করো।’ একজন মহিলা কোমরে হাত রেখে পাইপ থেকে বের হয়ে রেহানাকে আপাদমস্তক দেখল। ‘এই ঝোলাটা আমার দরকার।’ মহিলার অন্য হাতে কিছু ছিল...একটা মুরগি...তার কনুইয়ের ভাঁজে গোঁজা। সে ওটাকে মোচড় দিয়ে ঘুরাল আর পাখাটা ধরল।

‘এইটা কে?’ মায়াকে দেখিয়ে সে জিজ্ঞেস করল ছেলেটাকে। ‘ছেলেটা ডানা দিয়ে মুরগিটা মহিলার গায়ে ঝাপটাতো লাগল।’

মায়া উঠে দাঁড়াল। ‘আমার নাম মায়া। আমি এখানে কাজ করি।’ মায়া রেহানার পরিচয় দিল না। ‘এ কি আপনার ছেলে?’

‘না। ও আমার গ্রামের।’

‘ওর আত্মীয়স্বজন কই?’

‘মরছে’—ভাবলেশহীনভাবে মহিলা বলল।

‘ওই তাঁবুটা দেখতে পাচ্ছেন?’ মায়া আঙুল উঁচিয়ে দেখিয়ে বলল, ‘ওইখানে গিয়ে নাম লেখান। ওরও। খাবার, ওষুধ সব পাবেন। বুঝলেন?’

মহিলা মাথা নাড়ল। সে মুরগিটা দুলালের হাতে দিল, যে তার পাটের

দড়িগুলো দিয়ে একটা জালের মতো করে বাঁধছে। রেহানা মহিলাকে আরও দু'একটা প্রশ্ন করতে চাইলেন : তার বয়স কত, এই ক্যাম্পে সে কীভাবে এসেছে, ওর বাবা-মা আছে কিনা, স্বামী, নিজের বাচ্চা,...কিন্তু মালকোঁচা দিয়ে লুঙ্গি পরা এক বয়স্ক লোকের দিকে হাত নেড়ে মায়া এরই মধ্যে হাঁটা ধরেছে।

রেহানা ব্যাগ হাতড়ে কয়েকটা টাকা বের করলেন। 'এই টাকা কয়টা রাখেন...।'

মহিলা রেহানার দিকে শুকনো চোখে পলকহীন তাকিয়ে রইল। 'আমার টাকার দরকার নেই'—সে বলল।

রেহানা হাত বাড়িয়ে মহিলার হাত ছুঁতে চাইলেন, কিন্তু সে একটু পিছিয়ে গেল। রেহানা বিহ্বল হয়ে দৌড়ে মায়ার পিছু ধরল।

ওরা ক্যাম্পের আরও ভেতরে ঢুকল। গরম ক্রমে বাড়ছিল আর দুর্গন্ধ আরও প্রকট; গাদাগাদি সিমেন্ট পাইপের পর এখন খুপরি আর ভাসমান আশ্রয়ের ব্যবস্থা। প্লাস্টিক ও কাঠের ভাঙা টুকরো দিয়ে এসব বানানো। যারা ভাগ্যবান তারা দু'একটা টিনের পাত পেয়েছে বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য। রেহানা ওর শাড়ি গোড়ালি পর্যন্ত টেনে রেখেছেন। আরেক হাত দিয়ে মাছির দঙ্গল তাড়ানোর চেষ্টা করছেন, যারা ওর পিছু ছাড়ছে না। যেদিকে তাকান সেদিকেই উদ্ভাস্তদের উদ্ভাস্ত মুখ চোখে পড়ে। কেউ হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, আর তিনি ভাবলেন ওরা হয়তো ওকে জাপটে ধরবে, টেনেহিঁচড়ে গোবর গাদায় নিয়ে ফেলবে। মাথার ভেতরে স্পষ্ট দেখতে পেলেন তারা ওকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে ওদের কোনো পাইপের ভেতর, সারা দিন পাটের দড়ি বানাতে বাধ্য করছে। 'তুমি আমাদেরই একজন,' ওরা বলল, 'তুমি আমাদেরই একজন'—তিনি কল্পনা করলেন, মায়া তাকে ওখানে ফেলে চলে যাচ্ছে, সুলতানা আর মুকুলের সঙ্গে ট্রাকে করে ফিরে যাচ্ছে, থিয়েটার রোড পর্যন্ত গোটা রাস্তা হাসতে হাসতে।

'মায়া'—রেহানা শেষ পর্যন্ত বললেন, 'আমি আর পারছি না।'

'আর একটু যেতে হবে'—মায়া সামনের দিকে দেখিয়ে বলল, 'ওপাশে একজনের সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই।'

'আচ্ছা'—রেহানার পেট গুলিয়ে উঠছে, 'তুমি এগোও, আমি এখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।'

'এখানে কোথায় অপেক্ষা করবে?'

রেহানা চারপাশে তাকালেন। বসার মতো কোনো জায়গা নেই। 'আমি তাঁবুতে ফিরে যাচ্ছি।'

'একা একা খুঁজে পাবে?'

'হ্যাঁ...তুমি যাও।' রেহানা ওকে বিদায় করতে পারলে বাঁচেন; অন্যথায় সব আগ্রহ বিসর্জন দিয়ে এক দৌড়ে তাঁবুতে ফিরে যেতে পারেন। তিনি ট্রাকের কথা

ভাবলেন। এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি নিয়ে হয়তো ট্রাকে ফিরে যেতে পারেন আর বসে রেডিও শুনতে পারেন। অথবা স্বেচ্ছাসেবী আর ওদের ওষুধের বাস্তবের পাশে বসে থাকতে পারেন। যা খুশি, এই দুর্গন্ধ থেকে দূরে যেখানে খুশি।

তিনি পথ খুঁজে তাঁবুতে ফিরে গেলেন। শব্দ না করে তাঁবুর পর্দা ঠেলে ভেতরে ঢুকে নিজেকে একটা হাসপাতালে দেখতে পেলেন। বিছানাগুলো একটার সঙ্গে আরেকটা লাগানো, যাতে সার সার শরীর দেখে মনে হয় মানবদেহের একটা অভঙ্গ প্রবাহ। তিনি মাঝখান দিয়ে হেঁটে গেলেন, মানুষজন ডিঙিয়ে। মহিলাদের দেখে তিনি আঁতকে উঠলেন, নিশ্বাস তাঁর গলায় আটকে গেল। ওরা বাচ্চাদের পাশে উবু হয়ে বসেছে, শুকনো উদ্যম বুক ওদের মুখে ঠুসে ধরেছে, ওদের চুল পথের ধুলোয় রুক্ষ।

‘মিসেস হক?’ এক লোক অবিন্যস্ত পায়ে ওর দিকে এগিয়ে এলেন, সেই ডাক্তার। হাতে সাদা রাবার দস্তানা টেনে পরানো। আঙুলের ডগায় রেহানা কালো ছোপ দেখতে পেলেন, আর তিনি যত কাছে এগিয়ে এলেন, রেহানা দেখলেন, ওর সাদা অ্যাপ্রনের পকেটের ওপর লালচে ছিটা লেগে আছে। ‘চাচি? এখানে কী করছেন?’

রেহানা ওকে অভিনন্দিত করতে চাইলেন। ‘আমি...আমি একটু ঘুরে দেখতে এসেছি।’

‘আসলে, বেশি কিছু দেখার নেই। পেছনে ছোট অপারেশন থিয়েটার, আর একটা ওষুধের ঘর। আপনাকে কি ঘুরিয়ে দেখাব?’

‘না, লাগবে না। আমি শুধু...এই দেখছি।’

‘কত কত মানুষ এসেছে’-ডাক্তার রাও বললেন, রেহানার ওপর দৃষ্টি স্থির রেখে। ‘সারা দেশ থেকে। সবকিছু ফেলে চলে এসেছে, দিনের পর দিন হেঁটেছে, শুধু এখানে পৌঁছানোর জন্য।’

ডাক্তারের দস্তানায় লেপ্টে থাকা লাল থেকে রেহানা চোখ সরাতে পারছিলেন না।

‘এখানে নাম নিবন্ধনের খাতা আছে...আমি আপনাকে দেখাতে পারি।’

বাঁক ঘুরে ওরা আরেকটা ঘরে প্রবেশ করলেন। এখানে আরও ডিড, বাচ্চাদের কান্না প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। একটা যান্ত্রিক গমগম আওয়াজ আর সব শব্দকে ঢেকে ফেলেছে।

‘শব্দটা কিসের?’

‘জেনারেটর’-ডাক্তার জবাব দিলেন, ‘অপারেশন থিয়েটারের জন্য আমরা বিদ্যুৎ পাই আর সন্ধ্যায় কয়েক ঘণ্টার জন্য আলো থাকে।’

‘আপনি এখানে থাকেন?’

‘হ্যাঁ’-দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তিনি বললেন, একটু হাসলেন। ‘মাঠের কোনায় আরেকটা ছোট তাঁবু আছে।’

‘আপনি কোথাকার?’

‘কাশ্মির।’

‘আপনি কি কলকাতায় পড়তে এসেছেন?’

‘না’—তিনি বললেন, ‘না। আমি এর জন্যই এসেছি।’

‘আম্মু’—মায়া সেই রাতে বলল, ‘ডাক্তার রাও ভাবছিলেন, তুমি হয়তো ক্যাম্পে সাহায্য করতে চাইবে।’

আমি জানতাম। আমি জানতাম ও আমাকে এখানেই রেখে দিতে চায়। ‘আমি? আমি কী করতে পারব?’

‘ওদের আসলেই সাহায্য দরকার। তুমি সোনায় যা করেছ, তাই এখানে করবে...রিফিউজিদের সঙ্গে কথা বলবে।’

রেহানা উদ্বাস্তদের সঙ্গে কথা বলতে চান না। সবসময় তাঁকেই কেন সব কাজ করতে হবে? একে উদ্ধার করো, ওকে বাঁচাও। ‘আমি যদি তোমাদের অসুবিধায় ফেলে থাকি তাহলে আমার ঢাকায় ফিরে যাওয়াই উচিত।’

‘আম্মু’—মায়া বলল, ‘তুমি জানো এটা সম্ভব নয়।’

‘আমার আসা উচিত ছিল না।’

‘ব্যাপারটা অনেক ঘোরাল, ওরা তোমাকে আটক করতে পারত।’

এখানে এই চিলেকোঠায় অথবা তার চেয়েও খারাপ, ক্যাম্পে গিয়ে মাসের পর মাস কাটানো, কল্পনা করাই রেহানার কাছে অসহনীয় ঠেকল। ‘তাতে কী? আমি যা করেছি তাতে ধরে নিয়ে যাওয়াটা আমার প্রাপ্য।’

‘বাজে কথা বলো না তো।’

‘আমি ক্যাম্পে ফিরে যেতে চাই না।’

‘ঠিক আছে, যেয়ো না। এখানে থাকো।’ মায়া পাশ ফিরল আর হাত ভাঁজ করে গালের নিচে রাখল। ঠিক যেভাবে ওর বাবা শুতো, রেহানা ভাবল, যেন ও প্রার্থনা করছে।

চিলেকোঠার শ্বাসরুদ্ধকর গরম রেহানাকে জাগিয়ে দিল। বিছানা খালি; মেঝে মায়ার কাপড়ে সয়লাব। রেহানা কাপড়গুলো তুলে ভাঁজ করতে লাগলেন। মায়ার কামিজ থেকে ময়লা গন্ধ আসছে, ধোয়া দরকার। ওর অন্য কাপড়গুলোর অবস্থাও খুব ভালো নয়; সবগুলো শাড়ি ও পেটিকোটের পায়ের কাছটায় কাদার ছোপ।

রেহানা চিলেকোঠা থেকে বেরিয়ে কোথাও একটা কল আছে কিনা খুঁজলেন।

ছাদের প্রায় পুরোটা তিনি ঘুরে এলেন, কপালের ওপর হাত দিয়ে রোদ আড়াল করলেন। কলের পাইপ ধরে এগিয়ে ছাদের একেবারে প্রান্তে যা খুঁজছেন তা পেয়ে গেলেন, দেয়ালের সঙ্গে লাগানো কল। নিচে পানি সরে যাওয়ার জন্য একটা ফুটো।

কাপড় ধোয়ার কোনো সাবান ছিল না। তিনি ঘিয়ে রঙের সাবানটা বের করলেন, মুখ ধোয়ার জন্য যেটা নিয়ে এসেছিলেন। কল ছাড়তে পানির সরু ধারা গড়িয়ে পড়ল। কুসুম গরম পানি, আরামের। হাঁটু গেড়ে বসে রেহানা যখন মায়ার সালোয়ার-কামিজ অভ্যস্ত হৃন্দে ধুতে লাগলেন, ছপ-ছপ, ছপ-ছপ, ছপ-ছপ, ছপ-ছপ, অচিরেই মনের ভেতরে কোথাও স্বস্তি খুঁজে পেয়ে হাঁফ ছাড়লেন।

রেলিংয়ের ওপর কাপড়গুলো মেলে দিলেন, সূর্যের নিচে ভেজা কাপড় ঝলমল করতে দেখে খুশি হলেন। সেদিনের দেখা সেই স্থলকায় মহিলাকে আবার পাশের ছাদে দেখা গেল, সেই একই হলুদ শাড়ি মেলে দিচ্ছেন। মহিলা হাত নাড়লেন, রেহানাও প্রত্যুত্তর দিলেন।

নিচের তলায়, দাঁতে কলম কামড়ে ধরে মায়া টাইপরাইটারের ওপর বসে গেছে। কলমের কালি অল্প চোয়াচ্ছে; ঠোঁটের এক কোনায় কালো একটা বিন্দু আকারে বেড়ে চলেছে।

‘মা, কোথায় ছিলে?’

‘ওপরতলাটা একটু গোছালাম’—রেহানা ওর ঠোঁটের দিকে ইঙ্গিত করলেন। ‘তোমার ঠোঁটের কোনায় একটু...’

মায়া এরই মধ্যে টাইপরাইটারের দিকে ঘুরে গেছে। ‘ওপরে খুব গরম না?’ মন আবার ফিরে গেছে কাজে।

‘আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, দেখি টুকটাক দরকারি জিনিস কিছু পাওয়া যায় কিনা’—রেহানা বলল। ‘আমাদের সাবান লাগবে, আর কিছু হালকা নাশতা।’

‘ঠিক আছে’—মায়া বলল, ওর দৃষ্টি আঙুলের ওঠানামায় নিবদ্ধ। ‘তুমি যাও।’ যাওয়ার পথে রেহানা দেখলেন মুকুল দেয়ালে পোস্টার সাঁটছে। মাথায় একটা নীল টুপি যেটা ওর চোখ ঢেকে নিচের দিকে নেমে আছে।

‘কেমন আছেন, মাসিমা’—সে বলল, থুতনি উঁচু করল যাতে তাকে দেখতে পায়, ‘এই গরমে কোথায় যাচ্ছেন?’

‘কয়েকটা জিনিস আনতে হবে সামনের দোকান থেকে।’

‘বাইরে তো একদম জ্বলে যাচ্ছে।’

‘এই যাব আর আসব।’

‘নিন, আমার টুপিটা নিয়ে যান,’ মাথা থেকে টুপিটা খুলে সে বলল। ওর চুল ঘামে ভিজে কপালের সঙ্গে লেপ্টে আছে। রেহানা টুপির কিনার জুড়ে ঘামের বিন্দু দেখতে পেল।

‘না, লাগবে না।’

‘ধরেন, আমি বলছি তো অসম্ভব গরম।’

‘না, না, চিন্তা কোরো না, আমি এখনই ফিরব।’

বাইরে আগুনের মতো গনগনে তাপ। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে রেহানার গাল জ্বলতে লাগলো। একবার ভাবলেন ফিরে যান, কিন্তু মুকুলের ঘামে ভেজা টুপিটার কথা মনে হতে আবার হাঁটতে শুরু করলেন; তিনি রাস্তা বরাবর হেঁটে একটা মোড়ের কাছে এলেন। ট্রামের লাইন রাস্তাকে দুই ভাগ করেছে, আর দুই পাশেই অনেক দোকানপাট, দরজা খোলা আর জ্বলজ্বলে রঙের সাইনবোর্ডগুলো গায়ে গায়ে লাগানো। কলকাতার এই দিকটি রেহানার মনে পড়ে না কিন্তু টাঙ্গাওয়ালা, গাড়িঘোড়া চলাচলের মধ্যে খালি পায়ে লাফিয়ে রাস্তা পার হওয়া, দালানকোঠার গড়ন, চওড়া রাস্তা, ট্রাম—এতগুলো বছরের ইচ্ছাকৃত বিস্মরণ সত্ত্বেও এসব চিনতে তাঁর ভুল হলো না।

এখন সবকিছুই কান ঝালাপালা করা আর ভিড়ভারাক্রান্ত। মানুষ গিজগিজ করছে রাস্তায় আর ট্রাম টলে যাচ্ছে যাত্রীর চাপে। ফুটপাথ দখল করে আছে মানুষ, হাঁটার পথ নেই বললেই চলে, তার মধ্য দিয়েই ঠেলেঠেলে রেহানা নিজের পথ করে নিলেন। তিনি মাথা নিচু করে সবচেয়ে কাছের দোকানটায় ঢুকে পড়লেন, আর আলো ছেড়ে হঠাৎ অন্ধকারে আসার জন্য চোখ পিটপিট করতে লাগলেন। সরু ঘরটার এক পাশের দেয়ালজুড়ে সারি বাধা তাক, দোকানির কাউন্টার তারই পাশে আড়াআড়ি করে বসানো। তাকের ওপর বিভিন্ন জিনিস এলোমেলো করে রাখা—চকোলেট, বাচ্চার গুঁড়োদুধ, শ্যাম্পু, আচার, চিরুনি। এক লোক কাউন্টারের ওপর হাত রেখে তাকগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

একটা নীল রঙের কাপড় ধোয়ার সাবান দেখাল রেহানা। ‘ওইটা একটু নামান, কত দাম?’

‘হয় আনা’—লোকটা বলল, মুখে কী একটা চিবোতে চিবোতে।

‘একটা লাগবে। আর এক পোয়া মুড়ি। আর একটা...আপনার কাছে কাঁচি আছে?’

‘কাঁচি?’

‘হ্যাঁ, একটা কাঁচি দরকার।’

লোকটা একটা ড্রয়ার টান দিয়ে খুলল আর কয়েক ধরনের কাঁচি দেখাল। প্রতিটার ধার খুঁটিয়ে দেখলেন রেহানা, হাতলের ভেতর বুড়ো আঙুল ঢুকিয়ে দেখে শুনে সবচেয়ে ছোটটা বেছে নিলেন।

‘সব মিলিয়ে তিন রুপি বারো আনা।’

রেহানা যখন দাম দিতে যাচ্ছেন তখন লোকটা বলল, ‘আপনাকে কি আমি আগে কোথাও দেখেছি?’

লোকটাকে তিনি কাছে থেকে ভালো করে দেখলেন। বয়স্ক মানুষ, ওর বাবার বয়সী হবে। লোকটাকে কি তিনি চেনেন? কী অবিশ্বাস্য! কলকাতায় একটা লোককে খুঁজে পাওয়া গেল যে আবার তাঁকেও মনে রেখেছে। কিন্তু না, তাকে তিনি আগে কখনো দেখেননি। ‘আমার মনে হয় না।’

‘আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি আপনাকে আমি চিনি’, সে জোর করল।

‘কিন্তু আমি তো এখানে থাকি না।’

‘কোথা থেকে এসেছেন...আপনি কি জয়বাংলার লোক?’

‘জি!’

‘আপনি কি ঢাকা থেকে এসেছেন? বাংলাদেশ? জয়বাংলা?’

আসলে না, তিনি ভাবলেন, আমি এখানকার, কলকাতার। কিন্তু বললেন, ‘হ্যাঁ, আমি জয়বাংলা’।

‘শতকরা দশ ভাগ ছাড়,’ লোকটা হেসে বলল। ‘দশ ভাগ উদ্বাস্ত ছাড়।’ ভাঁজ পরা কুঞ্চিত হাতে ব্যাগটা সে রেহানার দিকে বাড়িয়ে দিল। ‘১৯৪৭ সালে আমিও উদ্বাস্ত ছিলাম। সেজন্যই আমি চিনতে পেরেছি।’ আর তারপর লোকটা কেমন পিতৃসুলভ মমতায় তার দিকে তাকাল। ‘আপনার কখনো কিছুর দরকার হলে এখানে আসবেন। সে যা-ই হোক।’

হঠাৎই রেহানার চোখে লোকটা ঝাপসা হয়ে গেল। এবার লোকটা রেহানার দিকে হাত নাড়ল, ‘দয়া করে কাঁদবেন না! একটা চকবার নেবেন? মিলন, আমার মেয়েকে একখানা চকবার দাও। কাঁদবেন না, মা, কাঁদবেন না।’

রেহানা ভেজা আঙুলে মোড়কের কাগজ টেনে ছিঁড়লেন। কামড় বসালেন চকোলেটে এবং ভেতরের আইসক্রিমে।

‘মা, আপনি যান...আপনি যান।’

দুপুরের তাপে রেহানা বেরিয়ে এলেন জিভে গলে যাওয়া আইসক্রিম সঙ্গে নিয়ে। সামনের দিকে তিনি আরেকটু হাঁটলেন, একটা তামাকের দোকান আর একটা চাইনিজ রেস্তোরাঁ পেছনে ফেলে। পরের রাস্তার কোনায় একটা স্ট্রপ খুঁজে পেলেন, স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার ভবনের ছায়ায় জায়গাটা স্নিগ্ধ হয়ে আছে। দু’জন মহিলা ইতিমধ্যেই বেঞ্চের ওপর গা এলিয়ে দিয়েছে, ওরা চেপে বসে রেহানাকে জায়গা করে দিল। রাস্তার ওপারে ছিল ট্রামেট স্ট্যান্ডার যাত্রীছাউনি। রেহানা দেখলেন যাত্রী ট্রামের কামরা খালি করা ও স্ট্রপের তোলার দৃশ্য।

তিনি দেখলেন দৃশ্যটা একই, মানুষ একইভাবে ছুটছে রেলস্টেশনে, সোনার বাগান থেকে, উদ্বাস্ত শিবিরগুলোতে থেকে, যথেষ্ট উদ্বাস্তরা এখন রাস্তায় মাছের মতো খাবি খাচ্ছে।

এদের মধ্যে কাউকে একটু কম মরিয়া মনে হলো, প্রায় সাধারণ। কিন্তু মিশে যাওয়ার হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও, তিনি বলতে পারলেন, ওরাও উদ্বাস্ত। ওরা হাত

দুটো পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছে, আর ঠোঁটে বিগলিত হাসি। ওদের চুল অপরিচ্ছন্ন আর জুতো নোংরা। কাপড়চোপড় এমনিতে ঠিকই লাগছে কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ধারগুলোতে সেলাই খুলে গেছে, কুঁচিগুলো জীর্ণ। আর যেখানেই ওরা যায়, এক চিলতে জায়গার জন্য হা-পিত্যেশ ওদের পিছু নেয়, তাই লাল বাতি জ্বললেও রাস্তা পার হতে ওরা ভুলে যায়, অথবা চায়ে দুধ বেশি দিয়ে দেয় বা পত্রিকার পাতায় ডুবে গিয়ে ফিসফিস করে, দেশের খবরের জন্য পিপাসার্ত চাতকের মতো তাকিয়ে থাকে। রেহানা বুঝলেন ওদের দিকে তাকিয়ে থাকা তিনি আর সইতে পারছেন না। তিনি ভয় পেলেন। ওদের মধ্যে তিনি হয়তো নিজেকেই দেখবেন আবার হয়তো নিজেকে দেখবেন না। তিনি আলাদা হতে চাইলেন। আবার একই সঙ্গে ওদেরই মতো, কোনো চাওয়াই তাকে মুক্তি দিল না, আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে থাকা হারানোর অনুভূতি থেকে আর গোথাসে গিলে ফেলা ক্ষুধার্ত ভালোবাসা থেকে।

‘মায়া, এসো, তোমার চুল কেটে দিই,’ রেহানা বললেন।

আবার রাত নেমেছে, আর ওরা ঘুমানোর আয়োজন করছে। রেহানা ওদের চিলেকোঠার ভেতরটা গুছিয়ে মেঝে মুছলেন। মায়ার কাপড়ে মধ্যদুপুরের সূর্যের গন্ধ। সেগুলো ভাঁজ করে টেবিলের ওপর গুছিয়ে রাখলেন। জানালা খোলা ছিল আর সেখানে বাতাসের মৃদু আভাস।

‘আমার চুল ঠিকই আছে,’ মায়া বলল। ওর প্রথম প্রবৃত্তি হলো সবসময় সবকিছুতে না বলা। ‘কেন, আমার চুলে কি সমস্যা?’

‘কোনো সমস্যা নেই। আমি শুধু আগাগুলো ছেঁটে দিতে চাই। অবস্থা দেখো’—রেহানা বললেন, বেণির আগায় ফেটে যাওয়া চুলগুলো দেখালেন। ‘আমি কেবল চুল সমান করে দেব।’

‘তুমি জানো কীভাবে চুল কাটতে হয়?’

‘হ্যাঁ, জানি তো। আমার বোনরা আমাকে দিয়েই চুল কাটাত।’ এই এখানে, এই কলকাতায়। বাবার চুলও কাটতাম, যখন আমরা ফতুর হয়ে গেলাম আর নাপিতের কাছেও বাকিতে কাজ করার উপায় ছিল না।

‘সত্যি? তাহলে আমাকে যে কখনো কেটে দাওনি?’

‘তুমি কখনো আমাকে তোমার চুলের ধারে কাছাকাছিও যেতে দিতে না! সোহেলেরটা তো কাটতাম।’

মায়া মুখ বাঁকিয়ে হাসল। ‘হ্যাঁ, এখন আমার মনে পড়ছে। আমি সবসময় ভাবতাম ও তোমার প্রিয় বলে ওরটা কাটো।’

‘না, তুমি বেশি জেদি বলে তোমারটা কাটা হতো না।’

‘ঠিক আছে তাহলে, দেখি তুমি কী করতে পারো।’

মগভর্তি পানি আর কাঁচি নিয়ে রেহানা তৈরিই ছিলেন। তিনি মায়ার চুলের বেণির ফেটে যাওয়া আগা পানিতে ডোবালেন। তারপর বেণিটা খুলে চুল আঁচড়াতে শুরু করলেন।

‘কেমন জট পাকানো!’ তিনি বললেন, ‘চুলের অবস্থা কাহিল!’

‘নাপিতের কাছ থেকে কোনো রকম ধারা বর্ণনা আমি শুনতে চাই না, প্লিজ!’ রেহানা মায়ার মাথা টেনে নিলেন আর কাঁচির কাজ শুরু হলো। ‘নড়াচড়া করবে না’—তিনি বললেন, ‘তাহলে কিন্তু সমান হবে না।’

অর্ধচন্দ্রের মতো কাটা চুলের অংশ মেঝেয় এসে পড়ল। ‘মায়া, ডাক্তারের প্রস্তাব আমি ভেবে দেখলাম...হয়তো সে-ই ভালো হবে।’

‘সত্যি মা, তোমার ইচ্ছা না হলে করতে হবে না।’ সে ঘুরে রেহানার মুখোমুখি হলো।

‘মাথা স্থির রাখো’—রেহানা ঠেলে ওর মাথা আবার সোজা করে দিলেন। ‘সারা দিন আমার এখানে কিছুই করার থাকে না।’

‘সরি মা, আমি জানি, ...এত ব্যস্ত থাকি।’

‘তোমার তো অনেক কাজ। আমারও যদি কিছু করার থাকে তাহলে ভালোই হবে। এখানে আমার আসার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে।’ মায়ার দুই পাশের চুল টেনে এনে একসঙ্গে করে রেহানা দেখলেন কাটা সমান হলো কিনা। ‘হয়ে গেছে’—তিনি বললেন, ওর কাঁধে চাপড় দিলেন, ‘চুল কাটা শেষ।’

‘যুদ্ধ খুব জলদি শেষ হবে’—মায়া বলল, ‘এখানে আমাদের বেশি দিন থাকতে হবে না।’



কারণ খুঁজে পেতে রেহানার সেক্টেম্বর পর্যন্ত লাগল। তিনি ডাক্তার রায়ের পিছু পিছু হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরছিলেন, নতুন রোগীদের বিরূপ লিখছিলেন, ওদের ওষুধ, ব্যবস্থাপত্র—এসব। ওরা সারি বাঁধা বিছানার শেষ প্রান্তে এলো, যেখানে শুয়ে ছিল একজন মহিলা, যাকে রেহানা আগে দেখেননি। একটা কাঁথা মুখের প্রায় পুরোটাই ঢেকে ফেলেছে, কিন্তু ওর কপাল আর ওর লম্বা চুল দেখা যাচ্ছে, হাতে শাঁখা আর পলা পরা।

‘ইনি কে?’ রেহানা জানতে চাইলেন। বিজ্ঞানী ওর শুয়ে থাকার ভঙ্গির মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল, যার জন্য রেহানা ওর মুখ দেখতে চাইলেন।

‘আমি ঠিক জানি না,’ ডাক্তার রাও বললেন। ‘আমার মনে হয় না একে আমি আগে দেখেছি।’

রেহানা কাঁথা সরিয়ে বন্ধ এক জোড়া চোখ দেখলেন, মুখ ফ্রেমবন্দি করে আছে শণের মতো প্যাঁচানো চুল। তিনি এই মহিলাকে চেনেন। ‘সুপ্রিয়া।’ ও নিশ্চয়ই সুপ্রিয়া হতে পারে না। ও-ই কি? তিনি আবার দেখলেন। অবশ্যই, অবশ্যই সুপ্রিয়া। এ রকম ঘটনা এত সহজে ঘটে যায় আজকাল। ‘ও আমার বান্ধবী, মিসেস সেনগুপ্ত,’ রেহানা বললেন, ‘ঢাকার...।’

ডাক্তার রাও সুপ্রিয়ার চুড়ি পরা হাত তুলে তাঁর বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে চেপে ধরলেন, ওর চোখ হাতঘড়ির দিকে। ‘চাচি, আপনি এখানেই থাকেন। দেখি কে ওর চিকিৎসা করছে আমি খুঁজে বের করতে পারি কিনা।’

‘ওর স্বামী নিশ্চয়ই ওকে এখানে নিয়ে এসেছে। দেখুন তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। নাম মি. সেনগুপ্ত।’

রেহানা কাঁথা সরিয়ে দিলেন। সুপ্রিয়ার শাড়ি ওর হাঁটুর কাছে জড়ো হয়ে আছে। হাঁটু নীরক্ত আর খসখসে। রেহানা শাড়িটা নিচে টেনে পা দুটো ঢেকে দিলেন। ঝড়ে উপরানো গাছের মতো দেখাচ্ছে ওকে।

‘তোমার কী হয়েছে?’ রেহানা ফিসফিসিয়ে বললেন। সুপ্রিয়ার মাথা উঁচু করে ধরে তিনি ঘাড় থেকে ভেজা চুলগুলো সরালেন। দেখলেন, ওর চোখের পাতা কেঁপে উঠল, যেন ও স্বপ্ন দেখছে, আর তারপর খুব ধীরে ও চোখ খুলল, প্রথমে ছাদের দিকে দৃষ্টি মেলল আর তারপর ধীরে ধীরে রেহানার মুখের দিকে তাকাল।

‘সুপ্রিয়া?’

ও রেহানার দিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে রইল। মুখটা সামান্য খুলল। ওর ঠোঁট দুটো কালো।

‘তোমার কী হয়েছে? মিথুন কোথায়?’ কিন্তু এরই মধ্যে ওর চেহারা ভাবলেশহীন হয়ে পড়েছে।

ডাক্তার কয়েক মিনিট পর ফিরে এলেন। হাতে রক্তচাপ মাপার যন্ত্র আর এক ব্যাগ স্যালাইন। ‘এখানে ও একাই এসেছে মিসেস হক। ওর পরিবারের আর কাউকে কেউ দেখেনি।’

‘এটা হতে পারে না। ওর স্বামী আর এক ছেলে আছে। ওদের ছাড়া তো ও এখানে একা আসতে পারে না।’

পরদিন রেহানা যখন ওয়ার্ডে গেলেন, সুপ্রিয়াকে যেমনি রেখে গিয়েছিলেন ঠিক সেভাবেই পেলেন, বিছানায় লেপ্টে আছে, শাড়ি হাঁটুর কাছে উঠে এসেছে প্রায়। কিন্তু তিনি জেগে ছিলেন। রেহানা ওর কপালে হাত বুলিয়ে দিলেন। কপালে কোনো আগুন লাল টিপ নেই, কোনো সিঁদুর নেই।

দুপুরটা সুপ্রিয়ার পাশে বসে কাটিয়ে দেয়া রেহানার রপ্ত হতে শুরু করল। চুলে নারকেল তেল দিয়ে বিলি কেটে দেয়া, তারপর ছোট চৌকো সাবানে মাথা ধুইয়ে দেয়া, যে সাবান তিনি থিয়েটার রোডের বৃদ্ধ ভদ্রলোকের দোকান থেকে

কিনেছিলেন। তিনি তাঁর নখ কেটে দিতেন, কনুইয়ে ক্রিম মাখিয়ে দিতেন। রেহানার বান্ধবী কেবল চোখ দিয়ে তাঁকে অনুসরণ করতেন, কিন্তু এত কিছুই পরও কোনো কথা বলতেন না। একটা ছোট বাঁশের লাঠি তিনি বালিশের নিচে রাখতেন, এছাড়া নিজের বলতে ওর আর কিছু ছিল না।

ইকবালের কবরের পাশে বসে থাকার চেয়ে এটা তেমন আলাদা কিছু নয়। কখনোই কোনো জবাব নেই, কিন্তু তিনি কল্পনা করতেন যেন সুপ্রিয়া তাঁকে শুনতে পাচ্ছে।

‘তোমরা চলে যাওয়ার পরে অন্য অনেকেই চলে গেল। ক্লাব বন্ধ হয়ে গেল আর বাজারও প্রায় ফাঁকা হতে লাগল। অনেক ছেলে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে ঘর ছাড়ল। সোহেল যেতে চেয়েছিল, আমি বললাম, না।’

মাঝে মধ্যে, ইকবালের সঙ্গেও তাই ঘটে, মিথ্যা বলতে বা বাড়িয়ে বলতে লোভ হয়।

‘কিন্তু তা সত্ত্বেও সোহেল চলে গেল। ও কত বদলে গেছে তুমি বিশ্বাসই করতে পারবে না। আর সিলভি। আমরা যে মেয়েটাকে চিনতাম তার সঙ্গে এখনকার সিলভির কোনো মিলই তুমি পাবে না। ওই ছেলেটাকে বিয়ে করতে দেয়া আমাদের উচিত হয়নি। ছেলেটার সঙ্গে আমার আবার দেখা হয়েছিল, জানো, কিন্তু একেবারে অন্য রকম পরিস্থিতিতে।’

সুপ্রিয়ার কাছ থেকে কিছু কথা তিনি গোপন রাখলেন। যেমন-সাবিরের ধরা পড়ার বিষয়ে প্রতিটি খুঁটিনাটি। ওর মন বিষণ্ণ করতে চাইলেন না। আর মেজরকে নিয়েও কিছু বললেন না। ব্যাপারটা ও কীভাবে নেবে তিনি জানতেন না। ‘আমি এক অচেনা লোককে ভালোবাসলাম।’ এই নিয়ে কথা বলার মানে হচ্ছে কোনো যুক্তি বা কারণ দেখানো। কিন্তু কোনো কারণ তো নেই। এ ব্যাখ্যাভীত এক বিষয়। এমনকি তিনি তাঁকে ঠিকমতো চেনেনও না। কখনো-সখনো তিনি অবাক মানেন যে আসলে মেজর সম্পর্কে কত কম জানেন। যেমন, ওর কোনো ভাই বা বোন আছে কিনা। অথবা যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ওর ভাবনা কী, ও কী করবে। রেহানা ওকে জিজ্ঞেসও করেননি কখনো বা, আদৌ ওর সঙ্গে আবার দেখা হবে কিনা—তাও জানেন না।

বিকেলে, সুপ্রিয়া যখন ঘুমাত, রেহানা ডাক্তার রাওয়ের সঙ্গে হাসপাতাল টহল দিতেন। অন্য আর কয়েকজন মহিলার সঙ্গে তার পরিচয় হলো, তাঁদের বিছানার পাশে একটু দাঁড়াতে আর ওরা যখন এখানে আসার কাহিনী তাঁকে বলত তিনি ওদের হাত ধরে চুপ করে শুনতেন। ওরা তাকে জানতে গুরু করল। তাকে আপা বলে ডাকত। প্রতিদিন ওরা যুদ্ধের নতুন সব গল্প বলত। রেহানা সোহেলের চিঠির অপেক্ষা করতেন। রেহানা মেজরের চিঠির অপেক্ষা করতেন। কারোটাই এলো না।

মুকুলের সঙ্গে ট্রাকে করে চলা রেহানার অভ্যাস হয়ে গেল, অক্টোবরের মধ্যে চিলেকোঠায় বসবাস ভালোই লাগতে শুরু করল। তিনি দরজা খুলে ছাদের কিনারে বসে থাকতেন, সন্ধ্যা নামা দেখতেন আর শহর কত সহজে গোধূলিতে প্রবেশ করে তা-ই দেখতেন। সেই স্থলকায়া মহিলাকেও ক’দিন পরপর দেখা যেত, হলুদ শাড়ি ঝেড়েঝুড়ে নেড়ে দিচ্ছে।

প্রতিদিন সেই একই রকম। সুপ্রিয়া এখনো একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি। ‘তুমি কি কিছুই বলবে না সুপ্রিয়া? কী হয়েছে আমাকে বলো? তোমাকে আমি হয়তো কোনো সাহায্য করতে পারব।’

এক রাতে রেহানা ছাদে বসে সাদা পেটিকোটের ছিঁড়ে যাওয়া ধারটা সেলাই করছেন। এত দিন থাকার জন্য যথেষ্ট কাপড় তিনি আনেননি, আর যা এনেছিলেন সেগুলো ছিঁড়তে শুরু করেছে। যখন তিনি সুইয়ে সুতো ঢোকাচ্ছেন, হঠাৎ করেই একটা বুদ্ধি তাঁর মাথায় এলো, সুপ্রিয়া যখন কথা বলতে চায় না, হয়তো ও লিখতে রাজি হতে পারে। সেদিনটার কথা মনে পড়ল, যেদিন সুপ্রিয়া তাঁকে *সুলতানার স্বপ্ন* সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল। তিনি পেটিকোটটা সরিয়ে রাখলেন আর নিচের তলায় গেলেন মায়ার কাছে একটা খাতা বা কয়েকটা ছেঁড়া পাতা চাইতে। রেহানা পরদিন ক্যাম্পে গিয়ে সুপ্রিয়াকে কাগজগুলো দিলেন, সঙ্গে একটা চোখা পেন্সিল।

সুপ্রিয়া বিছানা থেকে একটু উঁচু হলেন। সজোরে মাথা নাড়লেন।

রেহানা খাতার দিকে দেখালেন। ‘এটা তোমার জন্য।’

কয়েক দিন আগে রেহানা বলেছিলেন, ‘তুমি কি জানো, আমি কীভাবে আমার বাচ্চাদের হারালাম?’ সুপ্রিয়াকে আদালত আর জজ সাহেবের কথা বললেন, আর বললেন কীভাবে তিনি নিজেকে বঞ্চিত করে এই কষ্ট বরণ করেছিলেন। ‘কিন্তু ওদের আমি ফিরে পেয়েছি। তুমিও মিথুনকে খুঁজে পাবে। আর সেনগুপ্ত বাবুকেও।’

রেহানা নিঃসন্দেহ ছিল যে ওরা নিশ্চয়ই একে অপরকে খুঁজিয়ে ফেলেছে। ওরা হয়তো ছোট্টাছুটি করে কোথাও যাচ্ছিল আর সুপ্রিয়া ওদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সেনগুপ্ত বাবু নিশ্চয়ই ওকে এখন হস্পিটালে নিয়ে খুঁজছেন, সেজন্যই, ক্যাম্পে নতুন কে কে এলো তা জানতে রেহানা প্রায়ই নিবন্ধন খাতা দেখে আসে। রেহানা দিব্য চোখে দেখতে পায় সেনগুপ্ত বাবু প্রতিটি উদ্বাস্তু শিবিরে গিয়ে পাগলের মতো খুঁজছেন, প্রতিটি ট্রেন স্টেশন, হাসপাতাল, ...তার স্ত্রীর তালাশে। ওরা যদি ধৈর্য ধরে, নিশ্চয়ই একে অপরকে খুঁজে পাবে।

পরদিন সকালে রেহানা ক্যাম্পে ফিরে গেলে, সুপ্রিয়া খাতাটা তুলে ধরলেন।

তিনি কয়েক ছত্র লিখেছেন। ‘আমি ধানক্ষেতের ভেতরে ঢুকলাম,’ এতে লেখা। ‘ডোবার মধ্যে।’ ও বালিশের নিচ থেকে বাঁশের লাঠিটা টেনে বের করল আর নিজের মুখের ওপর রাখল। ‘ওকে ফেলে এলাম,’ সুপ্রিয়া লিখল।

‘এর মানে আমি বুঝতে পারছি না, সুপ্রিয়া,’ রেহানা বললেন। অনাহৃতভাবেই একটা ছবি তার চোখে ভেসে উঠল, সুপ্রিয়া কাদামাটির চোরাবালিতে ডুবে যাচ্ছে।

খাতার পাতার ওপর ওর হাত খুব ধীরে নড়ছে। একটা বাক্য শেষ করলেন, কেটে দিলেন, তারপর আবার লিখলেন। মনে হলো অনেক সময় কেটে গেছে, ...ও খাতাটা আবার রেহানার হাতে দিল। ‘আমি ওকে ফেলে পালিয়ে এলাম আর ঝাঁপিয়ে পড়লাম পুকুরে।’

এটা সত্যি হতে পারে না। এভাবে ঘটতেই পারে না।

‘তোমরা কি আলাদা হয়ে গেছিলে?’

আবার ও তার ধীর আঁকাবুঁকি শুরু করল, ওর আঙুলগুলো জড়িয়ে যাচ্ছে। ‘ওর কথা আমি ভাবলাম না, শুধু দৌড় দিলাম।’

‘সেনগুপ্ত বাবু?’ রেহানা জিজ্ঞেস করল। ও এরই মধ্যে কিছু লিখেছে আর সেদিকে দেখাচ্ছে। ‘ওরা ওকে গুলি করেছে।’

আর তিনি সহ্য করতে পারলেন না। ‘সুপ্রিয়া একটু বিশ্রাম নাও, আমি খাবার নিয়ে দুপুরে আবার আসছি।’

মিসেস সেনগুপ্ত ওর খাতাটা আঁকড়ে ধরলেন।

‘সত্যি,’ তিনি লিখলেন, ‘সত্যি সত্যি সত্যি।’ তিনি চোখ বন্ধ করলেন।

রেহানা ওকে সেভাবেই রেখে চলে এলেন, কালো ঠোঁট আর মাথাটা সামনে-পেছনে কেবলই ঝাঁকাচ্ছেন।

রেহানা কী বলবেন জানেন না। তিনি ভয় পেলেন, যদি কোনো অভিযোগ ওর ঠোঁট দিয়ে বেরিয়ে আসে বা তিনি যদি এও বলে যেন সব ঠিক হয়ে যাবে বা তিনি বুঝতে পেরেছেন। ঘটনাটা কল্পনা করতে যত চেষ্টাই করেন না কেন, তবুও যখন ভাবেন যে সুপ্রিয়া ওর ছেলেকে মৃত্যুর মুখে রেখে পালিয়েছে, তিনি বিতৃষ্ণা অনুভব না করে পারেন না। কিছু একটা নিশ্চয়ই করা যেত। সবসময়ই কোনো না কোনো পথ খোলা থাকে। মিথুনকে ছিন্তা নিয়ে যেতে পারতেন। অথবা মিথুন আর ওই সেনাদের মাঝখানে অস্তিত্ব দাঁড়ানো যেত। আর এখন মিথুন কোথায় আছে এটা না জেনে বেঁচে থাকার ভার তিনি কীভাবে বইবেন, ...হয়তো হারিয়ে গেছে, অচেনা কারও সঙ্গে আছে অথবা আরও খারাপ কোনো কিছু।

পরদিন রেহানা মিসেস সেনগুপ্তকে এড়িয়ে গেলেন। তারপরের দিনও তাঁকে

দেখতে গেলেন না। এক সপ্তাহ কেটে গেল, এসব ঘটনা তিনি মন থেকে সরিয়ে
চেপ্টা করছেন আর তখনই টেলিগ্রামটা দেখতে পেলেন। সব ভোর হয়েছে,
মায়ার জিনিসপত্রের মধ্যে সেফটিপিন খুঁজতে গিয়ে টেলিগ্রামে তার চোখ আটকে
গেল, তারিখ ১৬ অক্টোবর ১৯৭১। দুই দিন আগে।

সাবির ডেড স্টপ ট্রাইড আওয়ার বেস্ট স্টপ
কুডস্ট সেভ স্টপ গড ব্লেস মিসেস সি.

টেলিগ্রামটা পরিপাটি করে ভাঁজ করলেন রেহানা, ধারগুলো যেন সমান থাকে
নিশ্চিত করলেন। হঠাৎই খুব অবসন্ন লাগল তার আর ভেতর পর্যন্ত দুলে উঠল,
আঙুলগুলো কাঁপছিল, কিন্তু তিনি ভাঁজ করেই চললেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তা ছোট
কাগজের টুকরোয় পরিণত হয়, যেটা তিনি ব্লাউজের ভেতর গুঁজে রাখতে
পারবেন, ভাঙতি পয়সার মতো। সল্ট লেক যাওয়ার পুরো রাস্তা রেহানা টের
পেলেন তাঁর বুক ধড়ফড় করছে। সেই ভয়ানক রাতের কথা তাঁর মনে পড়ল,
যখন তারা আঁধার চিরে বাড়ি ফিরছিলেন আর তিনি সাবিরকে আষ্টেপৃষ্ঠে ধরে
ছিলেন; সাবিরের খেতলানো হাত দুটো তাঁর বুক জড়ানো ছিল। তারপর তাঁর
ভাবনা সিলভি পর্যন্ত গড়াল, আর মিসেস চৌধুরী, আর রোমিও যে
নারকেলগাছের নিচে মাটিতে মিশে যাচ্ছে আর তাঁর সমস্ত শরীর বাড়ি ফিরে
যাওয়ার তাড়নায় জ্বলছিল, আবার বাংলাতে, আবার সোনায়।

বাড়ির ভাবনায় মিসেস সেনগুপ্তও মাথায় এলো। সবকিছু সাজ হওয়ার পর
সুপ্রিয়া কোথায় যাবে? রেহানা সিদ্ধান্ত নিলেন ওর কাছে যাওয়ার, ওকে সত্যি
কথাটা বলা যে, তিনি বুঝতে পারেন না কেমন করে একজন মা নিজের
জীবন বাঁচাতে ছেলেকে ফেলে পালিয়ে আসতে পারে, আবার এও সত্য যে এর
বিচার করার তিনি কেউ নন। এটা ওর সঙ্গে ওর সৃষ্টিকর্তার বোঝাপড়া। তিনি
শুধু ওর বন্ধু।

ওয়ার্ডে রেহানা ডাক্তার রাওয়ের সঙ্গে তাঁর দৈনন্দিন সাক্ষাতের অপেক্ষায়
রইলেন। ওর আঙুলের কাঁপুনি ছড়িয়ে পড়ছিল পুরো হাত, ঠাণ্ডা শিরশিরে ভাব।

ডাক্তার এলেন, তাঁর দীর্ঘ পায়ের দ্রুত পদক্ষেপে, সবসময়ের মতো ঘড়ির
কাঁটা মেপে।

‘আজকের নামের তালিকা কি দেখেছেন? রেহানা জানতে চাইলেন।

‘হ্যাঁ চাচি, আমি দেখেছি।’

‘তো?’

‘ছিল না, আমি সরি।’ তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। প্রতিদিন এই কথার ভেতর

দিয়ে ওদের যেতে হয়। ‘চাচি, আমি জানি ও আপনার বন্ধু, কিন্তু এর চেয়ে বেশি কিছু আমাদের করার নেই।’

‘কিন্তু ওর ছেলে হারিয়ে গেছে... আমরা জানি, ঠিক কোথায় ওকে শেষ দেখা গেছে। আমাদের খোঁজ চালিয়ে যেতে হবে। আমাকে কথা দিন আপনি খোঁজ থামাবেন না।’ তিনি যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন, মেঝে ওর পায়ের নিচে টলে উঠল। রেহানা হুমড়ি খেয়ে শরীরের সব ভার নিয়ে ডাক্তারের হাতের ওপর ঢলে পড়লেন।

‘চাচি, আপনি ঠিক আছেন?’

‘হ্যাঁ, আমার হয়তো কিছু মুখে দেয়া উচিত—সারা সকাল খাইনি।’

‘রান্নাঘরে অবশ্যই কিছু পাবেন। আমি কি আপনাকে নিয়ে যাব?’

‘না, লাগবে না। অত চিন্তার কিছু নেই। লিস্ট—আরেকবার দেখেন? সাবির মুস্তফা। না মানে, ...মিথুন। মিথুন সেনগুপ্ত। পুরো নাম আপনার কাছে আছে তো, না?’

‘হ্যাঁ, চাচি।’

রান্নাঘরে যাওয়া অবধি রেহানার মাথার ভেতরটা ঘুরপাক খাচ্ছিল। এত দিনে হাসপাতালের হই-হুল্লোড়ে তিনি অভ্যস্ত হয়ে গেছেন আর অগ্রাহ্য করতে শিখেছেন কেমন করে করিডোরে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকা গাদাগাদি মানুষের বিপর্যস্ত চেহারাগুলো আমল না দিয়েও চলতে হয়। কিন্তু এখন তার মাথার ভেতর জলস্রোতের মতো তোলপাড় চলছে। মুখের ওপর হাতটা চেপে তিনি তগু নিশ্বাস অনুভব করলেন। আমার বসা দরকার, নিজেকে বললেন। এক মুহূর্তের জন্য। যখন মায়া এসে তাঁকে ধরল, তিনি তখন একটা খালি চেয়ারের খোঁজে পুরো ঘরটা নজর করছেন।

‘আম্মু, তোমার কী হয়েছে?’

‘কিছু না, জান, একটু কাহিল লাগছে।’ এক পলকা কাঁপুনি তার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। ‘টেলিগ্রামের কথা আমাকে বলোনি কেন?’

‘আম্মু, আসো কোথাও বসি।’

‘হ্যাঁ।’ মায়া রেহানার হাত শক্ত করে ধরল। হাসপাতালের সীমিত প্যাশ কাটিয়ে ওরা পথ করে নিল। যাওয়ার সময় কয়েকজন মহিলা বেছুরীকে দেখে হাত নেড়ে চোঁচিয়ে ডাকলেন, ‘আপা!’ রেহানার কানে তা বুদ্ধির তোলা প্রতিধ্বনির মতো শোনাল।

‘মায়া জান, আমার শরীর ভালো লাগছে না,’ তিনি অস্ফুটে বললেন। মায়া এখন তার সামনে মানুষজনকে ঠেলে দুই পাশে সরিয়ে দিচ্ছে। ‘একটু যেতে দেন, প্রিজ!’

মায়ার শক্ত মুঠো গলিয়ে রেহানা পিছলে গেলেন। হাসপাতাল-ঠাসা মানুষ

তাঁর দিকে এগিয়ে এলো, আর তিনি নিজেকে এলিয়ে দিলেন তাদের হাতে—আজব, ঠাণ্ডা হাতগুলো তার কাঁধ আঁকড়ে ধরল, টেনে তুলল, হাত দুটো মাছের পাখনার মতো তুলে ধরলো এবং তারপর ঘোর অন্ধকার।

জগদ্দল পাথরের মতো ঘুমের ঘোরের ভেতর রেহানা আসা-যাওয়া করছিলেন, ওর গলা প্রশ্নের ভারে বুজে এলো। তিনি সাবিরকে স্বপ্নে দেখলেন, ওর ফাটা ঠোঁটগুলো আবোল-তাবোল বকছে, আর মিথুন, জলের গভীর থেকে সোহেলের চেহারা নিয়ে মায়ের জন্য কেঁদে আকুল হচ্ছে। ‘মা’, তিনি শুনতে পেলেন সোহেল বলছে, ‘মা, আমি এখানে।’ জেগে উঠে তিনি নিজের গালে হাত বুলালেন, এখনও তপ্ত হয়ে আছে। তবে কাঁপুনি থেমে গেছে, কেবল হাতে-পায়ে ব্যথার তীব্র প্রবাহ।

তিনি পায়ে পা ঘষলেন, কেমন মাখনের মতো মোলায়েম, গোড়ালিগুলো পর্যন্ত। কেউ বুঝি মালিশ করেছে। পাশ ফিরতে এক ঝলক জবাকুসুম তেলের গন্ধ নাকে এসে লাগল।

‘আমার চুল...’

‘মিসেস সেনগুপ্ত ধুয়ে দিয়েছেন,’ এক লোকের গলা শুনতে পেলেন। ‘কারও সঙ্গে কথা বলে না, শুধু সেবা দিয়ে যায়। আর আপনার পা-ও মালিশ করে দিয়েছে।’ গলায় ওর শীতে ধরা কাঁপুনি।

তাঁর মনে হলো তিনি কি স্বপ্ন দেখছেন, নাকি। ‘সোহেল?’

ও ঝুঁকে এলো যাতে রেহানা সত্যি করে দেখতে পারে যে এ আসলেই সোহেল।

‘কখন এসেছ?’

‘আমি তো এমনিতেই আসছিলাম—তুমি আমার চিঠি পাওনি? কয়েক দিন ধরে তুমি ঘোরের মধ্যে আছো।’

‘কী হয়েছে আমার?’

‘জড়িস। ডাক্তার রাও বললেন হয়তো কয়েক সপ্তাহ ধরেই তুমি জড়িসে ভুগছ কিন্তু বুঝতে পারোনি। এই রোগ খুবই ছোঁয়াচে, তাই সবাইকেই এখন পরীক্ষা করতে হবে।’

‘মায়া?’

‘ও ভালো আছে।’

রেহানার মনে কত যে প্রশ্ন, কিন্তু শব্দগুলো শুধুই বলার শক্তি তাঁর ছিল না, এতটাই ক্লান্ত। ‘আমার হাত ধরে থাকো, কেবল এতোটুকু বলার জোর তিনি খুঁজে পেলেন। আবার তলিয়ে যাওয়ার আগে সোহেলের হাত দুটো চোখে পড়ল, রোদে পোড়া, উজ্জ্বল, তাঁর বিছানা হাতড়ে বেড়াচ্ছে।

‘আমি একটা দায়িত্ব নিয়ে এসেছি আম্মু,’ পরদিন রেহানা তাকে বলতে শুনলেন। হাতে করে ওর জন্য ডাব নিয়ে এসেছে আর উপরটায় ত্রিকোণ ছিদ্র, সেখানে মুখ লাগিয়ে তিনি ধীরে ধীরে ডাবের পানি খেয়ে নিলেন। ‘আমরা বিদ্যুতের গ্রিড বিচ্ছিন্ন করে ফেলব।’

ডাবের পানি দুধেল আর মিষ্টি। ডাবের ভেতর আঙুল ডুবিয়ে এক ফালি শাঁস টেনে বের করলেন। মুখভর্তি দাড়ির মেঘ ঠেলে সেখানে হাসি ফুটলো। ও যে কত সুন্দর রেহানা তা লক্ষ্য না করে পারলেন না, আর কত জীবন্ত, খবরটা দেয়ার সময় ওর চোখ দুটো স্কুলিঙ্গ ছড়াল।

‘সারা শহরে নিকষ অন্ধকার নেমে আসবে। আম্মু, বাগান খুঁড়ে আমরা সব অস্ত্রপাতি বের করব। আমাদের ঢাকায় ফিরে যেতে হবে।’

‘আমরা কী করব?’

‘তোমরাও যাবে। তোমাকে বাড়ি নিয়ে যেতেই তো এলাম। আর মায়েকে।’ বাড়ি। আকাশে দুই হাত ছুঁড়ে দিয়ে আনন্দে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছা হলো তাঁর।

‘কোনো বিপদ হবে না তো?’

‘প্রায় দুই মাস হলো তুমি এখানে এসেছ আর আমরা বাড়ির ওপর কড়া নজর রাখছিলাম—আমাদের মনে হয় না কেউ কিছু জানে।’

‘সাবির মারা গেছে।’

‘আমি জানি।’ তার মুখ দেখে কিছুই বোঝা গেল না—কোনো স্বস্তি, কিংবা লজ্জা।

‘মা, ওর মৃত্যু অর্থহীন হবে না। আমরা অনেক কিছু অর্জন করেছি, ...এই তো মাত্র গত সপ্তাহে পাক আর্মিকে আমরা কুমিল্লায় তাদের মজুত চলাচলের রাস্তা থেকে হটিয়ে দিয়েছি।’

‘আমাদের কি জয় হবে?’ এই প্রথম রেহানা ওকে প্রশ্নটা করলেন।

সোহেল বলতে যাচ্ছিল, ‘হ্যাঁ, অবশ্যই।’ কিন্তু তিনি ওর হাতে দুর্বল চাপ দিলেন যার মানে তিনি সত্যিটাই জানতে চাইছেন, আর সোহেল কিছু বলার আগে অলক্ষণ থামল, ‘অসম্ভব না।’ মুহূর্তক্ষণ অপেক্ষা করল, তারপর বলল, ‘আমাদের সংখ্যা কম, অস্ত্র কম, যোদ্ধা কম। কিন্তু তারপরও মাঝে মধ্যে আমরা ওদের হারিয়ে ভূত বানাচ্ছি।’ ও আবারও ওর মেঘ-মেদুর হাসি হাসল আর বলল, ‘আমি শেষের বাঁশি শুনছি মা। সুরের ছোঁয়ায় মধুগন্ধভরা সমাপ্তি।’

রেহানা আবার যখন চোখ খুললেন, সুপ্রিয়া তাঁর পায়ে কাছ বসে—খ্রিয়মাণ স্বর্গীয় আভায় ওর মুখ বোবা আর নিশ্চল। আজ পরিষ্কার শাড়ি আর চপ্পল পরেছেন। ওর তেল চকচকে চুলে আঁটো করে বেগি বাঁধা।

‘এখন আমি বিছানায় পড়ে আছি, দেখ।’ রেহানা বললেন।

হাসির আভাস সুপ্রিয়ার ঠোঁট ছুঁয়ে ছিল।

‘কী হয়েছে তোমার,’ রেহানা জিজ্ঞেস করতে চাইলেন। তার বদলে তিনি বললেন, ‘তুমি আমার চুল ধুয়ে দিয়েছিলে?’

সুপ্রিয়া মাথা নোয়ালেন কিন্তু কিছু বললেন না। পায়ের কাছে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় রইলেন। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল বোঝাপড়ায়। ‘আমি ঢাকায় ফিরে যাচ্ছি,’ রেহানা শেষ পর্যন্ত বললেন। ‘তুমি আসো না আমার সঙ্গে? যুদ্ধ খুব শিগগিরই শেষ হবে। সবকিছু ঠিক আগের মতো হয়ে যাবে। তুমি সোনায় থাকতে পারবে—আমরা আবার পড়শি হবে। অথবা বাংলাতে আমরা একসঙ্গে থাকতে পারি। ৫ নম্বর রাস্তা মনে আছে? মিসেস চৌধুরী ও আমাদের তাস খেলার বন্ধুদের—ওরা সবাই তোমাকে দেখতে চায়।’ রেহানার গলা খরখরে হয়ে উঠল। ‘ওটা তো তোমারও বাড়ি। চলো আমাদের সঙ্গে।’

কথা বুঝতে পারার কোনো আভাসই মিসেস সেনগুপ্ত দিলেন না। চোখ দুটো রেহানার মুখের ওপর স্থির রেখে আঙুল দিয়ে কাচের চুড়ি নাড়াচাড়া করছেন, একবার কনুইয়ের দিকে তুলছেন আবার ছেড়ে দিচ্ছেন। তারপর তিনি বিছানার পাশ ধরে হাঁটলেন, রেহানা হাত বাড়িয়ে ওর হাত ধরে ফেললেন। সুপ্রিয়ার হাতের চামড়ার নিচে রক্তের দাপানি তিনি টের পেলেন। সেই মুহূর্তে তিনি নিশ্চিত হলেন যে এই কাচের চুড়িগুলোই ওর বন্ধুকে বাঁচিয়ে রেখেছে, ওর কবজির নিচে ধমনির মতো।

সুপ্রিয়া বিছানার মধ্যে মুখ ডুবিয়ে দিলেন। রেহানা ভাবলেন, ও বোধহয় তাঁকে কিছু বলতে চাইছে, তিনি মাথা তোলার জন্য আশ্রয় চেষ্টা করলেন। সুপ্রিয়ার ঠোঁট রেহানার গাল ছুঁয়ে চলে গেল, একটা হালকা-পলকা ছোঁয়া রেখে গেল শুধু। তারপর তিনি উঠে পড়লেন আর চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ালেন।

রেহানা শেষ চেষ্টা নিলেন। ‘আমার সঙ্গে বাড়ি চল সুপ্রিয়া, প্লিজ।’

কিন্তু এর মধ্যেই ও চলে গেছে, কাঁধের ওপর শাড়ির আঁচল টেনে সেই কোমল আভিজাত্য নিয়ে যা রেহানা ওর সোনায় আগমনের প্রথম দিনটি থেকেই ঈর্ষা করত, ওর সেই হাতের নিচে বই আঁকড়ে ধরে উঁচু হিলের জুতোয় অনায়াস-ভঙ্গিতে হাঁটা।

নভেম্বর



তুমি নাও আমার সন্তাপ



ওরা একটা দীর্ঘ ফেরিপথ নেবে বলে ঠিক করল, রাজশাহীর সীমান্ত পার হয়ে পদ্মার নিম্ন ধারা বেয়ে, কুষ্টিয়া, পাবনা, ফরিদপুর পেছনে ফেলে। দুই দিন লেগে যাবে, ফরিদপুরে ট্রেন বদল করে বুধবার গভীর রাতে ওরা ঢাকা পৌঁছাবে। সোহেল সোনায় থাকবে। বৃহস্পতিবার দিন জয় আসবে, আর গোলাপঝাড়ের পাশে মাটি খুঁড়ে ওরা অস্ত্রপাতি বের করবে। শুক্রবার সূর্য ডোবার পর ঢাকার বিদ্যুৎ গ্রিড বিচ্ছিন্ন করে দেবে।

সোহেল, মায়া ও রেহানার বেশির ভাগ সময় কাটলো ফেরি ডেকে, স্টিমারের বাঁ দিক ঘেঁষা বেঞ্চে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসল তারা। বাতাস ওদের কানের পাশ দিয়ে শোঁ-শোঁ করে বইল, কথা বলা বা নিশ্বাস নেয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াল। যখন কথা বলল, শব্দগুলো উঠে গেল উপরে, যেখানে মেঘেরা দল বেঁধে আছে অথবা নেমে গেল নিচে যেখানে জলের প্রবল ঘূর্ণি। ওদের সামনে সমুদ্রের মতো পদ্মার বিস্তার, দুই তীর এত দূরে যে দিগন্তে ধসে ওঠে রেখার মতো তা কেবল দৃশ্যমান, এখানে-সেখানে গাঙচিলের দলবদ্ধ ওড়াউড়ি, ঢেউয়ে ভাসমান ফুটকিসম এক জেলে।

নিঃশব্দতার মধ্যে ওরা দুলছে, প্রখর রোদ ও বাতাসের হল ফোটানো উষ্ণতা থেকে বাঁচতে ওদের চোখ পিটপিট করছে।

পাবনায় পৌছে ফেরির যাত্রাবিরতি, আর মায়া খাবারের খোঁজে কাঠের পাটাতনের ওপর দিয়ে ছুটে গিয়ে ডাঙ্গায় নামল।

‘ও এখন কী করবে বলো তো?’

সিলভি। তাহলে সে ভুলে যায়নি। ‘আমি জানি না বেটা।’

‘মৃত্যুর পর কখনো কখনো কাউকে আরও বেশি করে ভালোবাসা যায়,’ ও বলল। ফেরির মেঝের ধাতব পাত স্যাণ্ডেলের মাথা দিয়ে ঘষছিল সে।

‘হ্যাঁ।’

‘কিন্তু আবার ভুলেও যাওয়া যায়।’ ও এমনভাবে রেহানার দিকে তাকাল যেন তার জানা উচিত সিলভির ভালোবাসা কোন দিকে মোড় নেবে।

‘কখনো-বা। কখনো আবার প্রতিটি স্মৃতির সাথে মিলে তা আরও গভীর হতে থাকে। কিছুই বলা যায় না।’

ফ্যাকাশে আঙুল দিয়ে ও রেলিং চেপে ধরল। ‘এমন অদ্ভুত আচরণ করছে সিলভি—মনে হচ্ছে, আমার কেমন মনে হচ্ছে, ও তলিয়ে যাচ্ছে।’

‘তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।’

‘ভাইয়া!’ মায়া ডেকের ওপর দিয়ে দৌড়ে এলো। ‘ওরা দুনিয়ার সবচেয়ে মজাদার ঝাল-মুড়ি বানাচ্ছে।’ সে কাগজের ঠোঙা-ধরা হাত বাড়িয়ে দিল।

সোহেল এক মুঠ মুড়ি মুখে পুরল। ‘উফ! এত ঝাল কীভাবে খাও?’ ঝালের চোটে জিভ বের করে ফেলল। ‘জলদি, আমাকে এক গ্লাস পানি দাও, আমি মারা যাচ্ছি।’

কেবিন থেকে ফ্লাস্ক আনতে মায়া পড়িমরি ছুটল। নদীর তীর জুড়ে সর্ব আঁচলের মতো খুপরিঘর ও বসতি পানির দিকে ঝুঁকে ছিল, যেন ভাগ্যে কী আছে সেটা তাদের জানা, প্রতি বর্ষায় প্রাবিত নিচু জমিগুলো নদী গিলে খায়, গ্রাস করে ভূমির বিশাল অংশ, পুরো আবাস ও সেখানকার সব মালামাল, রান্নার হাঁড়ি আর ছেঁড়া মশারি আর কেরোসিনের চুলো আর বিয়ের ট্রাস্ক যেখানে তিন জনম ধরে মেয়েরা তাদের সম্পদ আগলে রেখেছে আর আগামী বছরের জন্য মজুত চাল আর শুকনো মরিচ আর বাচ্চারা আর দরজার চৌকাঠ আর টিনের চাল। প্রতি বছর আবার নতুন করে গড়া, পুরোনো যেটুকু রয়ে গেল তাই নিয়ে নতুন চালা তৈরি, মাটির নতুন দেয়াল, নতুন বছরের বাচ্চা—আশায় বুক ঝেঁষে ছোট খুপরিগুলো নত হয়ে থাকে এই সত্য জেনে যে, একই ঘটনা অনিবার্যভাবে আবারও ঘটবে।

মায়া ফ্লাস্ক নিয়ে দৌড়ে এলো, হাঁপিয়ে ওঠে, লাল হয়ে গেছে। ‘ইস’, ঠাট্টা করল, ‘একটা ছোট্ট মরিচও সহ্য হয় না?’ জিজ্ঞাস্য শব্দে ফেরির ভেঁপু বেজে ওঠে তখন।

‘তোমার পেট তো লোহার গামলার মতো,’ সোহেল বলল। ফ্লাস্ক কাত করে ঢকঢক করে পানি খেল। ঘাট ছেড়ে সরে এসে ফেরি ডাইনে-বাঁয়ে দুলতে লাগল,

চলবার সাক্ষ্য হয়ে পিছু-ধাওয়া করছিল দুধসাদা ফেনার রেখা ।

‘ওখানে তোমরা কী খেতে ভাইয়া?’ মায়া জানতে চায় ।

‘যা দিত তা-ই । অনেক কিছু তুমি বিশ্বাসও করবে না । কিন্তু আমি সবসময়ই বাড়তি কিছু না কিছু মেসের বাবুটির কাছ থেকে বাগিয়ে নিতাম ।’

‘এখনো সবাইকে পটিয়ে নিজের কাজ হাসিল করো?’ মায়া বলল ।

বালকসুলভ হাসি হাসল ও, মায়াও তেমনি হাসি ফিরিয়ে দিল, আর রেহানা সহসাই ফিরে গেলেন অতীতে, যখন ওদের মুখগুলো ছিল অনেক সতেজ, বেদনা বা ইতিহাসের দায়মুক্ত ।

ফরিদপুর পৌঁছে ওরা যখন ফেরি থেকে নামল, সোহেল উবু হয়ে তীরের পলিমাটিতে চুমু খেল ।

‘তুমি কি ওর সঙ্গে কথা বলবে?’ রেহানাকে জিজ্ঞেস করল ও ।

ওরা তখন ফরিদপুর স্টেশনে, ঢাকাগামী ট্রেনের অপেক্ষা করছে ।

‘কাল গিয়ে ওর সঙ্গে আমি দেখা করব ।’

সোহেল ঘাড় গুঁজে বেরিয়ে গিয়ে ফিরে এলো এক বাব্ব সন্দেশ হাতে । মিষ্টির দোকানি বেমানান ভুঁড়ির রোগা-পাতলা মানুষ, বাব্বের ওপর লেখা হরফের সঙ্গে মানানসই গোলাপি ফিতায় সেটা বেঁধে দিল । আলাউদ্দিন সুইটমিট । গোটা দেশের মতো ফরিদপুরেও কেবল মুসলমান হালুইকররাই রয়ে গেছে ।

‘সিলভি সন্দেশ পছন্দ করে,’ সোহেল বলল, ‘ও অবশ্য গুঁড়ের সন্দেশ বেশি পছন্দ করে, কিন্তু সেটা তো শীতের আগে পাওয়া যাবে না ।’



বৃহস্পতিবার ঘুম থেকে জেগে উঠতে না উঠতেই তিনি পার্থক্যটা অনুভব করতে পারলেন । সবই আছে, ভাগ্যিস বাড়িটা আগের মতোই পরিচিত ষ্ট্রকল—সেগুন কাঠের সাবেকি বিয়ের খাট, রাত্রিছায়ার গড়ন, আলমারিতে স্যাপখলিনের ঘ্রাণ, যেখান থেকে গতরাতে তিনি টেনে বের করলেন চাদর, বালিশ, কাঁথা, ঘরমুখী দীর্ঘ ট্রেন যাত্রার পর ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলতে যার স্ততরে ডুবে গেল ওরা । সোহেলের গালে চুমু দিয়ে তিনি ওকে সোনায় পাখালেন, সেখানে মেজরের খাটে সে গুটিসুটি মেরে শুয়ে দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ল চঞ্চল জোড়া পায়ে রেখেই । মেয়ের পাশে শুয়ে রেহানা ওর দীর্ঘনিশ্বাস শুনতে পেলেন । তিনি শোয়া ছেড়ে

উঠলেন, চুলগুলো টেনে ওর খোঁপা বাঁধলেন, রান্নাঘরে গিয়ে নিজের জন্য এক গ্লাস পানি ঢাললেন। পানির গ্লাসে চুমুক দিয়ে রান্নাঘরের দোরগোড়া থেকে উঁকি দিলেন বাইরে আর পাশের ছোট্ট উঠোনে। দিনের এই অংশটুকুতে সর্বদা তিনি একান্ত নিজের জন্য কিছুটা সময় বরাদ্দ রাখেন, স্বার্থপর কতক মুহূর্ত, যখন এই বাড়ি, এই পৃথিবী কেবল তার এবং যেখানে আর কাউকে ভালোবাসার বা উদ্ধার করার দায় নেই। মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য এই সময়টুকু বহাল থাকে। কেবল কয়েক মিনিট সময়ই তিনি রাখেন সম্পূর্ণভাবে নিজের জন্য।

রাতের জের বহন করা বাতাস এখনো ধূসর ও ভারি। তিনি গোসলখানায় ঢুকে পানি দিলেন হাতে আর মুখে, কানের পেছনে। জায়নামাজে হাঁটু মুড়ে বসলেন। প্রতিদিন তিনি একই দোয়া চান। আমার বাচ্চাদের রক্ষা করো। ক্ষমা করো। ওই মানুষটাকে বাঁচাও। তাঁর নাম উচ্চারণ করার চাপও তিনি সইতে পারেন না। এমনি আশা করার দুরাশাও জাগে যে আজ হয়তো ওর সঙ্গে দেখা হতে পারে।

দ্রুত পায়ে তিনি রান্নাঘরে ঢুকলেন আর কী নাশতা বানানো যায় ভাবলেন। কয়েক সপ্তাহের জন্য আজই হবে শেষ নাশতা। কাল থেকে রোজা শুরু। তিনি ময়দার সঙ্গে পানি মেশালেন আর ঠেসে ময়ান করলেন। গোল করা ময়ানের ওপর বেলুন ঘুরিয়ে হাতের সেই দ্রুত তাল উপভোগ করলেন। সূর্যের আলো জানালা গলে রান্নাঘর কমলা রঙ করে তুলেছে, তিনি রুটিগুলো একটার ওপর একটা রেখে ভেজা কাপড় দিয়ে সেগুলো ঢেকে দিলেন।

শোবার ঘরে ফিরে গিয়ে মেয়েকে ঘুম থেকে ওঠাতে চেষ্টা করলেন রেহানা।

‘আম্মু, বাসায় এসে যে কি শান্তি!’ মায়া কাঁথার আরও গভীরে তলিয়ে গেল।

‘আসো,’ বিছানার ধারে চাপড় মেরে ও বলল, ‘আমাকে আদর করো আম্মু।’

‘আমি উঠে পড়েছি জান।’

‘আসো না,’—কাঁথা সরালো—‘প্লিজ।’

‘আচ্ছা, ঠিক আছে,’ রেহানা দীর্ঘ একটা শ্বাস ফেললেন। তারপর তোশকের মধ্যে ডুবে গেলেন, যেখানে মিশে আছে ট্যালকম পাউডার আর ঘুম-ঘুম গন্ধ।

‘আজ একটা বিশেষ দিন,’ মায়া বলল।

‘জানি।’

মায়া রেহানার কপালে হাত বুলালেন। ‘তুমি ঠিক আছো?’

‘হ্যাঁ, তোমার ডাক্তার আমাকে ঠিক করে দিয়েছে!’ তিনি মায়ার চেহারা একটা লক্ষণ খুঁজে ফিরলেন। কলকাতায় ওরা দুই মাস ছিল, এই দুই মাসে মেয়ে

কোনো কিছুই জানায়নি।

‘আম্মু, একটা কথা তোমাকে বলতে চাই,’ মায়া গভীর হয়ে বলল। ‘আমরা যে বছর লাহোরে ছিলাম—সেই প্রসঙ্গে আমরা কখনো কথা বলিনি।’

সঙ্গে সঙ্গে রেহানার চোখে পানি আসতে শুরু করলো।

‘আমি তোমাকে জানাতে চাই—সবকিছু ঠিকঠাকই ছিল।’

‘কীভাবে ঠিক থাকে?’

‘ছিল তো।’

‘আমার জন্য তোমার মনে—’

‘অবশ্যই, তোমার জন্য আমাদের মনে কষ্ট হতো। সবকিছুর জন্যই আমাদের কষ্ট হতো। কিন্তু তখন আমরা বাচ্চা ছিলাম। আর ওটা তো কেবল এক বছরের ব্যাপার।’

‘কিন্তু আমার কাছে গোটা একটা জীবনের সমান।’

‘আম্মু, তোমার নিজেকে ক্ষমা করে দেয়া উচিত।’

‘আমি ভাবলাম—সবসময় ভাবি—নিশ্চয়ই সে-সময়টা তোমাদের জন্য খুব খারাপ ছিল।’

মায়া মাথা নাড়ল। ‘অত খারাপ ছিল না।’

‘খুব কি ভালো ছিল?’ অন্যদিকে এই সম্ভাবনাও তাঁকে পীড়িত করে।

‘না,—অবশ্যই না।’

‘সবচেয়ে খারাপ কী ছিল?’

‘পারভিন চাচি আমাকে কুঁচি দেয়া জামা পরাত—যখন যেখানে যেতাম আমাকে একটা কেকের মতো দেখাত।’

‘না, ফাজলামি না, ঠিক করে বলো, কিসে সবচেয়ে খারাপ লাগত। আমি জানতে চাই।’

‘জানি না...’ মায়া ধীরে শুরু করল। ‘আমার মনে হয়...ও..., জানি তো ...তোমার মুখ মনে করতে পারতাম না। আমি সারাক্ষণ ভাইয়াকে জিজ্ঞেস করতাম আর ও বলত, আম্মুর চোখ সবচেয়ে সুন্দর, আর আমি মাথা নাড়তাম, কিন্তু আমার কিছু মনে পড়তো না।’ মায়া দৃষ্টি নত করল আর নখের দিকে তাকিয়ে রইল। ‘এসব অনেক দিন আগের কথা।’

‘আমি সবকিছু দিয়ে দিতে পারতাম—আমার জীবন—’

‘আমি জানি, আম্মু। আমি সবসময় জানতাম।’

এগারোটার সময়, ওদের দু’জনেরই গোসল সারার পর আর রেহানার কাপড় ধোয়ার পর আর লেবুগাছের সামনে মায়ার কাপড় শুকোতে দেয়ার পর আর চাল থেকে রেহানার কাঁকর বাছার পর, ওরা রাস্তা পার হয়ে মিসেস চৌধুরীর বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

গেটের সামনে মিসেস চৌধুরী আর সিলভির সঙ্গে ওদের দেখা হলো।

‘তোমরা ফিরেছ! আমার মনে হলো গত রাতে আমি ঘরে আলো দেখলাম—বেটি, তোমাকে আমি বলিনি, যে রেহানাই হবে, কিন্তু আমাকে না জানিয়ে ও ফিরে আসবে না, তাই অত নিশ্চিত ছিলাম না।’ তিনি মেয়ের দিকে ফিরলেন, কিন্তু সিলভি ততক্ষণে রান্নাঘরে গায়েব। ‘হায় আল্লাহ! রেহানা, তুমি এত শুকিয়ে গেছ! কী হয়েছিল?’

‘শরীর ভালো ছিল না। এটা আপনাদের জন্য নিয়ে এলাম, সামান্য মিষ্টি।’

মিসেস চৌধুরী বাক্সের মধ্যে উঁকি দিলেন। ‘এর কোনো দরকার ছিল না,’ বাক্সের ডালা খুলে সন্দেশগুলো পরখ করতে করতে তিনি বললেন, ‘এখন বলো তো তোমার কী হয়েছে? আমি তোমাকে প্রায় চিনতেই পারিনি!’

‘চিন্তার কিছু না। হালকা জড়িস হয়েছিল।’

‘জড়িস! ইয়া আল্লাহ! তোমাকে কীভাবে ধরল?’

‘আমরা উদ্বাস্ত শিবিরে ছিলাম,’ রেহানা শুরু করলেন।

‘কী, তুমি ক্যাম্পে গেছিলে?’

‘সুপ্রিয়া মাসি ওখানে ছিল,’ মায়া বাধা দিল।

‘কী বলো! মিসেস সেনগুপ্ত? আমাদের সুপ্রিয়া?’

‘হ্যাঁ।’

‘তারপর?’ মিসেস চৌধুরীর শরীর চেয়ারের কিনারে ঝুঁকে এলো।

রেহানা মাথা ঝাঁকালেন। ‘বেচারা। ও তো প্রথমে আমাকে চিনতেই পারেনি, এমনকি কয়েক সপ্তাহ একসঙ্গে থাকার পরও কোনো কথা বলেনি।’ মিসেস চৌধুরীকে তিনি ওর খাতায় লেখার কথা কিছু বললেন না কিংবা বাঁশের লাঠির কথা।

‘ওর স্বামীর কী হয়েছে?’

‘আমরা কেউ জানি না। ভয়ঙ্কর কিছু হতে পারে।’

‘এখন ও কোথায়?’

‘সঙ্গে করে নিয়ে আসতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু আসতে চাইল না। আর এমনিতে এখানে ও কেমন থাকবে তাও তো জানতাম না।’

‘আহা রে,’ গভীর নিশ্বাস ফেলে মিসেস চৌধুরী বললেন, ‘আমরা এরই মধ্যে কত কিছু যে হারালাম।’

সিলভি ট্রেতে করে চা আর হরলিক্সের খালি টিনে নিমকি নিয়ে ঘরে ঢুকল। একটা কাপড় ওর মাথার চারপাশে টানা আর থুতনির কাছে আঁটো করে বাঁধা। বেসামাল চুলগুলো শক্ত হাতে দমন করা এবং ঘোমটার নিচে বাঁধা। খুব গুছিয়ে কাজ করল

সে, ট্রেটা নামিয়ে কাপগুলো পিরিচের ওপর সাজাল, টি-পটের ভেতর চা চামচ দিয়ে নাড়ল।

‘আমরা তোমার টেলিগ্রাম পেয়েছি—সাবিরের কথা জেনে খুব কষ্ট পেয়েছি।’

‘সবই আল্লাহর ইচ্ছা,’ ট্রে ওপর ঝুঁকে পড়ে সিলভি ফিসফিস করে বলল। ‘চিনি?’ ও রেহানাকে জিজ্ঞেস করল।

যখন থেকে পানি সিদ্ধ করতে পারার মতো বয়স হয়েছে তখন থেকেই ও রেহানার জন্য চা বানিয়ে আসছে। ‘হ্যাঁ, দুটো। আর একটু দুধ,’ রেহানা বললেন। এই নতুন সৌজন্যে কিঞ্চিৎ খতমত খেলেন।

‘মায়া?’

‘একটু চিনি। নো দুধ।’

‘হায় আল্লাহ!’ মিসেস চৌধুরী কঁকিয়ে উঠলেন, সোফার পেছনে পুরো ভার ছেড়ে দিয়ে, আর টুলের ওপর পা রেখে। ‘আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম। প্রথম দিকে ছেলেটা ছাদের দিকে তাকিয়ে থেকে শুধু শুয়ে থাকত। কথা নামমাত্র বলত কি বলত না। আর ওর আঙুলগুলো!’ তিনি জিভে কামড় বসালেন। ‘আঙুলগুলো নীল হয়ে গেছিল, আর তারপর ওর পুরো হাত। ডাক্তার বলল, গ্যাংগ্রিন হয়েছে—কেটে ফেলতে হবে। দুটো হাতই। কল্পনা করতে পারো, ওর মতো একটা কমবয়সী ছেলে।’ তিনি নিজের পুরুষ্ট আঙুলগুলো তুলে ধরলেন।

সিলভি অবিচলভাবে সবার দিকে চা বাড়িয়ে দিল।

‘তারপর একদিন...রাতের বেলা ও বিছানা ছেড়ে উঠে এলো আর এখানে বসল, এই বসার ঘরে, আর হাসল...কী যে সুন্দর করে, না সিলভি? মনে হচ্ছিল, ও যেন স্বয়ং খোদাতায়ালার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে।’ মায়া যেখানে বসে ছিল, মিসেস চৌধুরী সেই সোফাটা দেখালেন। ‘আর পলক না ফেলতেই চলে গেল।’

রেহানা টের পেলেন তার পেটের ভেতরটা গুলিয়ে উঠছে, মায়ার হাতে চায়ের কাপ টলে উঠল, আর বলল, ‘আপনারা কি জানতে চেয়েছিলেন ওর কী হয়েছিল? কীভাবে ও ধরা পড়ল?’ প্রশ্নটা মায়া সিলভিকে উদ্দেশ্য করেই করল।

সিলভি হরলিক্সের কৌটার মুখ খুলল আর একটা প্লেটের ওপর নিমকি সাজিয়ে রাখল। সে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রাখল, ভাব দেখাল যে প্রশ্নটা শুনতে পায়নি।

‘সিলভি, তুমি কি জানো কী হয়েছিল?’ মায়া প্রশ্নটা আবারও করল, একটু জোরে। কোনো কথা না বলে সিলভি নিমকির প্লেট ওর মায়ের দিকে বাড়িয়ে দিল। ‘তুমি কি জানতেও চাওনি?’ মায়া বলল।

‘এসব কথা কি বলা যায়’, মিসেস চৌধুরী শুরু করলেন।

‘কিন্তু এসব জানা দরকার।’ মায়া ঠাস করে চায়ের কাপ নামিয়ে রাখল। ‘সিলভি, তোমার স্বামী একজন বীর।’

‘সেটা তার ব্যাপার,’ অবশেষে সিলভি বলল, ‘এর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নাই।’

‘কিন্তু এটা তো তোমার দেশ?’

‘তুমি যা বিশ্বাস করো সবাই তা করে না,’ সিলভি সোজাসাপটা বলল।

‘তুমি বাংলাদেশে বিশ্বাস করো না?’ দেশের যে নামটা এখনো নতুন শব্দ ছাড়া আর কিছু নয়, মুক্তার মতো মায়ার মুখ থেকে খসে পড়ল।

সিলভি তখনো ট্রের পাশে মাথা নিচু করে বসে। এখন ট্রেসহ উঠে দাঁড়াল আর ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

‘আমি জানি না ওকে কোন ভূতে পেয়েছে,’ মিসেস চৌধুরী নিশ্বাস ছাড়লেন।

‘আপনাকে কিছু একটা করতেই হবে খালামণি,’ মায়ী বলল, ‘ওর কথাবার্তা এমন অদ্ভুত!’

এই প্রথমবারের মতো রেহানা তাঁর মেয়ের সঙ্গে একমত হলেন, আর ঈর্ষা-কাতরতা অনুভব করলেন এই ভেবে যে, কত অকপটে মেয়েটা নিজের মনের কথা বলতে পারে।

‘তোমার সমস্যা হলো,’ সন্দেশের জন্য প্রেট নিয়ে ফিরে এসে সিলভি বলল, ‘তুমি অন্য কোনো মত সহ্য করতে পারো না। আমার তো মনে হয় এই যুদ্ধ...এত সব মারামারি...মানুষের জীবনের অর্থহীন অপচয়।’

‘যখন পাক আর্মি এলো, গণহত্যা শুরু করল আর আমাদের দেশত্যাগে বাধ্য করল, তখন কি আমাদের তা মাথা পেতে নেয়া উচিত ছিল?’

‘ওরা বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে আনছিল,’ সিলভি বলল। খুতনির নিচের গিঁটটা টেনে ঠিক করল। ‘সবকিছু নিরাপদ রাখার জন্য।’

‘তুমি কি এই কিছুকালের মধ্যে তোমার বসার ঘর ছেড়ে আর কোথাও গেছ? মানুষ পাখির মতো মরছে যেখানে-সেখানে...’ মায়ার দু’হাত উপরে উঠে গেল, শিস দেয়ার মতো শব্দ করে শ্বাস নিচ্ছিল।

‘পাকিস্তান এক থাকা উচিত,’ সিলভি বলল। যেন কোনো পাহাড়ের থেকে ও মুখস্থ বলছে। ‘সে কারণেই এর উদ্ভব হয়েছিল। মুসলিম উম্মাহকে অবিচ্ছিন্ন রাখার জন্য। একে আলাদা করা আমাদের জন্য পাপ।’

‘আমাদের বিরুদ্ধে পাপ ঘটানো হচ্ছে প্রতিদিন,’ তোমার জানালার বাইরের জীবনটা একটু দেখো!’

‘আমি মূর্থ না, মায়ী। মাঝে মাঝে কিছু ভাবি করতেই হয়, ছাড় দিতেই হয়। আর আমিই একমাত্র মানুষ না যে...’

‘তুমি আর তোমার পাক আর্মি, তোমাদের চিন্তাধারা একই। আহা কী শান্তি!’ মায়ার গলা ভেঙে এলো।

ওর এই তীব্র আবেগ সিলভিকে আরও প্রশান্ত করল বলে মনে হলো। মিসেস চৌধুরী হাল ছেড়ে দিলেন আর চেয়ারের পেছনে মাথা এলিয়ে রাখলেন, শহীদের মতো নিষ্পলকভাবে ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

‘আমি নিজের চেয়ে মহত্তর কিছু বিশ্বাস করতে চাই,’ সিলভিকে স্নিগ্ধ শোনাল।

‘আমিও,’ মায়া তিরিক্ষিভাবে বলল। ‘আমু চলো, প্লিজ চলো।’ ও রেহানার হাত ধরে টান দিল।

‘সিলভি,’ দরজার দিকে ঘুরে যাওয়ার সময় রেহানা বললেন, ‘তোমার জন্য জরুরি হলো তোমার মাকে দেখাশোনা করা আর আমাদের জন্য জরুরি এই যুদ্ধের মধ্যে প্রাণ বাঁচানো।’

‘জি, খালামণি।’ ওর কপাল থেকে বিরক্তি মুছে গিয়ে ভ্রুজোড়া স্বাভাবিক হলো, চেহারায় সেই পুরোনো ভাব ফুটে উঠল।

সোহেল ওদের জন্য বাংলাতে অপেক্ষা করছিল।

‘আমি বিশ্বাস করতে পারি না...ওকে আমি সারা জীবন ধরে চিনি!’ মায়া দেয়ালের সঙ্গে চিৎকার করছিল ভাইকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে।

‘ওর মাথার ঠিক নাই...কেমনভাবে স্বামীটা মরল।’

‘ব্যাপার কী?’ সোহেল জানতে চাইল, মায়ের ওপর থেকে বোনের দিকে চোখ সরিয়ে নিয়ে।

‘কিন্তু কীভাবে?’ মায়ার গাল দুটো ভেজা, সে হাঁ হয়ে ছিল। ‘এটা কীভাবে হতে পারে?’

‘তুমি প্রবলভাবে চাও এই যুদ্ধে সবাই বিশ্বাস রাখুক।’

‘অবশ্যই আমি চাই।’ ব্লাউজের হাতায় মায়া জোরেশোরে নাক ঘষল। ও ত্রুদ্ব চোখে সোহেলের দিকে তাকাল আর ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

‘ও কষ্ট পেয়েছে,’ রেহানা ধীরে বললেন, ‘কারণ সিলভি আসলে...’

‘আসলে কী?’

‘যুদ্ধকে ও কোনোভাবেই স্বীকার করে না, বেটা।’

‘এর মানে কী?’

‘ও মনে করে না যে আমরা যা করছি তা সঠিক।’

‘এটা সত্যি হতে পারে না। তোমরা ভুল বুঝেছ।’

‘ও বলল, ও মনে করে এটা একটা পাপ, এই পাকিস্তানের দু’ভাগ হয়ে যাওয়া।’ রেহানা সোহেলের পিঠে হাত রাখলেন, যেখানটায় ওর কাঁধের পাতা দু’দিকে ভাগ হয়েছে।

‘কেউ নিশ্চয়ই ওর মাথাটা বিগড়ে দিয়েছে। কোনো একটা খারাপ প্রভাব।’

‘কিছু আসে-যায় না। যে কারণেই হোক এখন সে এর বিপক্ষে।’

‘ধর্ম?’

‘হতে পারে,’ রেহানা বললেন। আল্লাহর ওপর দোষারোপ না করতে চেষ্টা করলেন, ‘ওর বয়স এত কম, কে বলতে পারে কেন?’

ঘরে ফিরে এলো মায়া। নিজেকে সামলে নিতে চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। ওর মুখ ভেজা আর ঠোঁটে চাপা ক্রোধ।

‘শুনলে তো কী হয়েছে?’ ও সোহেলকে বলল।

সোহেল নিঃশব্দে মাথা নাড়ল, ওর চোখ মায়ার দৃষ্টি এড়াল।

‘অপমানকর,’ ও বলে গেল, হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের পানি ঝেড়ে ফেলে।

সোহেল দু’হাতে মুখ ঢাকল।

‘তুমি কি এখনো ওকে ভালোবাসো?’

‘মায়া...,’ রেহানা সাবধান করলেন।

‘তুমি এখনো ওকে ভালোবাসো। কী আশ্চর্য, তুমি এখনো ওকে ভালোবাসো!’

‘না,’ সোহেল বলল। নিস্তেজভাবে মাথা নাড়ল, ‘অবশ্যই না।’

‘দেখো,’ ভারি ও ক্ষিপ্ত কণ্ঠে মায়া বলল, ‘এখনই তোমার সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় কোনটা বেশি জরুরি। এই মুহূর্তে, এখনই। ওখানে মেয়েটা আছে ওর আহম্মকী ও বিকৃত রাজনীতি নিয়ে, আর তোমার কথা কিছুই ভাবছে না, যে তুমি ওকে পাওয়ার জন্য জীবনপাত করছ, চরম ঝুঁকি নিয়েছ—চরম। ভাইয়া, এখন ওকে চলে যেতে দাও, প্লিজ; সবার তরফ থেকে আমি তোমার হাত ধরছি, তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি, ওকে এবার তুমি ছাড়ো।’

‘আমার আনুগত্য নিয়ে প্রশ্ন তুলো না,’ সোহেল অস্ফুট স্বরে বলল।

‘আমি তোমার আনুগত্য নিয়ে প্রশ্ন তুলছি না, আমি প্রশ্ন তুলছি তোমার বিচক্ষণতা নিয়ে।’

মুখের ওপর থেকে ও হাত সরিয়ে নিল, মুহূর্তের জন্য মনে হলো ও হয়তো মায়ার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে বসবে, চিৎকার করবে আনুগত্য, ভালোবাসা আর দেশ নিয়ে, কিন্তু তার পরিবর্তে লম্বা পা ফেলে ও মায়ার কাছে গেল আর দুই হাতে মায়াকে জড়িয়ে ধরল। ‘ঠিক বলেছ,’ ও বলল। ওর কাঁধ কাঁপছিল, ‘তুমি ঠিকই বলেছ।’

বেশ বেলা হয়ে গেছে। সোহেল সোনায় জন্মের জন্য অপেক্ষা করছে; ওরা দু’জন মাটি খুঁড়ে অস্ত্র বের করবে। ‘সেহরি বানাতে হবে,’ রেহানা মায়াকে বললেন। ‘তুমি কী খেতে চাও?’

‘জানি না।’ মায়ার চোখের পানি এখনো বাঁধ মানছে না, গাল বেয়ে অবিরাম

ঝরছে। ‘আমাদের কি রোজা রাখতেই হবে?’

‘হ্যাঁ, হবে। আর কালকে তো অবশ্যই রাখতে হবে।’

মায়া তার স্বভাবসুলভ তর্কে গেল না। রেহানার হাত থেকে পানির গ্লাস নিল। ‘আমি ডালপুরি খেতে চাই,’ ও বলল।

‘ভালো বলেছ। আমি ডাল চড়িয়ে দিই।’

পানির গ্লাস ঠোঁটের কাছে নিয়ে এলো মায়া আর যখন ও খেতে যাবে, আরেক দফা চোখের জল ওকে ভিজিয়ে দিল।

‘মায়া,’ রেহানা মৃদু বকুনি দেন, ‘আজকে আমাদের আরও অনেক জরুরি বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানোর আছে।’

‘আমি জানি, আমি সরি...কিন্তু থামাতে পারছি না।’ ও ভীষণ আওয়াজ করে নাক ঝাড়ল। ‘আমি ভেতরটায় খুব কষ্ট পেয়েছি’...সে বুকের ওপর আঙুলের খোঁচা দিয়ে দেখাল...‘এই এখানে।’

‘কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ছেলেরা সব চলে আসবে।’

রেহানা পর্দা সরিয়ে বসার ঘরের জানালা দিয়ে নজর রাখলেন।

জয় ও সোহেল পেছনের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল আর গোলাপঝাড়ের কাছে বৃত্তাকারে ঘুরে দাঁড়াল। অমাবস্যার অন্ধকারে দেখাটা কঠিন হলেও তিনি জয়ের মোটাসোটা গড়ন চিনতে পারলেন, তার পেছনে সোহেল, হালকা-পাতলা, কোদাল ও হারিকেন হাতে দাঁড়িয়ে। ক্ষণিকের জন্য একটা হতাশা তাঁর মনে ঢেউ তুলল, না, মেজরের এখানে আসার কোনো কারণ নেই।

জয় হারিকেনটা জ্বালাল, আর সোহেল মাটি খোঁড়া শুরু করল। কয়েক মিনিট পর ওরা জায়গা বদল করল, এবার সোহেল ম্রিয়মাণ আলো ধরল এবং জয় খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করল। অবশেষে ওরা থামল, যে গর্ত ওরা খুঁড়েছে তার ওপর জয় ঝুঁকে পড়ল। তলপেটে ভর দিয়ে সটান শুয়ে পড়ল জয়, আর কিছু একটা টানাটানি শুরু করল। ওর মুখ রেহানা দেখতেই পাচ্ছেন না, টানতে গিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে যাচ্ছে বারবার।

খোঁড়া গর্ত থেকে জয় সবে জিনিসটা টেনে তুলেছে—অস্বস্তি একটা কাঠের বাস্ক, অনেক দিন মাটির নিচে চাপা থাকায় রঙ মরে গেছে—বিক্ষিপ্তভাবে ট্যাটট্যাট শব্দ শুনতে পেল ওরা। বন্দুকের গুলি। শব্দটা হঠাৎ বেড়ে ছড়িয়ে পড়ল, বাতাস ভরে গেল তাতে। ছেলেরা মাথা হেঁট করে হামাগুড়ি দিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল। বাস্কটা জয় কাঁধের ওপর তুলে সটান হয়ে দাঁড়াল আর ছুটে বাগান থেকে বেরিয়ে গেল। আমগাছের পেছনে সরে গিয়ে সোহেলের জন্য অপেক্ষা করল, যে কনুইয়ে ভর করে হামাগুড়ি দিয়ে ওর পিছু আসছিল। ওরা ছায়া হয়ে গাছের ডালে মর্মর শব্দ তুলল।

বুকের ধুকপুকানির শব্দে রেহানা সচকিত হলেন, ওর নিশ্বাস চক্রাকার হয়ে বেরিয়ে বড় হচ্ছে আর বন্ধ জানালার কুয়াশায় মিশে যাচ্ছে।

দামামা আরো জোরালো শোনাতে রেহানা বরফ হয়ে গেলেন, শূন্য বাগানের দিকে মুখ করে ওর জায়গায় নিশ্চল ও স্থির। ওরা যে গর্তটা খুঁড়েছিল সেটা মুখ-ব্যাদান করে পড়ে রইল গোলাপঝাড়ের নিচে।

‘আম্মু?’ মায়া ঘরে ঢুকল, ময়দায় ওর হাত সাদা। ‘কী হচ্ছে?’

যে জানালা দিয়ে রাস্তা দেখা যায় ওরা ঘরের সেদিকে সরে গেল। রেহানা সময়মতো পর্দা সরিয়ে দেখল ট্রাকের একটা বহর শাঁ করে ওদের রাস্তা ধরে বেরিয়ে যাচ্ছে। থামের মতো দণ্ডায়মান সার বাঁধা সেনারা ট্রাকের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের অস্ত্র আকাশে তাক করে। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় চিৎকার করল, ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ! পাকিস্তান জিন্দাবাদ!’ যখন শেষ ট্রাকটা হেলতে-দুলতে চলে গেল, একজন সেনা, ফুলঝাড়ুর মতো ঘন ঝাঁকড়া চুলের কমবয়সী ছেলে, বাংলোর দিকে তার বন্দুক তাক করল। আমি এখনই তোমাকে মেরে ফেরতে পারি, ওর চেহারা জানান দিল।

রেহানা চট করে ওর মাথাটা পেছনে সরিয়ে নিলেন আর এক ঝটকায় পর্দা টেনে দিলেন।

‘দেখলে তো কী করল?’

মায়া ওর কাঁধের ওপর হাত রাখল। ‘একটু জোর দেখাল মা, আর কিছু না। এর কোনো মানে নেই।’

‘কিন্তু এখানে কেন? এমন একটা ছোট রাস্তায়। ওই সিপাহি ঠিক আমাদের দিকে বন্দুক তাক করল!’

‘ওরা আভাস পাচ্ছে যে ভারত আমাদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করবে। আর তখন এই যুদ্ধ শেষ হবে।’

ওরা এখন এসব কথা বলতে শুরু করেছে, যেমন ‘যখন যুদ্ধ শেষ হবে’ বা ‘যুদ্ধ শেষ হলেই’। রেহানা ভাবলেন এত তাড়াতাড়ি কিছু বলা যায় না, কিন্তু মানুষজন, বিশেষ করে কমবয়সীরা নিশ্চিত যে মুক্তিযোদ্ধারা ওদের বাঁচাবে। জগৎবাসী তাদের উদ্ধার করবে। শিগগির এ যুদ্ধ শেষ হতেই হবে। আমি প্রায় শেষের স্বাদ নিতে পারছি, সোহেল বলল, আর রেহানা ভাবলেন, এটা এমন একটা কথা, যা কোনো সন্তান তার মাকে বলে যখন তাদের মধ্যকার বিভাজন-রেখা ঝাপসা হয়ে যায় এবং যখন সে আর ছোট থাকতে চায় না এবং মা আর মা থাকতে চায় না। রেহানা স্বস্তি খুঁজে পান এই কথার মধ্যে আর তার কপালে ওর ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়ায়। কিন্তু সত্যি করে তিনি ওকে বিশ্বাস করেননি।



খাবারের ব্যতিক্রম ছাড়া শুক্রবার দিনটা ওদের সামনে দিয়ে খুব ধীরে পার হয়ে গেল। এখনো অনেক কাজ বাকি। মনে করো এটা আর কোনো দিনের মতোই একটা দিন। ধোয়াধুয়ির কাজ করো, সেহরির জোগাড়পাতি করো, ইফতারি বানাও। জানালা খুলে দাও, বাতাস আসুক। কল থেকে পানি জমিয়ে রাখো। খাবার পানি সিদ্ধ করো। মাকড়সার ঝুল সাফ করো।

সারা দিন ধরে তিনি উপেক্ষা করলেন, পেছনে লেপ্টে থাকা হিমশীতল ভয়। সোহেল দুপুরে চলে গেছে, যখন রেহানা ওর কপালে চুমু খেলেন ওর মুখ ছিল ভাবলেশহীন। আর যখন আয়াতুল কুরসি পড়লেন, ওর চোখে ফুঁ দিলেন, তখনো তাই। ভয়টা রেহানার ঘাড়ের কাছে নিশ্বাস ফেলতে লাগল আর চুল খাড়া করে দিল। এই আতঙ্ক ধরা পড়ল তাঁর বুকের দ্বিগুণ স্পন্দনে, টের পেল তাঁর কপালের দুই পাশের শিরার দপদপানিতে, টের পেল হাতের কাঁপুনিতে যখন তিনি ইফতারের জন্য ভাজাভাজি করছিলেন। বেগুনি, বুট ভাজা আর টমেটো। ডালপুরি, যেগুলোতে মায়া ডাল পুরে বেলে দিয়েছে। কমলার রস। তেঁতুল পানি। লাচ্ছি। বিশেষ কোনো দিনের মতো বিপুল নয়, আবার অভাবের পরিচয়বহ সাদামাটাও নয়। গতানুগতিক দিনের এক বেলা খাবার। যুদ্ধহীন কোনো দিনের এক বেলা খাবার।

রেহানা খাবারগুলো টেবিলে নিয়ে এলেন। ওরা নীরবে খেয়ে নিল, কেবল আঙুল দিয়ে পুরি নেড়েচেড়ে চাটি দেয়ার মৃদু শব্দ হলো।

খাওয়া-দাওয়া চুকে গেলে মায়া হামাগুড়ি দিয়ে বিছানায় ঢুকল আর কেরোসিনের বাতিটা খাটের নিচ থেকে টেনে বের করল।

‘ওটা নিভিয়ে দাও!’ রেহানা বললেন।

‘কেন? যখন কারেন্ট চলে যাবে...’

‘আমরা জানি না কারেন্ট চলে যাবে কিনা।’

‘অবশ্যই চলে যাবে।’

রেহানা মায়ার দিকে কঠিন চোখে তাকালেন। ‘যদি নিভিয়ে আমার সঙ্গে এশার নামাজ পড়তে এসো।’

সোনার লম্বা হায়ার প্রান্ত বাংলো অবধি এসে পৌঁছেছে, ওরা এখন রেডিও ধরতে সচেষ্ট হলো। মায়া রেডিওর নব ঘুরিয়ে চলল, কিন্তু যান্ত্রিক একটানা ঝিঁঝি শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেল না।

‘গান শুনবে মা?’

এমন প্রস্তাবে রেহানা অবাক হলেন। ‘সত্যি? খুব ভালো লাগবে এখন।
‘আমার সোনার বাংলা’ গাও তো।’

রাত নয়টার সময়, যখন কেবল আছে ঘোর অন্ধকার আর আকাশে নখ-গড়ন
চাঁদ, ওরা নিশ্বাস বন্ধ করে থাকল আর অপেক্ষায় রইলো।

*

রেহানা ভাবতে শুরু করলেন বাতি চলে যাওয়ার পর তিনি কী কী করবেন। তিনি
সোহেলের ঘরে যেতে পারেন, গিয়ে ওষুধ আর কম্বল গুনে দেখতে পারেন, যেসব
এখনো বিলি করা হয়নি। তিনি বোনদের কাছে চিঠি লেখা শুরু করতে পারেন। কিন্তু
চিঠিতে তিনি কী বলবেন? চিঠি জুড়ে কেবল মিথ্যা কথাই লিখতে হবে। আর শেষ
পর্যন্ত তা পাঠানোও হবে না, নইলে একটা জবাব তিনি অবশ্যই পেতেন: ‘আল্লাহর
কাছে হাজার শুকুর যে তুমি বেঁচে আছো... আমরা খুবই দুশ্চিন্তায় ছিলাম... আল্লাহর
ওয়াস্তে তুমি ওই ভয়ঙ্কর জায়গা ছাড়ো আর করাচি চলে আসো... আমরা তো বহু
বছর ধরে তোমাকে সেটাই বলছি।’ না, তিনি কোনো চিঠি লিখবেন না।

মায়া অস্থির হাতে রাতের প্লেট-বাসন যেমন আছে গোছাচ্ছিল, যেনতেনভাবে
সেগুলো তুলে রাখল।

‘থাক, যেমন আছে রেখে দাও।’

‘আমি কিছুটা ঠিক করে...’, মায়া ঠোট কামড়ে বলল।

‘বাদ দাও।’

‘উফ্ আম্মু, দোহাই লাগে।’ তবে ও গোছানো বাদ দিল এবং সোফায়
রেহানার পাশে ধপ করে বসে পড়ল।

‘এখন কী করব?’

‘অপেক্ষা করব।’

কখনো কোনো কিছুই জন্যই মায়ার অপেক্ষা করার ধৈর্য থাকে না।

‘কিন্তু কিছুই তো করার নেই।’

‘রামি খেলতে চাও?’

ওর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ‘সত্যি? আমরা শেষবার খেলছি সেই কবে...’

‘যবে থেকে সোহেল তোমাকে হারাতে শুরু করল তুমি খেলা বাদ দিলে।’

‘না না, মোটেও এভাবে হয়নি। যে বছর ওকে কবিতায় পেল আর ও অন্য
সবকিছু ভুলে গেল।’

‘সে তো হলো আরও এক বছর পরে। এর মধ্যে কিছুটা সময় ছিল, প্রায় আট
মাসের মতো, যখন তুমি ওর সঙ্গে কিছুই খেলতে না—না তাস, না দাবা, না
ব্যাডমিন্টন।’

‘ব্যাডমিন্টনের জন্য তুমি আমাকে দুষতে পারো না। ও এত লম্বা হয়ে গেল,

এটা মোটেই সমানে সমান হতো না।’

‘তা ঠিক। কিন্তু বেচারী সিলভি... ও গৌ ধরে লেগে রইল।’

‘তার কারণ ভাইয়া সব সময় ওকে জিততে দিত।’

এক সময় দু’জনেই চুপ করে গেল, একত্রে তারা স্মৃতি আহরণ করে জমা করছিল।

‘ঠিক আছে’, সোফার হাতলে চাপড় মেরে মায়া বলল, ‘আমি তাস নিয়ে আসছি।’

কিন্তু রেহানা মন বদলে ফেলেছেন। ‘তাস না খেললে কি তুমি মন খারাপ করবে? আমি একটু পড়তে চাই।’

মায়া মাথা নাড়ল। ‘আচ্ছা, পড়ো।’

‘তুমি কী করতে চাও?’ রেহানা জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু মায়া এর মধ্যেই সোহেলের ঘরে ঢুকে গেছে, তাকের বইগুলোর ওপর আঙুল বুলাচ্ছে।

‘চলো একটু চা খাই।’ মায়া একটা পাতলা বই বের করল। ‘আমি চা বানাচ্ছি,’ ও বলল, বইটা হাতের নিচে গুঁজে নিয়ে।

কয়েক মিনিট পর ট্রে হাতে সে রান্নাঘর থেকে ফিরে এলো।

‘আমি ইকবাল পড়তে চাই,’ রেহানা বললেন, ‘অনেক দিন পড়ি না।’

‘কোনটা?’

‘বাল-ই-জিবরিল’

মায়া ঘটা করে তার পছন্দের বইটা বের করল। ‘গীতাঞ্জলি!’ দুই হাসি দিয়ে ও বলল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিষিদ্ধ, আর যদিও তার কবিতা প্রেম, ঈশ্বর আর বর্ষা নিয়ে লেখা, তবু সেগুলো পড়তে গিয়ে এক ধরনের উদ্দীপক শিহরণ অনুভব করা যায়। তাঁর শ্বেতশুভ্র দাঁড়ি প্রচ্ছদের শেষ পর্যন্ত ত্রিভুজাকারে নেমে গেছে, চোখ ধাঁধানো সাদা চুলের সঙ্গে মিল রেখে, যা একটা লম্বাটে গম্ভীর মুখকে ফ্রেমের মধ্যে বেঁধে রেখেছে।

ওরা চা আর বই নিয়ে খাটের ওপর উঠে বসল। রেহানা জোর করলেন তিনি প্রথমে পড়বেন। হয়তো ওর প্রিয় কবিতার পাতায় যখন আসবেন, ‘চমক তেরি আয়ান’, বাড়িটা অন্ধকারে ডুবে যাবে। এক অনুচ্চারিত সিদ্ধান্তে ওরা মাথার ওপর টিউবলাইট জ্বালিয়ে রেখেছে আর পাখা ঘুরছে পুরো দমে। পাখার বাতাস ওদের বইয়ের পাতায় পতপত শব্দ তুলছে।

‘চমক তেরি আয়ান’ এসে চলেও গেল। মায়া ওর বইয়ের পাতা ধীরে উল্টাল, কবিতা পড়ার আগে প্রতিটার শিরোনাম পড়ল। ‘সে আলো আমার আলো’ পর্যন্ত এগোল আর ‘আমার এ গান’-এ এসে সময় খিয়ে পড়ল, যেটা রেহানা জানে ওর সবচেয়ে প্রিয়।

রেহানা তখন পড়ছিল ‘কেয়া কহুঁ আপনে চামন’, আর মাত্র তিনটা কবিতা আছে পড়ার, যখন দূরে কোথাও একটা শব্দ শোনা গেল, বাজ পড়ার মতো

আওয়াজ । ‘এই শব্দই কি সেই শব্দ?’ মায়া লাফ দিয়ে জানালার কাছে গেল আর বাইরের রাস্তায় উঁকি দিল । ‘এখনো তো সব বাতি জ্বলছে । হয়তো ওরা কাজটা করতে পারেনি...হয়তো ওরা চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারেনি ।’

রেহানা ওকে উপেক্ষা করলেন, আর শেষতক মায়া হামাগুড়ি দিয়ে আবার কাঁথার নিচে ঢুকল । ভারি নিশ্বাস ছাড়ল এবং বইটা আবার হাতে তুলে নিল । রেহানা বুঝতে পারলেন অন্য কোনো মোটা বই না নেওয়ার জন্য মায়া আফসোস করতে শুরু করেছে ।

ইকবাল পড়া শেষ আর মাথার ওপর আলো এখনো জ্বলজ্বল করছে । রেহানা ঘড়ি দেখলেন । ১২টা ২০ । ওর চোখ জ্বালা করতে শুরু করেছে । মায়া ওর গীতাঞ্জলি বালিশের নিচে রাখল আর বেগি খুলতে শুরু করল । ‘দাঁত মেজে আসি’, নীরস গলায় বলল ও ।

চায়ের খালি কাপ দুটো হাতে নিয়ে ও দরজার চৌকাঠ পার হলো, ভারি নিশ্বাস ফেলল, আর তখনই এটা ঘটলো; চাপা দেয়া এক তীক্ষ্ণ শব্দ, কোনো ভুল নয়, আলোর হঠাৎ স্ফূরণ, ঝিলিক দিয়ে নিভে যাওয়া বিদ্যুতের আলো, আর ওরা নিকষ অন্ধকারে ডুবে গেল ।

‘মায়া?’ রেহানা বিছানার নিচে হারিকেন ছোঁল । ‘আসো, হারিকেনটা নিয়ে যাও ।’

‘ওরা পেরেছে, ওরা পেরেছে... ।’

যার যা পরনে ছিল সেই কাপড়েই ঘুমিয়ে পড়ল ওরা, মায়া বালিশে মুখ চেপে খিলখিল করে হাসল ।

‘রেহানা ।’

‘কে?’

‘শশশ্ ।’ একটা আঙুল তার ঠোঁটের ওপর । একটা ঠোঁট তার ঠোঁটের ওপর । হাত দুটো তার তল দিয়ে পথ খুঁজে পেল, তাকে তুলে ধরল, ঘর থেকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল । তিনটি বড় পদক্ষেপে পৌঁছে গেল বাগানের গেটে, লাথি দিয়ে গেট খুলে সামনে পা বাড়াল । তাঁর নাসারন্ধ্রে ছাই, কানে প্রমিত নিশ্বাস; তাঁর শরীর পালকের মতো হালকা, ওর হাতে সেটা রেশমি সুতোর চেলি, বাতাসের ঝাপটা ।

রেহানার চিন্তা করার অবকাশ থাকল না যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি নিশ্চিত হলেন যে এই মানুষটা সত্যিই ও । দেখার মতো পর্যাপ্ত আলো সেখানে ছিল না; তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন, ওর গালের কাটা দাগ স্পর্শ করলেন । তারপর বললেন, ‘কী হলো? সবকিছু ঠিক আছে? তুমি এখানে কী করছ? সোহেল কোথায়?’

‘ওরা কাজটা শেষ করেছে ।’

ও তাঁকে মিথুনের ঘরে বিছানার ওপর নামিয়ে রেখে পিছিয়ে গেলেন, বেতের চেয়ারে গিয়ে বসলেন, ওর হাত তাঁর নাগালের ঠিক বাইরে ।

‘তোমার তো চলে যাওয়ার কথা’, তিনি বললেন।

‘জানি’, জবাবে বলল ও। কিন্তু ওর দৃষ্টি অন্ধকারকে এফোঁড়-ওফোঁড় করছে।

‘কেন?’ তিনি জানতে চাইলেন। উত্তরটা জানা তবুও।

‘তোমাকে দেখতে। এমন হঠাৎ করে চলে গেলে...’

‘তুমিও তো...আর কোনো চিঠিপত্র নেই।’

তিনি শুনতে পেলেন ও ব্যাগ হাতড়াচ্ছে আর কিছু একটা বের করে ঝাঁকি দিল। তারপর ছোট্ট একটা আঁচড় কাটার শব্দ খস, ও দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠি তুলে ধরল। রেহানা ওর চোখ দেখতে পেলেন, আর মাথার ঘন কৌঁকড়ানো চুল। ম্যাচের কাঠি তিনি স্থিরভাবে ধরে আছেন, যতক্ষণ না তা পুড়তে পুড়তে গোড়া অবধি যায়। ছেড়ে দিয়ে আরেকটা জ্বালালেন। দেশলাইয়ের ছড়িয়ে যাওয়া তাপ রেহানা অনুভব করলেন, জ্বলে শেষ হওয়ার আগে ছড়ানো এর গন্ধক চূর্ণ; ও হাত ঝাঁকাল আর কাঠিটা নিভিয়ে দিল।

‘এত ফ্যাকাশে,’ ও বলল।

‘আমি...আমার জন্ডিস হয়েছিল।’

‘জানি।’ ফিসফিস করে বললেন। ওর নিশ্বাস তাঁর চোখে।

লবণের মতো নিরেট ফুঁপিয়ে ওঠা কান্না, তাঁর গলার কাছে উঠে আসে। বাধাহীন ঝরে পড়ে, কিন্তু তাঁর থুতনি বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ার আগেই ওর হাত সেগুলো অঞ্জলি পেতে নিল, তাঁর গালের ওপর পাতলা করে মেখে দিল, মাখনের মতো।

তিনি শুনতে পেলেন ওর জিভ তাঁর মুখের ভেতর ভ্রমণ করছে। জিভ ছুঁয়েছে দাঁত। তালু আদর করছে। তিনি এত নিবিড়ভাবে শুনলেন যে মনে হলো বুঝি-বা-ওটা তাঁর নিজেরই জিভ, দাঁত, তালু।

ও তাঁকে চুমু খেল। তিনি যেমনটা কল্পনা করেছেন তার চেয়েও ওর ঠোঁট কুসুম-কোমল, আর্দ্র। তিনি ওর জিভ অনুভব করলেন; ছুলেন, খুঁজে পেলেন জাদুর কারসাজির মতো। ও তার ব্লাউজ দাঁতে কাটল। মাথা ডুবিয়ে দিল। জিভ দিয়ে ও তাঁকে সন্ধান করল। বুকের ওপরে-নিচে। হাঁড় বেয়ে নিচে, আবার ওপরে। বহমান নদীর ওপর একটা সেতুর মতো।

জিভের ভ্রমণ-পথ জ্বলে যাচ্ছে।

ও ওর বুড়ো আঙুল তার মুখের ওপর রাখল। আঙুলের ভেতরে হৃদস্পন্দন গতিশীল হলো। তিনি মুখ ঘুরিয়ে ওর ঠোঁটের দেখা পেলেন, দাঁতে কাটতে তাঁর প্রবল বাসনা হলো, কিন্তু কাটলেন না।

কিছু মুহূর্ত, এক অনন্তকাল। পার হয়ে গেল। ছাদ থেকে একটা টিকটিকি ডেকে উঠল। এক ফালি চাঁদ কেবল ফিকে আলোই বয়ে এনেছে, যার ভেতর দিয়ে তিনি কেবল ওর চৌকো মুখের আদল খুঁজে পেলেন আর ঘন কৌঁকড়ানো কালো চুল।

তিনি ওকে বলতে চাইলেন এখানে আসা ওর জন্য কতটা বোকামি হয়েছে, কিন্তু ভয় পেলেন এই ভেবে যে যদি সে কথা উচ্চারণ করেন তাহলে ও সত্যি করে বুঝে যাবে এই আসা তিনি কতটা মন-প্রাণ উজাড় করে চেয়েছিলেন।



‘আমাকে যেতে হবে। সেহরির জন্য, সূর্য ওঠার আগেই।’
ও তার গাল থেকে চুলের কুন্তল সরিয়ে দিল।
‘আবার কখন তুমি ফিরে আসবে আমাকে বলো না।’
এখন ওর বুড়ো আঙুল তাঁর গলার নিচে খেলে বেড়াচ্ছে।
‘নইলে আমি নিশ্বাস বন্ধ করে পড়ে থাকব।’
ও মাথা নাড়ল আর একটু নুয়ে এলো।
‘আমার ছেলেকে দেখে রেখ।’

রেহানা বাগান পার হলেন, দু’হাত দুলিয়ে, আমগাছ পেছনে ফেলে এলেন, আর লেবুগাছ, আর গোলাপঝাড়, যা তাদের গোপন কথা উজাড় করে দিয়েছে আর হাইড্রেনজিয়া, যার সাদা আর নীলে মেশা ফুলগুলো আকাশের মতো। আর বাংলাতে মায়া নোঙর ফেলা জাহাজের মতো বিছানার ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। রেহানা রান্নাঘরে যেতে গিয়ে মত বদলালেন, ভাবলেন অল্পক্ষণ শুয়ে থাকা যাক। এখনো ঘণ্টাখানেক বাকি আছে সেহরির। তিনি চোখ বুজলেন আর মনে করতে চেষ্টা করলেন। শুধু একবার। মাথার ওপর পাখাটা হালকা নড়ল, বারান্দা থেকে ভেসে আসা নভেম্বর বাতাসের মৃদু কাঁপনে একটু ঘুরে গেল। ওর শরীরে লেগে আছে আবেশ, ঘ্রাণ, ওর তরমুজ নিশ্বাস, ওর রাবারপোড়া ঘাম।

ওদের রাস্তায় মোড় নেওয়ার আগেই রেহানা ট্রাকের শব্দটা শুনে পেলেন; টের পেলেন বাংলার সামনে তাদের গতি ধীর হয়ে এসেছে। ঘুম থেকে উঠিয়ে টেনে বসার ঘরে নিয়ে আসার মতো সময়টুকু তিনি পেলেন। আর্মি এসেছে। একবার ভাবলেন চুলগুলো ঠিক করে নেবেন। হাতের পিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছে নিলেন। আর তারপর ওরা সোফার কিনার ঘেষে পাখির মতো বসল, শিরদাঁড়া সোজা করে, যেন কোনো মেহমানের জন্য অপেক্ষা করছে, পার্থক্য শুধু ওরা তখনো কালি-ধোঁয়া রাতে সাঁতার কাটছে।

ট্রাকগুলো থেকে সবুজ উর্দি পরা অল্পবয়সী সব ছেলে উপচে পড়তে লাগল, একই সঙ্গে ডজন করে, প্রত্যেকের চোখে একই নৃশংস, জান্তব দৃষ্টি আর পায়ে

বুটজুতো যা হাতুড়ির মতো শব্দে দাপিয়ে ঘুরছে। ওরা মেয়েদের লক্ষ করল না। ওদের সবার চোখ সোনার দিকে, সোনা ওদের কী দেবে! রেহানার ঠোঁট থেকে বিড়বিড় করে গড়িয়ে পড়ছে দোয়া। খোদা, ওকে ভালো রাখো।

বুটগুলো ভারি পদপাতে বাংলায় চমকে বেড়াল; তাক থেকে বই টেনে নামিয়ে ছিঁড়ে ফেলল, খাবার প্লেট ভেঙে চুরমার করল। পিতলের প্রদীপ পা লেগে পড়ে গেল। কাপবোর্ড, আলমারি সব তছনছ করল। সোহেলের শোবার ঘরে সাঁটা পোস্টারগুলো টেনে ছিঁড়ে ফেলল, লাল প্রেক্ষাপটে মাও-এর ছবি, টুপি-পরা চেণ্ডেলভাড়া আর মুখে তাঁর মজার হাসি। বালিশ বেয়োনেটের খোঁচায় ছত্রখান। হলুদ তুলো শরীর ফুলের মতো ছড়িয়ে পড়ল।

কেউ ওদের ফ্রেফতার করল না। হেমন্তের মৃদু কুয়াশায় সূর্য খুব ধীরে আর সাবধানে বেরিয়ে আসতে চাইল।

সহসা একটা চিৎকার উঠে এলো। ‘অল ক্লিয়ার!’ আর তখন সব সিপাহি লাইন করে দাঁড়িয়ে গেল সটান হয়ে। দরজা দিয়ে সেই মুহূর্তে একটা লোক ভেতরে প্রবেশ করল, তার হাত কোমরে রাখা, যেখানে একটা পিস্তল গোঁজা।

‘মিসেস রেহানা হক,’ চাপা চর্চিত ইংরেজিতে বলল সে। তার পাকানো গৌফ ছিল কিন্তু কোনো দাড়ি না। রেহানা লোকটার বয়স ঠাঠর করতে পারলেন না। তারুণ্য ও বার্ধক্য তার চেহারায়ে সেখানে সেখানে লড়ে যাচ্ছে। ‘আমার নাম কর্নেল জাবিন। আপনার বাড়ি এবং আশপাশ তল্লাশি করা আর আপনার ছেলে সোহেল হককে ফ্রেফতার করার নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়েছে।’

এখন ছাদের ওপর বুটের শব্দ, হাতির মতো ভারি পায়ে দাপাচ্ছে। রেহানা মায়ার হাত শক্ত মুঠিতে ধরলেন। হাতটা কেমন গরম আর পিছল। জাবিনের পাশে আর একটা লোক ছিল। সে জানালা খুলে বাইরে মাথা বের করল আর সাদা নীল হাইড্রেনজিয়া ফুলের ওপর থুথু ফেলল। লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়ে গলা খাকারি দিতেই তার নজর পড়ল মায়ার ওপর। তার ঠোঁটের কোনায় তখনো থুথু লেগে ছিল। সে চেটে নিল, মায়ার দিকে তাকাল...ওপরে, নিচে... তারপর আবার ঠোঁট চাটল। মায়াও ফিরে তাকিয়ে রইল। ওর হাতের তালু ভেজা, তবুও দৃষ্টি সরিয়ে নিল না।

কর্নেল জাবিন বাংলায় কথা বলল না। সে উর্দুতে বলল। থুথুওয়ালা লোকটার কানে টেঁচিয়ে বলল আর থুথুওয়ালা তা বাংলায় অনুবাদ করে দিল।

‘ওদের বন্দো, আর কোনো উপায় নেই। ছেলেটাকে যেন আমাদের হাতে তুলে দেয়।’

‘মিসেস হক,’ থুথুওয়ালা লোকটা বলল, ‘আপনার আর কোনো উপায় নেই।’

‘কর্নেল,’ রেহানা বাংলায় বললেন। জাবিনকে উদ্দেশ্য করে বললেন কিন্তু তাকিয়ে রইলেন থুথুওয়ালা লোকটার দিকে, ‘নিশ্চয়ই কোথাও কোনো ভুল হচ্ছে। আমার ছেলে এখন করাচিতে আমার বোন মার্জিয়ার কাছে। ওরা ক্লিফটনে

থাকে...আপনি কাউকে ওখানে পাঠিয়ে খোঁজ নিতে পারেন।’

‘ওর হারামজাদা এখন করাচিতে, তাই বলছে।’

কর্নেল জাবিন প্রথমে কোনো জবাব দিল না। তারপর সে সরাসরি রেহানার দিকে তাকাল আর বলল, ‘এখানে কোনো ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার নেই। আপনার ছেলে পাকিস্তানের শত্রু, বিশ্বাসঘাতক।’ থুথুওয়ালা লোকটা বলল, ‘আপনার গাদ্দার ছেলেকে আমরা ছাড়ব না।’

সিপাহিরা ছাদ থেকে ফিরে এলো, বাগান থেকে, সোনা থেকে, সঙ্গে করে নিয়ে এল বাক্সভরা কাপড়, এক গাদা শাড়ি যেগুলো দিয়ে কাঁথা বানানো হবে, আর পেনিসিলিন। মেজর নেই। ওদের মধ্যে একজন উল্টে ফেলা একটা চেয়ার সোজা করে বসাল, আর জাবিন সমস্ত ওজন নিয়ে সেখানে ধপ করে বসল। ওকে ক্লান্ত দেখাল। ওরা রেহানার পায়ের সামনে বাক্সগুলো ধপাস করে রাখল। এক পাহাড় প্রমাণ।

রেহানা বললেন, ‘রিফিউজিদের জন্য আমরা বিভিন্ন দানসামগ্রী জোগাড় করছি।’ তিনি মায়ার হাত নতুন করে আঁকড়ে ধরলেন, আর আল্লাহর রহমতে এই একবার মেয়েটা ওর মনের কথা মুখে বলার ইচ্ছা দমন করল।

‘ওকে বলো, আমরা অস্ত্রের ভাণ্ডার সম্পর্কে জানি।’

শীতল একটা অনুভূতি রেহানার হাত বেয়ে ছড়িয়ে পড়ল শরীরে। তিনি ঢোক গিললেন। ‘আপনার গোলাপঝাড়ের নিচে পুঁতে রাখা অস্ত্রপাতির খবর আমরা জানি’, থুথুওয়ালা লোকটা বলল।

রেহানা কিছু বলার জন্য মুখ খুললেন।

‘কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। আমরা সবই জানি।’

ওরা যা জানে সে সম্পর্কে জাবিন থুথুওয়ালাকে কিছু বলে কি না তা দেখার জন্য রেহানা অপেক্ষা করলেন। ‘আমার ছেলে করাচিতে,’ তিনি আবারও বললেন। মায়াকে আরও কাছে টেনে নিলেন। আবারও জাবিন থুথুওয়ালার কানে ফিসফিস করে কিছু বলল, যা রেহানা শুনতে পেলেন না। থুথুওয়ালা উত্তর দিল। জাবিন হাসল। কর্নেলকে তিনি কি আগে কোথাও দেখেছেন?

থুথুওয়ালা কথা বলে ওঠার আগে কয়েক মিনিটের জন্য জাবিন আর লোকটা একে অপরের দিকে তাকাল, নতুন প্রেমিক-প্রেমিকার মতো ভাবগম্ভীর, ‘আপনার বালবাচ্চা তো একটার চেয়ে বেশি।’

রেহানার পা দুটো ধীরে ধীরে কোনো কেসেমা ছাড়াই তরল জেলি হয়ে যাচ্ছিল। মুখ খুবড়ে নিচে পড়ে যাওয়া ঠেকাতে তিনি তার হাড়গুলোর কথা ভাবলেন। তার তো হাড় আছে। সেই ভাবনা তাকে আবার খাড়া করল।

‘মেয়েটাকে অন্য ঘরে নিয়ে যাও।’

থুথুওয়ালা লোকটা ঘুরল, একটা হাসি ওর মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

‘মা,’ মায়া অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করে বলল, ‘আমি যেতে চাই না।’

রেহানা মেয়ের হাতের সঙ্গে নিজের হাত জড়িয়ে ধরলেন। থুথুওয়ালা এখন ওর কনুই ধরেছে, একজোড়া হাতকড়া তার হাতের মুঠোয় ঝনঝনিয়ে ঝুলছে। দাঁড়াও, রেহানা নিজেকে বললেন, মাত্র একটা মিনিট দাঁড়াও। আমি কিছু একটা ভেবে বের করব। তিনি জাবিনের দিকে তাকালেন। কিছু একটা দেখলেন...একটা হাভাতে ক্ষুধা...তার চোখে-মুখে। তিনি দেখলেন জাবিন আরও বেশি কিছু চায়, দুটো মেয়ের ওপর বাহাদুরি দেখানোর চেয়ে আরও বীভৎস আরও জাস্তব কিছু। তিনি মেয়ের হাত ছেড়ে দিলেন আর তার একমাত্র তুরূপের তাস খেললেন।

‘কর্নেল জাবিন,’ তিনি নির্ভুল, খাঁটি উর্দুতে বললেন, ‘আপনি নিশ্চয়ই এভাবে যুদ্ধ জিততে চান না।’

জাবিন সাঁট করে মাথা বাঁকাল। ঠিক শুনেছে তো? সে গলা পরিষ্কার করল। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপাল মুছল। বিদ্যুৎ ছিল না, আর তাই পাখাও ছিল না, সবাই ঘামছিল, সবচেয়ে বেশি জাবিন। বিশেষ দিনগুলোতে যে কি না তার পুরো সেনা-উর্দি পরতে পছন্দ করে, যেমন বিশ্বাসঘাতকদের ঘায়েল করার মতো দিনে।

‘আপনি উর্দু বলেন’, সে বলল। এটা কোনো প্রশ্ন ছিল না। থুথুওয়ালা লোকটা তখনো মায়ার কনুই ধরে টানাটানি করছে, আর ও মোচড় দিয়ে নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করছে। তার ঠোঁটের দুই পাশ ভেজা।

‘খামো’, জাবিন থুথুওয়ালা লোকটাকে বলল। সে কথা মানল, হাসল, এই অপেক্ষা থেকে মজা পেল।

‘সার্জেন্ট, যাও বাগানটা আবার ভালো করে দেখে আসো’, জাবিন বলল, ‘আর এই মহল্লাও। সন্দেহজনক কাউকে দেখলেই গ্রেফতার করবে।’

‘যাও!’

থুথুওয়ালা লোকটা কিছুটা দ্বিধা করল।

‘যাও!’ জাবিন বলল। ‘ছেলেগুলোকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও।’

থুথুওয়ালা সালাম ঠুকল আর বাকি সৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে বাংলো থেকে বের হয়ে গেল, দুপুরের শ্বাসরুদ্ধ গরমে রেহানা ও মায়াকে জাবিনের কাছে একলা রেখে।

জাবিন রেহানার দিকে ফিরল। ‘সমস্যাটা বুঝতে পারছেন তো’, সে বলল। ‘ইতিমধ্যে আমি আমার লোককে কথা দিয়ে ফেলেছি।’

‘তাহলে ওকে বলুন আপনি মত বদলেছেন।’

বুড়ো আঙুলের উল্টো পিঠ দিয়ে সে তার গোফ ঘষল। ‘প্লিজ মিসেস হক, একটু বোঝার চেষ্টা করেন, ঠিক আছে?’ বসতে বসতে আপ্যায়নের ভঙ্গিতে চেয়ার দেখিয়ে বলল। ‘আমি বুঝতে পারছি যে আপনি একজন শিক্ষিত মহিলা। গতরাতের অপারেশনে তিনটি ছেলে ছিল। তাদের একজন আপনার ছেলের বন্ধু

জয়। আরেকজন একটা হিন্দু ছেলে পার্থ। আর সোহেল হলো তিন নম্বর। আমরা জানি, ওরা সীমান্ত পার হতে চেষ্টা করবে। মনে হয় আমরা ওদের যাওয়ার পথের সন্ধান পেয়েছি। কিন্তু আমার মন বলছে, ওরা হয়তো বাড়িতে ফেরারও চেষ্টা করতে পারে। বিশেষ করে আপনার ছেলে।’ সে পা দুটো আড়াআড়িভাবে রাখল আর একটু দোলালো। ‘মনে হচ্ছে সে হয়তো বেশি কাতর...বাড়ির সবার জন্য অন্যদের চেয়ে একটু বেশি কাতর।’ জাবিন হাই তুলল আর মাথার পেছনে দুই হাতের আঙুল খাপে খাপে আটকে নিল।

হ্যাঁ, এটা সত্যি। সোহেলের মন কেমন করে, সবার চেয়ে বেশিই। যেমন, এই মুহূর্তে বারুদে ওর হাত ছড়ে গেছে, এখন শুধু ও একটা ছেলে না যে দেশের জন্য অথবা নিজের জীবনের জন্য পালিয়ে বেড়াচ্ছে, ও এমন একজন যে ভালোবাসা থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজছে। জাবিনকে সে বলল, ‘আমি জানি না আপনি কী বলছেন।’ তখন জাবিন আবারও হাসল আর রেহানার মনে পড়ে গেল সে তাকে আগে কোথায় দেখেছে। ‘আমি আপনাকে দেখেছি, থানায়।’

‘হ্যাঁ, তা-ই হবে। আমি সেখানে অনেকটা সময় কাটাই।’

‘আপনি চাইনিজ চা খেতে চাইলেন।’

সে মাথা নাড়ল, বেশ অবাক হয়েছে। ‘আমি অবুঝ মানুষ না মিসেস হক। মেয়েদের ঘেঁটে হাত ময়লা করার কোনো ইচ্ছা আমার নেই। মাঠে আমার যে ছেলেরা আছে’, মাথা ঝাঁকিয়ে সে বলল, ‘যুদ্ধের তাণ্ডব ওদের মাথা বিগড়ে দিয়েছে। কী আর করা।’

গভীর নিশ্বাস ফেলল সে যেন এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল।

‘যা হোক, আমার কাজ আমাকে করতে হবে। ওই বাঙালি ছোকরাদের ধরে আনতে হবে। ওদের গ্রেফতার করতেই হবে। আর তারপর গুলিতে সবকটাকে সাবাড় করা।’

‘তাহলে তো ও কোথায় আছে সেটা বলার কোনো কারণ আর আমি দেখছি না।’ রেহানা ঢোক গিললেন।

‘যা বলছেন তার চেয়ে বেশি বুদ্ধি নিশ্চয়ই আপনি রাখেন, মিসেস হক।’

গুমোট আবহ তার পেটের ভেতরটা গুলিয়ে দিল।

‘কারণ আমি ইচ্ছা করলেই তাকে কারাগারে একটা ছোট খুপড়িতে আটক রাখতে পারি, আর ধরামাত্র গুলি নাও করতে পারি। আপনি তো দেখেছেন ওর বন্ধুর কী দশা হয়েছিল। বেচারী।’

জাবিনের গাল দুটো চকচক করছে। তারপর সে জিজ্ঞেস করল, ভাবখানা এমন যেন প্রশ্নটা এই মাত্র মাথায় এলো, ‘আপনার স্বামী কোথায়, মিসেস হক?’

এক সময় আমার স্বামী ছিল। ওর মুখ গোল আর ওর আঙুলগুলো পাউরুটির মতো নরম। একদিন ওর হৃদস্পন্দন থেমে গেল। বাড়ির সামনে সে হাঁটু ভেঙে

পড়ে গেল। ‘রেহানা’, সে বলল, ‘মাফ কার দো।’ ক্ষমা করো।

‘মৃত’, তিনি বললেন। উদ্বাস্ত শিবিরে পাইপে বাস করা সেই মহিলার মতো, একই রকম ভাবলেশহীন কঠোরভাবে, যে একদা তার প্রশ্নের এই উত্তরই দিয়েছিল।

‘আহা, আপনার বাচ্চাদের জন্য কত বড় আঘাত।’

আমার বাচ্চারা সব সময় আমার বাচ্চা ছিল না। আমার বাচ্চারা এক সময় অন্য কারোর ছিল।

দরজায় শোনা গেল তীব্র একটা করাঘাত। গটগট করে হাঁটা, তারপর খটাস শব্দ। সার্জেন্টকে দেখা গেল। ‘স্যার, পাকড়াও করেছি একে।’ একটা লোককে সে লাথি দিয়ে ঘরে ঢোকাল। লোকটার মুখ চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। ওর গালে কাস্তুর দাগ। মাথা কৌকড়ানো চুলে ঘেরা। ‘সাত মসজিদ রোড দিয়ে দৌড়ে যাওয়ার সময় ধরলাম। হারামজাদা গাধার গাধা। একেবারে আমাদের চোখের সামনে।’

জাবিন তার পিস্তল বের করে তাক করল। তারপর সে মত বদলাল, নলটা ঘোরাল আর বাঁট দিয়ে সজোরে আঘাত করল। লোকটার থুতনিতে গিয়ে লাগল তা; জাবিনের হাত আবারও নিচে নেমে এলো, আর অন্য হাত দিয়ে সে লোকটার পেটে ঘুষি মারল। লোকটা নড়তে চেষ্টা করল না। ও মেঝেতে ঢলে পড়ে গেল, রক্তের একটা ছোট্ট ত্রিভুজ ওর গালে। ও হাসার চেষ্টা করল। তারপর ডিগবাজি খেল, জাবিন ওর পিঠে ক্রমাগত লাথি দিচ্ছিল। ‘আমার এখনই তোকে মেরে ফেলা উচিত, শুয়ার কা বাচ্চা বাঙালি। বিদ্যুৎ বন্ধ করে দিবি ভেবেছিস?’

‘দাঁড়ান! এ আমার ছেলে না।’

জাবিন থমকাল, ওর বুট উঁচিয়ে আছে। ‘কী?’

‘ও আমার ছেলে না।’

বুটটা নেমে এলো, প্রথমে নামল গোড়ালি, সেটা পড়ল হাতের ওপর। গলা থেকে বের হলো চাপা আর্তনাদ, দাঁতে দাঁত চেপে আটকে ফেলা।

‘ওর দিকে তাকান—আমার ছেলের বয়স এত বেশি হতে পারে না।’

‘এই মহিলা, আমার সঙ্গে চালাকি?’ জাবিন মেঝেতে পা ঠুকল, সেই পরিশ্রমে তার হাঁপ ধরে গেছে। ‘এ কে?’ ওর নিশ্বাস রেহানার মুখ পুড়িয়ে দিল।

‘আমি জানি না। এই লোক যে কেউ হতে পারে... আপনার তো এইমাত্র ওকে রাস্তা থেকে তুলে আনলেন।’

‘আপনার কি ধারণা মুক্তি চিনতে আমি ভুল করব? আমি ওই হারামিদের প্রত্যেককে চিনি...ওদের টুটি চেপে ধরাই আমার কাজ। আপনার চেয়েও আমি ওদের ভালো চিনি। আমি ওদের ঘাতক। আপনি তো কেবল ওদের মা।’ জাবিন হাসল। ওর মুখের ভেতরটা ছাইবর্ণ, ও আরো বর্বর কিছু চাইছিল। সেটা মিলেছে।

‘এ আমার ছেলে না। আমি বলছি, এ আমার ছেলে না। আল্লাহর দোহাই

দিয়ে বলছি, কোরআনের দোহাই দিয়ে বলছি, আমি মায়ের কবরের নামে বলছি, এ আমার ছেলে না। ভুল মানুষকে ধরে আপনার কী লাভ? এতে গৌরব কোথায়?’

এবার জাবিন থামল, পকেটে চাপড় দিল, ঝেড়ে ফেলল নাকের ডগার এক ফোটা ঘাম। ‘ড্যামিট!’ সে বলল, লোকটার শরীরে শেষবারের মতো লাথি কষিয়ে। ‘সার্জেন্ট!’

‘ইয়েস স্যার।’

‘রেডিও ধরো। দেখ আর কোনো খবর আছে কি না।’

‘এর কথা আমি কি ওদের জানাব?’

‘আমি কী বললাম? যাও!’

রেহানার মাথা দুই হাতের মধ্যে ধরা। শুধু তিনি যদি লোকটার দিকে না তাকাতেন। হয়তো আদতেই ও না; হয়তো সে যা বলল তা-ই, একজন অচেনা লোক, ভুল সময়ে রাস্তা পার হতে গিয়ে ধরা পড়েছে।

সার্জেন্ট ফিরে এলো। ‘কর্নেল স্যার, রেডিও ধরলাম। ওদের পাওয়া গেছে।’ রেহানার প্রাণ ধপ করে ওর পদতলে পড়ে গেল।

‘তিনজনকেই।’

‘না স্যার। সোহেল হক নয়। অন্য দু’জন। পিছু ধাওয়া করে ওদের কুমিল্লায় ধরেছে।’

খোদা তোমার কাছে হাজার শুকুর। হাজার হাজার শুকুর। কিন্তু সোহেল কোথায়? ওদের তো দাউদকান্দি যাওয়ার পথ নেয়ার কথা ছিল, হেমন্তের পাকা ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে, গ্রামের পর গ্রাম পার হয়ে, উথালপাথাল ডেউয়ে সাঁতার কেটে, ওদের পায়ের কাছে প্যান্ট গুটানো, ওদের মাথার ওপর বন্দুক আঁকড়ে ধরা।

জাবিন উবু হয়ে বসল, লোকটার চুলে চিরুনির মতো আঙুল চালিয়ে দিল আর হ্যাঁচকা টানে মাথাটা তুলল। এবার সে মায়ার দিকে ফিরল। ‘আরেকবার চেষ্টা করা যাক। এই লোকটা কি তোমার ভাই?’

মায়া কিছু বলল না, মরিয়া হয়ে রেহানার হাতে খোঁচা দিল।

‘এই লোকটা কি তোমার ভাই?’ জাবিন একই প্রশ্ন আবার করল।

‘বলে দাও’, মেজর বললেন। মুখ থেকে শিস দেয়ার মতো শব্দ তুলে নিশ্বাস বের হচ্ছে তাঁর।

একদা তিনি ওর কাছে তাঁর একান্ত গোপন কথা বলেছিলেন যা টি আলী সম্পর্কে নয় অথবা তাঁর বাবার সম্পদ খোয়ানো সম্পর্কে নয় অথবা চুরি করা গয়নার কথা নয় বা সিনেমা নিয়ে তাঁর গোপন ভালোবাসার কথা নয়, তবে বাচ্চাদের সম্পর্কে

তাঁর মনের একান্ত কথা। কত দূর পর্যন্ত তিনি যাবেন। যে কোনো সীমানা পর্যন্ত। যে কোনো দূরত্ব। সেটাই প্রকৃত গোপন কথা। লজ্জাহীন, ক্ষুধার্ত গোপন সত্য।

আর সেই উপলব্ধি নিয়ে তিনি তাঁর সন্তানদের নিজের হাতে ধরে রাখলেন, নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে নতুন জীবন দান করলেন।

রেহানাই এটা বেছে নিয়েছিলেন, মেজর নয়। তিনি নিজেই ওর কাছে চেয়েছিলেন। তুমি নাও আমার সন্তাপ। বাদবাকিটা যেভাবে হওয়ার কথা কেবল সেভাবেই হতে পারে। এক ভালোবাসা গ্রাস করল আরেক ভালোবাসা। রোদেলা আকাশে মেঘেদের মতো একের পিঠে আরেকের ঠাসাঠাসি।

রেহানা সেই উপলব্ধি ফিরে পেতে চেয়েছেন। তোমাকে আমার কখনোই বলা উচিত হয়নি।

আমি কী যে কৃতজ্ঞ, ও বলল, কী যে কৃতজ্ঞ তুমি আমায় বলেছ।

সারা জীবন আমি এই দিনটার অপেক্ষায় ছিলাম।

এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে মহৎ কাজ। সারাজীবন আমি এই দিনটার অপেক্ষায় ছিলাম। এখন একথা বলে দাও, আর সেই সাথে সাক্ষ হোক সব।

তিনি বললেন।

‘খোদা তোমার সহায় হোন, বাছা আমার।’

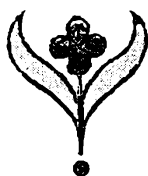
‘খোদা তোমারও সহায় হোন, মাগো।’

আমার জীবন তোমার জীবনের বিনিময়ে।

তুমি নাও আমার সন্তাপ। ওর কাছে একবার চেয়েছিলেন তিনি, আর ও তাঁর কথা রাখল।

হাতকড়া বাঁধা লোকটাকে সার্জেন্ট টেনেহিচড়ে নিয়ে গেল। মায়া রেহানাকে জানালা থেকে টেনে সরাতে চাইল, কিন্তু তিনি যেন পাথর হয়ে গেছেন। এই দৃষ্টির জন্য তিনি ওর কাছে ঋণী, ওকে ফিরিয়ে দিতেই হবে। রেহানা দৃষ্টি স্থির রাখলেন। সেই দৃষ্টিতে ওকে বন্দি করলেন, যে কালো গুপ্তন ওর মাথায় পরিয়ে দেয়া হলো তার মধ্য দিয়ে, এই জেনে যে, আবরণ খুলে করে ও ঠিক তাঁকে দেখতে পাবে, দেখতে পাবে জানালার হৃদয়াকৃতির শিকের মধ্য দিয়ে, দেখতে পাবে বাংলার ভেতরে আর তার চোখের মধ্যে যেন এভাবে ও তাঁর সব ভাবনা জানতে পারে, তাঁকে বুঝতে পারে এই সঙ্কীর্ণ মুহূর্তে, দৃষ্টির বাইরে চলে যাওয়ার মুহূর্তে সে পরিপূর্ণভাবে শুধুই তাঁর।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১





প্রিয়তম,
আজ যুদ্ধ শেষ হবে।

এখন শীত পড়েছে আর বাগানটা সজীব।

যুদ্ধের শুরুতে যে চারা তিনি লাগিয়ে ছিলেন এখন সেসব সবুজে সেজে উঠেছে। চাঁপা, বকুল, রজনীগন্ধা। হলুদ গোলাপ। লতানো গাছে বাড়ির দেয়াল ছেয়ে গেছে।

দিগন্তে ভোরের আলো সবে ফুটতে শুরু করেছে। তিনি জানতেন টেলিফোন বেজে ওঠার আগে আর পড়শিদের আনাগোনা শুরুর পূর্বে তাঁর হাতে এই কয়েক ঘণ্টাই আছে। মানুষজন তাঁকে অভিনন্দন জানাতে আসবে আর নিজেদের কাহিনী তাঁর সঙ্গে ভাগ করে নেবে, কীভাবে তাঁরা এই যুদ্ধে টিকে গেল। একে অপরের ওপর হামলে পড়বে, দীর্ঘ ভ্রমণের পর যেমনটা হয়।

কিন্তু এখন সবে ভোর, চারপাশ একান্ত শান্ত। কেবল কাকের দল বাড়ির চারপাশে পাক খাচ্ছে।

*

রেহানা ওর কাঁধে শালটা জড়িয়ে নিলেন, আর ধীরে, সন্তর্পণে বাগান পার হলেন। সেদিনের পর তিনি আর এদিকটায় আসেননি। আর্মিরা মেজরকে নিয়ে যাওয়ার পর তিনি বাংলা থেকে প্রায় বেরই হননি। জানালার বাইরে সোনার দিকে তাকানোর উদ্যম তাঁর ছিল না।

সিমেন্টের ফাঁকা মেঝেতে তাঁর পায়ের আওয়াজ প্রতিধ্বনি তুলল। তিনি আলমারি খুললেন, দেরাজ ধরে টানলেন। সবই খালি। মায়া খুব পাকা কাজ করেছে। ভাঙা পাত্রগুলো পরীক্ষার করেছে, বইয়ের তাক খালি করেছে। সেনগুপ্তদের আসবাব বিক্রি করেছে আর সেই টাকা সল্টলেকে পাঠিয়ে দিয়েছে। গোলাপ-পাপড়ি কার্পেটটা মোড়ানো আর বসার ঘরের এক কোনায় দাঁড় করিয়ে রাখা। গোলাপি আভার খাবারঘর রেহানা পার হলেন, এক কোণে ফেলে রাখা সুপ্রিয়ার বাবা-মার ছবিটা ছাড়া পুরো ঘর শূন্য।

তিনি মিথুনের ঘরে ঢুকলেন। কফি-রং আলো পর্দা চিরে ভেতরে আসছে। প্রজেক্টর, গ্রামোফোন আর রেকর্ডগুলো সব গায়েব। তাকগুলো পরীক্ষার করে মোছা। কোনোখানেই ওর কোনো চিহ্ন নেই। দেয়াল ঘেঁষে মিথুনের খাট পাতা। কে জানে কেন মায়া এটা এখানেই রেখে দিয়েছে, একটা বর্ণিল চাদর তার ওপর পাতা। রেহানা নুইয়ে পড়ে চাদরটা সোজা করে দিলেন, মনে পড়ল কতবার তিনি ঠিক এভাবেই হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, টেনে মসৃণ করেছিলেন ওর চাদর।

বিছানার পাশে মেঝেতে এক বাক্স দিয়াশলাই রাখা। ওপরে লেখা 'ব্লু লায়ন সেফটি ম্যাচেস।'

রেহানা বাক্স খুললেন। খালি। তাঁর মুখ খুঁটিয়ে দেখার জন্য শেষ কাঠিটাও ও খরচ করেছে। ওর আঙুলগুলো তাঁর মনে পড়ল, বাক্স টান মেরে খুলছে, ম্যাচে কাঠি ঘষছে, গন্ধক আলোতে ফুটে-ওঠা তাঁর মুখ দেখছে।

তিনি আবার একই পথে ফিরে গেলেন। পর্দা টেনে দিলেন। বসার ঘর পার হয়ে দরজা দিয়ে বের হলেন। তালা বন্ধ করলেন।

বাংলাতে ফিরে তিনি জায়নামাজে দাঁড়ালেন।

বিসমিল্লাহ হির রাহমানির রাহিম।

মায়া ঘুম থেকে উঠেছে, চুল আঁচড়াচ্ছে। 'তুমি এত শিগগির যাওয়ার জন্য তৈরি? আমাকে শুধু পাঁচ মিনিট সময় দাও, আমি শাড়ি পরে নিই।'

'না, তুমি থাকো। যখন সোহেল আসবে ওর সঙ্গে যেয়ো।'

'ঠিক আছে, কিন্তু বেশি দেরি কোরো না। আত্মসমর্পণ দেখার জন্য আমাদের রেসকোর্সে যেতে হবে।'

পুরানা পল্টন রেললাইন পার হয়ে রিকশা গুলিস্তানের দিকে মোড় নিল। ফোটায় ফোটায় পানি টুঁইয়ে পড়ার মতো একজন-দু'জন করে মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে আসছে আর রিকশাওয়ালা বাড়তে থাকা ভিড়ের মধ্য দিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রতিবার মাথার ওপর দিয়ে প্লেন যায় আর ওরা জোরেশোরে উল্লাস করে ওঠে।

প্রিয় স্বামী, বারবার আউড়ে তিনি রঙ করে নিচ্ছেন, আজ যুদ্ধ শেষ হবে।

আর কী তিনি বলতে পারেন যা ইকবাল এরই মধ্যে জানেন না? এটাই কি যে, যুদ্ধের নয় মাস ছিল নয়টা জীবনের সমান, জীবন আর মৃত্যুতে সয়লাব, যে সোহেল বেঁচে গেছে, যখন ওর বন্ধুরা সব মৃত; আর এই যে শহরটা ঝলসানো, জখমি আর সজীব, তিনি দেখতে যাবেন মুখে কাটাদাগ লোকটার কোনো চিহ্ন আর পাওয়া যায় কিনা, যে তাঁর বাসায় ছিয়ানবই দিন ছিল আর তাঁর এই ছোট জীবনের ওপর দিয়ে তুফানের মতো বয়ে গেল।

একটা ছেলে, বয়স চৌদ্দ বা পনেরোর বেশি হবে না, দরজা পাহারা দিচ্ছে। গায়ে তার চেয়ে বড়মাপের শার্ট, হাতা গুটানো; একটা বেল্ট কোমর জাপ্টে প্যান্ট উঁচু করে ধরেছে। একটা অতিকায় রাইফেল ওর কোলে বাচ্চার মতো দোল খাচ্ছে।

‘আমি মিসেস হক,’ রেহানা বললেন।

‘সালাম আলাইকুম’, সে বলল। তার হাত কপালে উঠে গেল। সোনার কথা এরই মধ্যে মুখে মুখে ছড়িয়ে গেছে, যেভাবে তিনি গেরিলাদের আশ্রয় দিয়েছেন আর সাবিরকে উদ্ধার করেছেন। ‘ওরা বলেছে আপনি আসবেন। আসেন আমার সঙ্গে।’

ভেতরের ঘর লগুভগু। পুলিশ দপ্তরের টেবিল উল্টে আছে। ওরা টুটাফাটা চেয়ারের মধ্য দিয়ে পা বাড়াল, ছেঁড়া কাগজের কুঁচি গালিচার মতো মেঝেতে বিছানো।

জেলের ভেতরে ছোট কারাকক্ষে যাওয়ার গেট আরেকটা ছেলে পাহারা দিচ্ছে, এ আগেরজনের চেয়েও অল্পবয়সী। এই দু'জন নিজেদের মধ্যে কথা বলে নিল, গেট খুলে গেল আর রেহানা একটা করিডোরে এসে হাজির হলেন, সঙ্গে লাগোয়া অনেকগুলো দরজা। প্রতিটা দরজায় একটা করে ছোট খোপ, চিঠির বাস্তুর মতো। তিনি ভাবলেন ভেতর থেকে বুঝি শরীরের নড়াচড়ার শব্দ পেলেন। ছেলেটা তাকে করিডোরের শেষ মাথায় নিয়ে এলো, তালা খুলল আর দড়াম করে দরজা মেলে দিল। ‘চিন্তা কইরেন না চাচি, আমি আপনার ঠিক পিছেই আছি।’

অবয়ব অন্ধকারে নড়ে উঠল।

নিশ্চয় এখানেই তাঁকে আনা হয়েছিল। ঘরটায় ঘাম আর পেশাবের কটু গন্ধ। দেয়ালের উঁচুতে আড়াআড়িভাবে একটা ঘুলঘুলি, কিন্তু সেখান দিয়ে কোনো

আলো আসে না। দেয়ালগুলো সিক্ত আর দাগে ভরা। এখানে দাঁড়িয়ে থাকাটাই মুশকিল।

ওরা উর্দি পরা অবস্থায় উবু হয়ে বসে ছিল।

একটা লোক কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল আর তাঁর দিকে এগিয়ে এলো। লোকটা নিশ্বাস নিতে বেগ পাচ্ছিল। ‘রেহানা’, তিনি ডাকলেন।

ফয়েজ! তামাটে গায়ের রং, ঘন জোড়া ঝুঁ। ভাইয়ের সঙ্গে চেহারায় কত মিল। ওর বাঁ চোখ ফুলে উঠেছে, চোখের পাতা সঁটে বন্ধ। ‘রেহানা’, তিনি আবারও ডাকলেন। ওর হাতে হাতকড়া। পায়ে শিকল। শিকল ঝনঝন শব্দ তুলছে। ‘তুমি আমাকে নিয়ে যেতে এসেছ...’ তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন।

‘সরে দাঁড়া’, ছেলেটা চেষ্টা করে উঠল।

‘না, না, ঠিক আছে’, রেহানা বললেন। তিনি কাছে এগিয়ে গেলেন।

‘এখান থেকে আমাকে বের করো,’ ফয়েজ বললেন। ওর দাড়িতে লেপ্টানো কাদা আর মাটি শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেছে। ‘প্লিজ।’

রেহানা কোনো কথা বলতে পারলেন না; ওর দিকে বোকার মতো তাকিয়ে রইলেন, এই লোকটাকে কী ভয় আর কী ঘৃণাই না তিনি করতেন।

‘সোহেল কি...ও কোথায়?’ ফয়েজ জিজ্ঞেস করলেন।

‘ও ভালো আছে। কয়েক দিনের মধ্যে বাড়ি ফিরবে।’ অনেক প্রশ্ন নিয়ে তিনি এখানে এসেছেন, কিন্তু একটাও মনে করতে পারলেন না। নিশ্চিতভাবে এখানেই, সারি সারি এই দেয়ালের মধ্যে কোথাও ওকে আটক রেখেছিল। যদি খুব করে লক্ষ্য করা যায়, একটা হৃদিস হয়তো পাওয়া যাবে।

ফয়েজ হাত দুটো একত্র করলেন। হাতজোড় করে মার্জনা চাইলেন।

ফয়েজের কাছে তিনি মেজরের কথা জানতে এসেছিলেন। ওকে তারা কোথায় নিয়ে গেছে, কী করেছে। কিন্তু এখন তিনি জানেন প্রশ্নগুলো কত অর্থহীন, সেসবের জবাব তাঁর জানাই আছে। যা জানা দরকার সবই তাঁকে বলে দিয়েছে নিরেট দেয়াল, শিকলের ঝনাৎকার।

‘রেহানা’, তিনি বললেন, ‘আমার ভাইয়ের ওয়াস্তে, দয়া করো, মাফ করে দাও। তুমি বললেই ওরা আমাকে ছেড়ে দেবে।’

তিনি কী যেন খুঁজলেন। এটা সত্যি, তিনি বললেই ওরা ওকে ছেড়ে দেবে। হাজার হোক ওরা তো সব বাচ্চা ছেলে, বন্দুক নিয়ে ছোট্ট ছুটি করছে, ওদের হৃদয় প্রতিশোধের আগুনে জ্বলছে। ফয়েজকে ক্ষমা করে দেয়ার কথা তিনি বিবেচনা করলেন। কল্পনা করলেন তাঁকে বলছেন পাকিস্তানে চলে যেতে, কখনো ফিরে না আসতে, কখনো তাঁকে মুখ না দেখাতে। আর বলছেন, তোমাকে শাস্তি দেয়ার আমি কেউ নই, তার জন্য আল্লাহ আছেন।

কয়েক মিনিট তিনি কিছুই বললেন না। ফয়েজ যতো মিনতি করছিলেন

ততোই ওর নিশ্বাস আরও সশব্দ আরও ভারি হচ্ছিল, তিনি আবারও প্রাণভিক্ষা চাইলেন। রেহানা চেষ্টা করলেন ওর কাটাছেঁড়া ফোলা মুখের দিকে তাকাতে। তিনি প্রায় বলেই ফেলেছিলেন, ‘আমার স্বামীর ওয়াস্তে...’, কিন্তু তখনই তাঁর চোখের সামনে ভাসল সবার মুখ, জয় আর আরেফ আর সুপ্রিয়া। তারপরও তিনি ওকে ক্ষমা করতে পারতেন কিন্তু তাঁর মনে পড়ল শারমিনের পরিণতি জানার পর মায়ার হতবিস্মল চেহারা, আর যুদ্ধের প্রথম দিনগুলোর অভিঘাতে যখন সে বুঝতে পেরেছিল আপন জগৎ অটুট রেখে ও আর কখনো এখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না। ‘ভাই, আমি আপনাকে ক্ষমা করতে পারি না। আমার মেয়ের জন্য আমি ক্ষমা করতে পারি না।’

তিনি চলে এলেন। পেছনে শোনা গেল তালা লাগানোর শব্দ। তিনি শুনতে পেলেন দরজায় করাঘাত করার আওয়াজ, আর শিকলের ঝনঝনানি, ধীরে মিলিয়ে যাওয়া ফয়েজের কণ্ঠরোধী চাপা কান্না।

কবরস্থান শীতল ও ধুলোয় আচ্ছন্ন। কেয়ারটেকারের খোঁজে তিনি চারপাশে তাকালেন, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না, তিনি এখানে সম্পূর্ণ একা। হিমের দাপটে কিছুটা হেঁটে কিছুটা দৌড়ে ইকবালের কবরের কাছে গেলেন।

কবরের ওপর ঝরা পাতাগুলো তিনি সরিয়ে দিলেন। আজকের সাক্ষাৎ নিয়ে তাঁর ভেতরে একটা অস্বস্তি ছিল, কী বলবেন, কীভাবে বোঝাবেন তা-ই ভাবছিলেন, কিন্তু এখন দেখলেন কথাগুলো আপনাতেই বেরিয়ে আসছে।

প্রিয়তম,

আজ তোমাকে বলতে এসেছি আমাদের যুদ্ধের কথা আর কীভাবে আমরা বাঁচলাম সে-কথা।

আজ যুদ্ধ শেষ হবে। আমি হাজার বছর পেরিয়ে এসেছি। নিজেকে কদর্য আর শ্রান্ত লাগছে। কিন্তু আমি বেঁচে আছি।

ছিয়ানব্বই দিন একজন মানুষ ছিল আমাদের বাসায়। প্রথম দিকে আমার খুব রাগ হতো যে ও আছে, কারণ ও সোহেলকে গেরিলা হওয়ার শিক্ষা দিচ্ছিল আর দেশকে রক্ষা করার জন্য ওর ভেতরে এমন এক ধরনের গোপন ছিল, যা যুদ্ধে যোগ দেয়ার ঠিক আগে সোহেলের চোখে আমি ধিকিধিকি জ্বলতে দেখেছি।

তারপর আমি রয়ে গেলাম বাসায় সেই লোকটির আর সেই অভাজন ছেলেটার সাথে, যার ভাই মারা গেল আর এখন যে নিজেই বিহ্বল, সবকিছু সাজ হলেও এখন এই যুদ্ধবিহীন স্বদেশে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার পথ আমাদের খুঁজে নিতে হবে।

তোমার ছেলে যোদ্ধা হলো এবং সে তার অনেক বন্ধুকে হারাল। ওরা একে অপরের জামা পরত। মারাও গেল একে অপরের জামা গায়ে।

এই উন্মাদ সময়ের ভেতরে অনেক অনেক দিন পর এই প্রথম পৃথিবীটাকে আমার যথার্থ বলে মনে হলো। আমি এক নারীর গান শুনলাম, যার কণ্ঠে হাজার বছরের বেদনা বৃন্দ হয়ে ছিল। সেই ছিয়ানব্বই দিনের অল্প কিছুটা সময় আমি তাঁকে ভালোবাসলাম।

তোমাকে যেমন ভালোবেসেছিলাম, তেমনি করে তাঁকেও। কতক মুহূর্তের জন্য কেবল। আর আমি তাঁকে সব বললাম, যেদিন আমি চুরি করলাম, যেদিন আমি বিধবা হলাম, যেদিন আমি বাচ্চাদের হারালাম। আর আমি ওকে বললাম যদি আমি সুযোগ পেতাম, একটা মাত্র সুযোগ, শুধু আরেকবার বেছে নিতে, তাহলে আমি চূড়ান্তভাবে এসব কিছুর বন্ধন থেকে মুক্তি নিতাম। তাই আমি জানি, ও আমাকে দুষবে না, ওর জন্য ফয়েজ বা পারভিনের কাছে ছুটে না যাওয়ায় অথবা সেই থানায় গিয়ে ওকে ছেড়ে দেয়ার জন্য ওদের হাতে-পায়ে না ধরায়। আমি ওদের বুঝতে দিয়েছি যে ওরা সোহেলকেই ধরেছে। এই সিদ্ধান্ত আমারই ছিল। আমার নিজের দায় ওই মানুষটাকে দিয়ে শোধ করানো।

স্বামী আমার, শুধু এই জন্য, আমি প্রার্থনা করি, তুমি আমায় ক্ষমা করবে। আর আমি খোদার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি আমায় ক্ষমা করবেন।

আজ যুদ্ধ শেষ হবে। নিয়াজি আত্মসমর্পণ দলিলে দস্তখত করবে আর আমি মাথা উঁচু করে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাব। তোমার মেয়ে আমার হাত ধরে থাকবে। ফুটপাথ মানুষে মানুষে সয়লাব হবে কিন্তু মায়া তারই মধ্যে ভিড় ঠেলে সামনে এগোবে। একটা ছেলে দুই টাকায় পতাকা বিক্রি করবে আর প্রত্যেকে হাত নাড়বে ও গলা উঁচু করে রাস্তা দেখার চেষ্টা করবে। দালানের ওপর থেকে ভেসে আসবে রঙিন কাগজ, হাতের মুঠি বাতাসে ঢেউ তুলবে; নাচ হবে, বাঁশি বাজবে, একটা মেয়ে কাঁধে ঝোলানো ঢোলে ছন্দ তুলবে। কেউ ভাববে রেডিওটা মাইকের সঙ্গে জুড়ে দেয়ার কথা। পথ সমতল ও ধুলোময়; আমাদের হৃদয় স্বপ্নমুখী, ভালোবাসামুখী, গৃহমুখী, প্রাণ খুলে আমরা গাইব—‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।’ আকাশ ফ্যাকাশে ও চকচকে, আর আজ যুদ্ধ শেষ, আজ আমি পতাকা আঁকড়ে ধরব, শ্বাস বন্ধ করে প্রতীক্ষায় থাকবো আমাদের ছেলেদের ফেরার।

আমি জানি, আমি কী করেছি।

এই যুদ্ধ কত শত ছেলে কেড়ে নিল, কেবল আমার ছেলেকে ছেড়ে দিল। এই সময়ে কত শত মেয়ে পুড়ে ছাই হলো, কেবল আমার মেয়ে দগ্ধ হলো না।

আমি তা হতে দিইনি।

- সমাপ্ত -